নবম দশম

১ জুলাই ১৯৮২

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

শিলাদিত্য

নবপর্যায়ের 'শিলাদিত্য' মাসিকপত্রের দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হচ্ছে জুলাই সংখ্যা, থেকে। এই সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন বিমল কর। তাঁর অভিজ্ঞ সম্পাদনায় 'শিলাদিত্য' একটি রুচিসম্মত, সুসম্পাদিত মাসিক-পত্র হিসেবে বাঙালী পাঠকসমাজে অধিকতর সমাদৃত হয়ে উঠবে।

পাঠকরা আজই স্টলে বা হকারকে বলে রাখুন।

খেলার আসর

শুধু কলকাতার ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সাঁতার, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, কবাডি, দাবা, খো-খো নয়, জাতীয় পর্যায়ের খেলার প্রতিটি বড় প্রতিযোগিতা যেখানে, খেলার আসরের প্রতিনিধিও সেখানে, হাজির তাজা খবর মনমাতানো ছবির জন্য।

আর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ?

খেলার আসর এখানেও পিছিয়ে নেই। আর্জেণ্টিনা বিশ্ব কাপ ফুটবল, ব্যাংককে এশিয়ান গেমস, মস্কোয় ওলিম্পিক্স, চীনে প্রথম প্রাইজ মানি টেনিস, বোম্বাইয়ে বিশ্ব কাপ হকি, পাকিস্তানে বহুদিন পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফর, ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট টেস্ট, উইম্বলডনে টেনিস—সেখানেও খেলার আসরের প্রতিনিধিরা হাজির।

ESPAÑA '82

স্পেনে এবারের বিশ্ব কাপ ফুটবলে খেলার আসর রেকর্ড করল তিনজন প্রতিনিধি (অতুল মুখার্জি, অশোক চৌধুরী ও অমিয় তরফদার) পাঠিয়ে।

এখন ইংল্যাণ্ডে ভারত : ইংল্যাণ্ড টেস্ট ও উইম্বলডন কভার করছেন সুব্রত সরকার।

খেলার আসরের প্রতিটি সংখ্যাই এখন আরও আকর্ষণীয়

নবম দশম

প্রথম বর্ষ ● ত্রয়োদশ সংখ্যা ● ১ জুলাই ১৯৮২ ● দাম ৫ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ৪০ পয়সা

সূচীপত্র

পাঠক্রম বিভাগ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

● প্রথম পত্র/কুমার চট্টোপাধ্যায়

পাঠসংকলন (পদ্যাংশ) : পুরাতন ভৃত্য/৫
কথা ও কাহিনী : মানী/৯
কবিতা সংকলন : সুখ/১১
অনুবাদ/১৪
ভাবসম্প্রসারণ/১৫
প্রবন্ধ রচনা : বাঙলার ফুল-ফল/১৬
ভাবসংকোচন/১৮

● দ্বিতীয় পত্র/নির্মল লাহিড়ী

পাঠ সংকলন (গদ্যাংশ) : মেজদা/১৯
ব্যাকরণ : অব্যয়/২৫
গল্প সংকলন : অনধিকার প্রবেশ/২৯
পদার্থবিদ্যার নবযুগ : ইলেকট্রনের জয়যাত্রা/৩১

দ্বিতীয় ভাষা : ইংরাজী

● দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

Test : A Daily Drama/৩৭
Grammar :
Active & Passive Voice/৪১
Translation : Task and Comprehension Test/৪৪

ভারত ও ভারতবাসী

● ইতিহাস/নারায়ণচন্দ্র চন্দ

শশাঙ্ক/৪৯, ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি/৫৪

● ভূগোল/গৌতম মল্লিক

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ/ ৬০

কর্মশিক্ষা পর্ব

● **কর্মশিক্ষা/**
পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়/৭৩

● **শারীর শিক্ষা/অমিয় সাহা/৭৬**

বিজ্ঞানপর্ব

● **গণিত/দীপক সেনশর্মা**
পাটিগণিত/মিশ্রণ/৮০
বীজগণিত/সরল সমীকরণ/৮৫
জ্যামিতি/উপপাদ্য/৯৩

● **ভৌত বিজ্ঞান/অমৃতসূ দাস**
পদার্থবিদ্যা : আলোক/ ৯৮
রসায়নবিদ্যা : দ্রবণ ও দ্রাব্যতা/ ১০৬

● **জীবন বিজ্ঞান/দেবাশিস বিশ্বাস**
পুনরনুশীলন এবং চিঠির উত্তর/ ১১৩

সহ পাঠক্রম বিভাগ

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি/অমিত সান্যাল/ ১২৬
কর্মযোগী বিধানচন্দ্র/লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস/১২৯
বিদ্যালয় পরিচিতি/বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়/
মিহির মজুমদার/ ১৩১
আফ্রিকার হাতি/রতনলাল ব্রহ্মচারী/ ১৩৫
বিশ্বকাপের আঙিনায়/অশোক চৌধুরী/ ১৪২
জনজঙ্গল/বুদ্ধদেব গুহ/ ১৪৫
বুদ্ধির খেলা/ ১৫০
সন্ধানী প্রতিযোগিতা/ ১৫১
সাম্প্রতিক সংবাদ/ ১৫৪
তোমাদের বই/ ১৫৬
এবং জবাব/ ১৫৮
ভূ-কবিতা/ অশোক হালদার/ ১৪৪

প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি
প্রচ্ছদের ছবি ঃ প্রণব মুখার্জি

সম্পাদক : অশোক চৌধরী
সংযুক্ত সম্পাদক: ডঃ নীরদ হাজরা
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২, ফোন ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১

সম্পাদকীয়

গত ১৬ জুন তারিখে ১৯৮২ র মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এটাই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সাধারণ পরীক্ষা। এত বেশি পরীক্ষার্থী অন্য কোন পরীক্ষায় থাকে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যখন বার্মা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন নামে এমনই মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় বসতেন— তখনও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এর দশভাগেরও একভাগ মাত্র। প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রীর এই বিশাল পরীক্ষাকাণ্ড যাঁরা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করলেন, নিঃসন্দেহেই তাঁরা দেশব্যাপী অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এ'দের আরও অভিনন্দন জানাতে হবে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই এই পর্বত প্রমাণ কার্যভার নিষ্পন্ন করায়। ছাত্রছাত্রীদের উৎকণ্ঠার মধ্যে অনির্দিষ্টকাল ফেলে রাখবার যে প্রথা পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অমানবিক এবং শিক্ষা বিরোধী ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সেখানে আদর্শ সৃষ্টি করতে চলেছে।

এই পরীক্ষায় যারা শীর্ষস্থানগুলো লাভ করবে, তাদের নাম এখনও ঘোষিত হয়নি। এ বিষয়ে কোথাও কোন ত্রুটি যেন না থাকে, এজন্য পর্ষদ ওদের খাতাপত্র নম্বর ইত্যাদি পুনর্বিবেচনা করবার জন্য কিছুদিন সময় নেওয়া শুরু করেছেন। এটা কিন্তু আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। স্থান নির্বাচনে তাঁরা কারচুপি করবেন, এমন হীন সন্দেহ নয়—আমরা বলছি এই যে, প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী স্থান দিতে আবার বিবেচনার প্রয়োজন আসে কোথায়? যদি আসে, তবে সেই একই বিবেচনার অবকাশ কি যারা শীর্ষস্থান পেল না—তাদের খাতাপত্র এবং ফলে থাকতে পারে না? নাকি তারা শীর্ষস্থান পায়নি বলেই পর্ষদের দ্বিতীয় বিবেচনার যোগ্যতা হারাল? পুনর্বিবেচনা যদি করতেই হয়, তবে সব খাতা ও ফলেরই করা উচিত শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয়দের নয়। নতুবা অন্যেরা যে কিঞ্চিৎ অবহেলা লাভ করল, এ সিদ্ধান্তে কোন ফাঁক থাকে না।

ইদানিং পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে আর এক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটছে। তা হল বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর ফল অসমাপ্ত থাকা। কারও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে (R. A.) তাদের ফল প্রকাশ বিচারের অপেক্ষায় অপ্রকাশিত আগেও থাকত, আজও থাকে। এগুলো সম্পর্কে বলবার কিছু নেই। কিছু পরীক্ষক ফল পাঠাননি বলেও ছাত্রছাত্রীর ফল অপ্রকাশিত থাকে। মাসখানেক, কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকমাস পরেও এদের ফল প্রকাশিত হয়। যোগ্যতার সঙ্গে পাশ করেও এরা তখন আর কোন কলেজে বা স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। ব্যক্তিগত ত্রুটি না থাকলেও তাদের একটা গোটা বছর নষ্ট হয়। যাঁদের কর্তব্যে অবহেলায় এই অবাঞ্ছিত অপচয় ঘটল, তাঁরা শাস্তি পেলে নিশ্চয় আমরা খুশী হতাম, কিন্তু তার চেয়েও খুশী হতাম যদি পর্ষদ এদের ফল দেরিতে প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে এদের উচ্চতর পাঠের সুযোগটিও সংরক্ষিত রেখে, উদোর অপরাধের শাস্তি এই বুধোদের ঘাড়ে না ফেলতেন। আমরা এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য • প্রথম পত্র

পাঠ সংকলন ঃ পদ্যাংশ

পুরাতন ভৃত্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার আগে আমরা নবম শ্রেণীতে যে পাঁচটি কবিতা পড়তে হবে তার মধ্যে তিনটি কবিতাই পড়ে ফেলেছি। অবশিষ্ট আছে দুটি কবিতা। কবিতা দুটিই কাহিনীমূলক কবিতা। একটি রবীন্দ্রনাথের লেখা পুরাতন ভৃত্য ; দ্বিতীয়টি কালিদাস রায়ের লেখা 'ত্রিরত্ন'। আমরা প্রথমে 'পুরাতন ভৃত্য' পড়া শুরু করব।

'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি একটি কাহিনীমূলক কবিতা। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে এমন কাহিনীমূলক কবিতা পাওয়া যায় না। সেকালে সাহিত্য মাত্রই পদ্যে রচিত হলেও এমন সংক্ষিপ্ত কাহিনী-কবিতা লেখা হত না। বিরাট বিশাল কাব্য (রামায়ণ, মহাভারত বা যে কোন মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য) রচিত হয়েছে পদ্যে। আবার বিশাল কাহিনীর (রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর বা উমা-মেনকার গল্পের) কোন এক সামান্য অংশে ধৃত কারও মনোভাব নিয়েও কবিতা রচিত হয়েছে (শাক্ত পদাবলী বা বৈষ্ণব পদাবলীর যে কোন কবিতা)। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরে এমন কাহিনী বর্ণিত হয়নি।

লোক সাহিত্যে কিছু কাহিনী-কবিতা ছিল (যার অনেকগুলো 'ময়মনসিংহ গীতিকা' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে সংকলিত আছে)। কিন্তু সেগুলোও আকারে প্রকারে ঠিক এই কবিতাগুলোর মত নয়।

আধুনিক বাঙলা কাব্যের সূত্রপাত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে। তিনি কাহিনী বর্ণনা দিয়েই কাব্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু সে কাহিনীও স্বর্গ-মর্ত-পাতাল পরিব্যাপ্ত বিরাট—বিশাল। তাঁর অনুসরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্রও বড় বড় কাহিনী-কাব্য লিখে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক বিচিত্র কাহিনী-কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন—নাম 'স্বপ্ন প্রয়াণ'। এমন কি রবীন্দ্রনাথ যাঁকে মনে মনে কাব্যগুরু বলে মনে করতেন, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীও প্রায় কাহিনী কাব্য লিখলেন—কিন্তু তারও রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন।

এদিকে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আগেই বাঙলায় গদ্যে কাহিনী বর্ণনা শুরু হয়ে গেছে—তাকে বলছি উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ইত্যাদির কত বিচিত্র রচনার পরে কলম ধরলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁর হাতেই বাঙলায় এক শ্রেণীর নতুন কাহিনী রচনার ধারা সৃষ্টি হল—যা আকারে ছোট, প্রকারে গভীর এবং চিত্ত-বিস্ফারক। এই নতুন রীতির রচনার নাম হল 'ছোটগল্প'।

ইংরাজীতে এ জাতীয় গল্প লেখা হচ্ছিল ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে—অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। বাঙলায় এ জাতীয় গল্প প্রথম এল রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে।

এক্ষেত্রে 'ছোটগল্প' কাকে বলে, সে

সম্পর্কে দু-চার কথা জানতে হয়ত তোমার ভাল লাগতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যের বর্ষাযাপন কবিতায় যা বলেছেন ছোটগল্পের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে তা উদ্ধার করলে মন্দ হয় না :

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারই দু-চারটি অশ্রুজল।
তারি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্পের আকার প্রকার ইত্যাদি নিয়ে অনেক বড় বড় গ্রন্থও রচিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল কথাগুলো এখানেই বলে দিয়েছেন।

প্রথমত ছোটগল্প কোন তত্ত্বকথা বলে না। মানুষের ছোট দুঃখ বা ছোট্ট কোন ব্যথার কথা তুলে ধরে। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক হাডসন বলেছেন, **'A short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion and absolute singleness of method.** এই একাগ্রতা ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রচিত কোন গদ্য বা পদ্য কাহিনীতে ছিল না।

ছোটগল্পের আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তা শেষ হয়েও শেষ হয় না। বই বন্ধ করে পাঠক গল্পের মধ্যেই তলিয়ে যান। তাঁর হৃদয়বীণা যেন বেজেই চলে। আসলে সংহত পরিসরে লেখক এক বৃহত্তর জীবনসত্যকে এমন ইঙ্গিতময় করে তোলেন যে তার হঠাৎ আলোর দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে পাঠকের মন আর তারই অনুরণন শেষ হতে চায় না। এই **Suggestiveness** ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তোমরা হয়ত জান, রবীন্দ্রনাথ স্কুলের প্রথাগত পড়াশুনা করতে পারেননি—তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়নি। এজন্য বাড়িতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ঠাস বুনট রুটিনে তাঁকে নানা বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিদ্যাচর্চার কমতি ছিল না, তবু সাহিত্য-সঙ্গীত-নাট্যচর্চার দিকেই দেখা গেল তাঁর ঝোঁক। বিলেতে পাঠালেন ব্যারিস্টারি পড়তে—রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সঙ্গীতের পাঠ নিয়ে দেশে ফিরলেন। ঠাকুর-পরিবার খানিক হতাশ হয়েই রবীন্দ্রনাথকে জমিদারী তদারক করতে পাঠালেন শিলাইদহে।

জমিদারী তদারকীতে রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা এখানে এসে পদ্মার রূপবৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাধারণ মানুষের জীবন দেখবার ঘনিষ্ঠ সুযোগ রবীন্দ্র-প্রতিভার অবরুদ্ধ দুয়ার খুলে দিল। এতদিন তিনি কবিতা লিখেছেন, সুধীজন প্রশংসাও করেছেন—এবার তাঁর কবিতা কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব বিভূতি মেখে আবির্ভূত হল। আধুনিক রবীন্দ্র-সমালোচকেরা বলছেন, এই হল যথার্থ রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ—এর আগে চলছিল প্রস্তুতি-পর্ব।

এই কালে তিনি সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী ইত্যাদি কাব্যও যেমন রচনা করেন, তেমনি রচনা করেন অসংখ্য ছোটগল্প। ঐ যে পল্লীগ্রামের কত মানুষের সংস্পর্শে এলেন কবি, জানলেন তাদের ছোট ছোট দুঃখ-ব্যথা অভাব-অভিযোগ—তা যেন রবীন্দ্রনাথের আর একটা চোখ খুলে দিল—সে চোখ ছোট গল্পকারের চোখ—বাঙলা সাহিত্য ধন্য হল।

এই সময়েই কখনও কখনও ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ এক হয়ে গেছেন। যা একটা খাঁটি ছোট গল্প হয়ে উঠতে পারত—তা হয়ে উঠল একটি পরিপূর্ণ নিটোল কাহিনী-কবিতা। এমন কবিতাগুলোর মধ্যেই 'পুরাতন ভৃত্য' একটি।

শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার তাগিদে দুটি কাহিনী-কবিতা রচনা করেন। একটির নাম 'ব্রাহ্মণ' অন্যটির নাম 'পুরাতন ভৃত্য'। মাত্র পাঁচদিন আগে পরে লেখা কবিতা দুটি। প্রথমটি ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৭ ফাল্গুন আর অন্যটি ১২ ফাল্গুন রচিত। কবিতাগুলো প্রথমে 'চিত্রা' কাব্যে সংকলিত হয়—পরে চিত্রা থেকে বাদ দিয়ে তাদের স্থান দেওয়া হয় 'কথা ও কাহিনী'তে। এখন ঐ দুটি কবিতাকেই কথা ও কাহিনীতে পাওয়া যাবে।

★

ঐ কালে রবীন্দ্রনাথের মনে ছোটগল্প রচনার যে প্রবাহ এনেছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন পূর্বোল্লেখিত 'বর্ষাযাপন' কবিতায় :—

'ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমতো
গল্প লিখি একেকটি করে।'

সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪-৯৫ সালের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি ছোটগল্প লিখে ফেললেন। এগুলো সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি যে ছোটগল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।' তাঁর এ দাবি যে কতবড় সত্য তা গল্পগুচ্ছের চার খণ্ডের যে কোন গল্প পড়লেই বোঝা যায়। তোমরা যারা গদ্য উপপাঠ্য হিসাবে 'গল্প-সংকলন' পড়ছ, তারা ইতঃমধ্যেই এ সত্যের পরিচয় পেয়েছ।

গল্পগুচ্ছের চার খণ্ডের মধ্যে অন্তত দুটি গল্পে আমরা পুরাতন ভৃত্যের মত ভৃত্যের পরিচয় পাই। এই দুটি গল্পে এবং পুরাতন ভৃত্য কবিতায় আমরা দেখি ভৃত্য প্রভুর জন্য সর্বপ্রকার আত্মসুখ এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের ভৃত্য রাইচরণ অসতর্কতায় প্রভুর পুত্রকে পদ্মার জলে হারিয়েছিল। এরপর তার নিজের পুত্র হলে সে ভাবতে শুরু করল যে, এ তার মনিবেরই পুত্র—তার মায়া কাটাতে না পেরে তার ঘরে এসে জন্মেছে। নিজের জমিজমা বিক্রি করে এই শিশুকে সে বাবুর শিশুর মত আদরে আহ্লাদে বড় করে তুলতে লাগল। যেদিন তার অর্থে টান পড়ল সেদিন সে ঐ পুত্রকে বাবুর কাছে দিয়ে এল। বাবু ভাবলেন গহনার লোভে রাইচরণ তার ছেলেকে চুরি করেছিল। চুরির অপবাদ নিয়ে রাইচরণ জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয় গল্পের নাম 'হালদার গোষ্ঠী'। এই গল্পের ভৃত্যের নাম রামচরণ। তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তার শরীর রক্ষা ও শরীর পাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহরক্ষা করা। যদি সে নিঃশ্বাস লইলে বাবুর নিঃশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া পীড়ন করিতেছেন। কেন না, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু, এই সকল ছুরি ছুরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া

তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।'

'পুরাতন ভৃত্য' বা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ ভৃত্যের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কোন মানসিকতা থেকে ভৃত্য প্রভুর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে তার কোন বর্ণনা বা ব্যাখ্যা ঐ দুই ক্ষেত্রে নেই। 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের উদ্ধৃতাংশে রবীন্দ্রনাথ সেই মানসিকতারই ব্যাখ্যা করেছেন। পুরাতন ভৃত্য পড়তে বসবার আগে 'ভৃত্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতা তোমাদের জেনে রাখা অনাবশ্যক নয়।

এখানেও আর একটি তথ্যের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তোমাদের মধ্যে যাদের পক্ষে সম্ভব হবে তারা রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতির 'ভৃত্য রাজকতন্ত্র' পড়ে ফেলবে।

মস্ত বড় পরিবারের শিশু হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে। সে স্মৃতি সতত সুখের নয়। একজন নিজের কাজ সহজ করে নেওয়ার জন্য বালক রবিকে এক জায়গায় বসিয়ে চারদিকে গণ্ডি এ'কে ভয় দেখাত বাইরে বের হলেই সর্বনাশ। সীতার কথা মনে করে বালক রবি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত গণ্ডির মধ্যে। আর একজন জলখাবারের জন্য দুখানা লুচি দিয়েই জিজ্ঞেস করত, আর দেব কি? বালক জানত যে আরও চাইলে ভৃত্য অপ্রসন্ন হবে। অতএব ভৃত্যের প্রসন্নতা বজায় রাখতে বালক প্রভু প্রয়োজন থাকলেও বলতেন আর চাই না। আফিং-ভক্ত ভৃত্য দুধ সম্পর্কেও এমন কার্পণ্য বোধ করত। বালকও দুধ না খেয়ে তার নেশা পূরণের সহায় হত।

ভৃত্যদের সম্পর্কে এই সকরুণ স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ রামচরণ, রাইচরণ বা কেষ্টার ছবি পেলেনই বা কোথায় আর আঁকলেনই বা কি করে? মানুষের প্রতি কতখানি সহানুভূতি এবং সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার তিক্ততাকে তুচ্ছ করেও এমন এক সত্য চিত্র আঁকা যায়—তা ভাবতে বসলেও অবাক লাগে।

[আজকের আলোচনা কোনক্রমেই তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারে কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু সাহিত্য-পাঠের কালে শুধুই পরীক্ষামুখী হওয়ায় বৃহত্তর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমরা তোমাদের তেমনভাবে বঞ্চিত করতে চাই না। আজ অনাবশ্যক মনে হলেও, অদূর ভবিষ্যতে দেখবে এর প্রত্যেক তথ্য তোমাকে কেমনভাবে সাহায্য করছে।]

পদ্য সহায়ক পাঠ

কথা ও কাহিনী

অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার জন্য আমরা কথা ও কাহিনী থেকে প্রতিনিধি, মস্তক-বিক্রয়, মূল্যপ্রাপ্তি, স্পর্শমণি ও বন্দীবীর এই পাঁচটি কবিতা পড়েছি। এর ভেতর তোমাকে মুখস্থ করতে হয়েছে শেষ তিনটি। পর্ষদের নির্দেশমত প্রথম দুটি তোমাদের মুখস্থ না করলেও চলবে।

এবারে আমাদের নবম শ্রেণীর জন্য অবশিষ্ট পাঁচটি কবিতা পড়তে হবে। সেগুলো হল মানী, প্রার্থনাতীত দান, নকলগড়, পণরক্ষা এবং পুরাতন ভৃত্য। এবারে মুখস্থ করতে হবে মাত্র দুটি কবিতা। ১. নকলগড়, ২. পুরাতন ভৃত্য।

নিশ্চয়ই বুঝছ যে এবারে উপপাঠ্যে তুমি কিছু সহায়তা পেয়ে গেলে। পাঠ

সংকলনের জন্য 'পুরাতন ভৃত্য' তোমাকে মুখস্থও করতে হচ্ছে, জানতেও হচ্ছে গভীরভাবে। ওতেই তোমার উপপাঠ্যের কাজ চলবে। আসলে তোমাকে পড়তে হবে চারটি কবিতা এবং মুখস্থ করতে হবে একটি। আজ আমরা 'মানী' কবিতা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি।

মানী

এ কবিতাটির উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু লেখেননি। কাহিনীটি ইতিহাস-আশ্রিত। টডের 'রাজস্থানে'ও এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। অতএব সেখান থেকে বা অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে এ কাহিনী গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

প্রশ্ন

'মানী' কবিতাটির উৎস কি বলে অনুমান করা যায় ?

১৩০৬ সালের ১ কার্তিক এই কবিতাটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। আগেরদিন লিখেছেন 'বন্দীবীর' আর পরদিন 'প্রার্থনাতীত দান'। অর্থাৎ মনে হয় ঐ সময় মোগল, শিখ, রাজপুত সংগ্রামের ইতিকথায় জারিত ছিল রবীন্দ্রনাথের মন। এই সব কবিতার কোনটিতে মোগল সম্রাটের মহত্ত্ব কোথাও তাদের অত্যাচারই প্রধান কথা হয়ে উঠেছে।

এই কবিতাটিতে মোট সাতটি স্তবক আছে। প্রতি স্তবক মোট সাত পংক্তি। কবিতার অনুচ্ছেদগুলো সুষম। ধ্বনি-মাত্রিক ছন্দে রচিত কবিতাটি সুখপাঠ্যও বটে।

প্রথম স্তবক

আলোচনা : প্রথম পংক্তিটি শব্দ-গত অর্থের দিক থেকে বিভ্রান্তিকর। খান খান করা অর্থ টুকরো টুকরো করা। আরঙজেব (বানানটি লক্ষ্য করবে। এর উত্তর লিখতে অন্য বানান লিখবে না) কি ভারতকে টুকরো টুকরো করেছিলেন ? না, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভারতের যে সব রাজ্য জয় করতে পারেননি, সেগুলোও জয় করে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়তে চেয়েছিলেন ? তাহলে 'আরঙজেব যখন ভারতকে খান খান করছিলেন' বলবার অর্থ কি ?

আসলে এখানে কবি আরঙজেবের কাজকে অন্য দিক থেকে বিচার করেছেন। আকবর থেকে শাজাহান পর্যন্ত গোটা ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পদানত নয় এমন বহু রাজ্য ছিল। তারা দু'একটা যুদ্ধ করে রাজ্য সম্প্রসারণ না করেছেন এমনও নয় তবু তাঁরা সামগ্রিকভাবে ভারতের শান্তিকে বিঘ্নিত করেননি। ভ্রাতৃবিরোধের ভিতর দিয়ে সিংহাসন পেতে পেতেই আরঙজেব ভারতের সামগ্রিক শান্তি তছনছ করে দেন—খান খান করে দেন।

মূলকথা : এমনি করে ভারতের শান্তি যখন ভঙ্গুর পদার্থের মত শত খণ্ডে বিভক্ত করে তুলেছিলেন আরঙজেব, তখনই একদিন মাড়বারের রাজা যশোবন্ত সিংহ এসে বললেন, ওগো প্রভু ! শুনুন ! রাঠোর সর্দার মুকুন্দদাস, সম্রাট যাকে নহর খাঁ (ব্যাঘ্রপতি) উপাধি দিয়েছিলেন, রাতের অন্ধকারে গোপনে গিয়ে অচল-গড়ের অধিপতি সিরোহিনায়ক সুরতানকে বন্দী করে এনেছে। তিনি এখন আমার বাড়িতে বন্দী রয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে সম্রাটের কি ইচ্ছা, তা আমাকে জানান।

আলোচনা : এই স্তবকে আমরা মোট চারজনের পরিচয় পেলাম। প্রথম আরঙজেব। এই মোগল সম্রাটের কথা তোমাদের নতুন করে বলার নেই। ইতিহাসে তোমরা আগেই পড়েছ।

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মারবপতি বলে

উল্লেখ করা হয়েছে। একটু পরেই দেখবে রবীন্দ্রনাথ ওঁকে মাড়োয়ারাজ বলে উল্লেখ করেছেন। দুই-ই এক—ইনিই যশোবন্ত সিংহ। ইনি প্রকৃতপক্ষে যোধ-পুরের অধিপতি। তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। বিশেষত গুর্জর প্রদেশের অধিকার পেয়ে ইনি দারার পক্ষ ত্যাগ করে আরঙজেবের পক্ষ গ্রহণ করেন। তবু তিনি ব্যক্তিত্বময় এবং স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন।

তৃতীয় যে চরিত্রের উপস্থিতি এই স্তবকে তার ক্ষুদ্র উল্লেখ আছে 'নহর' বলে। নহর আসলে একজন রাঠোর বংশীয় রাজপুত। এ'র প্রকৃত নাম মুকুন্দদাস। এ'র বীরত্বের জন্য সম্রাট এর উপাধি দেন নহর খাঁ। নহর খাঁ কথাটির অর্থ ব্যাঘ্রপতি। ইনি অচলগড়ের অধিপতি সুরতানকে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে, বন্দী করে এনে তুলে দেন যশোবন্ত সিংহের হাতে।

চতুর্থ ব্যক্তি হলেন সিরোহিপতি, যাঁর নাম সুরতান। এ'র রাজ্যের বড় অংশই মরুভূমি। সামান্য রাজ্য। তবু তিনি আরঙজেবের বশ্যতা স্বীকার করতে চাননি।

প্রশ্ন

১. 'আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান খান'-
আরঙজেব কি সত্যিই ভারতকে খান খান করেছিলেন? যদি না করে থাকেন, তবে রবীন্দ্রনাথ এমন লিখলেন কেন?

২. 'মারবপতি কহিল আসি'—মারবপতি যা বললেন তা নিজের ভাষায় বল।

৩. 'নহর যারে এনেছে ধরে'—নহর কে? সে কাকে ধরে এনেছে? কিভাবে ধরে এনেছে?

দ্বিতীয় স্তবক

মূলকথা: যশোবন্তের কথা শুনে অবাক হলেন আরঙজেব। বললেন, 'এ কি অদ্ভুত কথা শুনছি। এতদিনে কি তবে বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ ধরা পড়ল! মাত্র কয়েকশ' পাহাড়ী সৈন্য নিয়ে পাহাড়ে বনে বেড়াত যে স্বাধীন রাজপুত—চকিতে আবির্ভাব চকিতে প্রস্থান ছিল যার—মরুভূমির মরীচিকার মত অপ্রাপণীয় ছিল যার বন্দিত্ব—সেই কি না বন্দী হয়েছে? তাকে দেখতে চাই। তাকে আনতে কোন রাজদূত পাঠাও।

আলোচনা: আরঙজেবের কথার ভেতর দিয়ে সুরতানের চরিত্রও যেমন ফুটে উঠেছে, তেমন ফুটেছে সুরতানের প্রতি সম্রাটের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ। স্বাধীনতাকামী এই সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে পর্বত অরণ্যে দিনযাপন করেও যে মাথা উঁচু করে রয়েছেন—এ জনাই তাঁর প্রতি আরঙজেবের শ্রদ্ধা। তাই তিনি তাকে 'অশনি-ভরা বিদ্যুৎ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাকে বলেছেন 'মরুভূমির মরীচিকা'।

শেষ পংক্তিতে 'রাজদূত' পাঠাবার কথায় তাঁর প্রতি আরঙজেবের আরও শ্রদ্ধার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন

১. 'কী কথা শুনি অদ্ভুত।'—এ কথা কে কাকে বলেছেন? অদ্ভুত কথাটি কি? এ কথাকে অদ্ভুতই বা বলা হয়েছে কেন?

২. 'আনিতে তারে পাঠাও কোন রাজদূত।'—এ কথা কে কাকে বলেন? কাকে আনতে বলা হল? রাজদূতই বা পাঠাতে বলা হল কেন?

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মূলকথা ঃ আরঙজেবের কথা শুনে মাড়োয়াররাজ যশোবন্ত হাতজোড় করে বললেন, সুরতান সামান্য ব্যক্তি নন। তিনি ক্ষত্রকুল সিংহশিশু। তিনি আজ রয়েছেন আমার গৃহে। বাদশাহ যদি তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চান, তবে আগে আমাকে কথা দিন যে তাঁকে কোন অসম্মান করা হবে না—তবেই আমি নিজে গিয়ে সমাদর করে তাঁকে নিয়ে আসব।

আলোচনা ঃ এই অনুচ্ছেদে আরঙজেবের কথায় যশোবন্তের প্রতিক্রিয়া দেখান হয়েছে। আরঙজেব খুব সরল ব্যক্তি নন। যশোবন্ত জানেন যে সুরতানকে রাজসভায় আনলে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখান আরঙজেবের পক্ষে অসম্ভব নয়। যশোবন্তের নিজের চরিত্রের দুটি দিক। একদিকে তিনি বুঝেছেন যে মোঘলদের বিরোধিতা করে টে'কা যাবে না তাই তিনি তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন কিন্তু তার মধ্যেও তিনি প্রবল রাজপুতগর্ব নিয়ে স্বতন্ত্র—বশ্যতা স্বীকার করেও নত মস্তক নন। তিনি চান সুরতানও ঐ সম্মানটুকু বজায় রাখতে সমর্থ হন। সুরতান সম্পর্কে তাঁর এই মানসিকতার মধ্যে সুরতানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ অভিনন্দনই ফুটে উঠেছে। তাই একদিকে তিনি তাঁকে ক্ষত্রকুল-সিংহশিশু বলে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে তাঁকে রাজদরবারে আনতে অন্য কোন রাজদূতকে না পাঠিয়ে নিজেই রাজদূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। উক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে যশোবন্তের তেজ, পৌরুষ, নির্ভিকতা এবং স্পষ্টভাষণের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন

১. রাজদূত পাঠিয়ে সুরতানকে রাজ-সভায় আনবার প্রস্তাবে যশোবন্ত কি বললেন ?

২. 'ক্ষত্রকুলসিংহশিশু লয়েছে আজি মোর ঘর'—এ কথা কে কাকে বলেছেন ? ক্ষত্রকুলসিংহশিশু কে ? বক্তা তাঁর প্রতি এত সপ্রশংস কেন ? এর দ্বারা তাঁর ও বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় পাও।

৩. 'বাদশা তাঁরে দেখিতে চান-বচন আগে করুন দান'—বক্তা কে ? এর মধ্যে তাঁর চরিত্রের কি পরিচয় পাও ?

কবিতা সংকলন

ইতঃপূর্বে আমরা এই পদ্য উপপাঠ্যটির পাঁচটি কবিতা পড়েছি। কবিতা পাঁচটি হল 'ভারতবিলাপ', 'ধাত্রী পান্না', 'অশোকতরু', 'দুর্ভাগা দেশ' এবং 'তা বটেই তো তা বটেই তো। এর ভেতর ভারত-বিলাপ, দুর্ভাগা দেশ এবং তা বটেই তো তা বটেই তো তোমাকে মুখস্থ করতে বলা হয়েছে।

অবশিষ্ট যে কর্মভার পড়ে আছে তা হল, সুখ, মা, সাগর-তর্পণ, ডাক-হরকরা এবং রথযাত্রা নামে পাঁচটি কবিতা পড়া এবং এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি মুখস্থ করা। আজ আমরা সুখ কবিতাটি শুরু করব।

সুখ ঃ কামিনী রায়

'সুখ' কবিতাটি পড়ার আগে কবি কামিনী রায় সম্পর্কে একটু জেনে নাও।

কবি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালের মানুষ। তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন সাবজজ এবং বঙ্কিম সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঔপন্যাসিক। কামিনীদেবী মাত্র আট বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন। 'সুখ' কবিতাটি তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্বেই রচনা করেছিলেন। বলা যায় তখন তাঁর বয়স তোমাদেরই কাছাকাছি। বছর পনের বয়সের মধ্যেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া'র সব কবিতাই রচিত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে তিনি অনার্সসহ বি. এ. পাশ করে বেথুন কলেজে শিক্ষকতা পদ পান। তাঁর কাব্যগ্রন্থ অনেকগুলো। পরবর্তী জীবনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি, 'নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশনে'র অন্যতম সদস্যা ছিলেন। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করেন।

তাঁর স্বামী কেদারনাথ রায় ছিলেন স্ট্যাটিউটারী সিভিলিয়ন। ১৯৩৩ সালে কামিনী রায় পরলোকগমন করেন।

কবি সম্পর্কে পরিবেশিত এই সামান্য তথ্যের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মত তথ্য হল এই যে, এই কবিতাটি কবির স্কুল-জীবন শেষ করার আগেই রচিত হয়েছিল। কবিতা সংকলনের পেছন-দিকের 'সংক্ষিপ্ত পরিচয় পঞ্জী'তে এই কবিতা সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো বলা আছে।

১. এই কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
২. এর ছন্দের নাম লঘু চৌপদী।
৩. এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়েছে।
৪. এই কবিতার ভাষা গদ্যাত্মক হলেও রচনাটি কতকগুলো নীতিগর্ভ সূক্তির মালা বলে মনে হয়।

মূল কবিতা থেকে এখানে মাত্র সতের স্তবক তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সতের স্তবকের প্রথম দিকে হতাশার বর্ণনা—জীবনে সুখ কোথায়? সমস্ত সুখস্বপ্ন তারার মত খসে পড়ল মাটিতে। মানুষের জীবনে কি তবে সুখ নেই? অষ্টম স্তবক থেকেই চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষুদ্র সুখ হয়ত মানুষের ভাগ্যে নেই তবে আছে উচ্চতর লক্ষ্য—উচ্চতর সুখ। কি সে সুখ? কবি সিদ্ধান্তে এসেছেন—পরার্থপরতাতেই সুখ—আত্মত্যাগেই সুখ। এই মহৎ উপলব্ধিতেই কবিতাটি সমাপ্ত।

এবার কবিতা পাঠ শুরু করা যাক।

প্রথম চার স্তবক

মূলকথা ঃ সাধের বীণাটি ভেঙে গেছে—তার মধুস্রাবী তারটিও গেছে ছিঁড়ে। (মহীরুহের) সরস মুকুল গেছে শুকিয়ে। আর কি তাহলে অবশিষ্ট থাকল?

হায়! আশার সকল প্রদীপ নিভল। ভেঙেচুরে গেল সকল বাসনা। অকালে সুখের স্বপন ভেঙে গেল—এখন জীবন মরণ সবই সমান।

দেখলাম এ পৃথিবী মরীচিকার মত মরুভূমির মত পড়ে আছে। বাসনার পিপাসায় মাতাল হয়ে উঠেছে মানুষ—আর তাই আশার ছলনায় পুড়ে মরছে।

যে লক্ষ্য করে ছুটেছিলাম তা তারার মত খসে পড়ল। যা কিছু আলো ছিল—ডুবে গেল আঁধারে—চোখ মেললাম শুধু অন্ধকার দেখতে—বুক ভেঙে হল শতধা।

আলোচনা ঃ এবার অনুচ্ছেদে হতাশারই বর্ণনা। লক্ষ্য করে দেখ সব বর্ণনার ভেতর দিয়ে আত্মসুখের কথাই ফুটে উঠেছে। যে বীণা, যে মহীরুহ, যে লক্ষ্যতারা—সবই কোন মানুষের ব্যক্তি জীবনের। ব্যক্তিসুখের একটা উচ্চআশা

নিয়ে মানুষ কোন লক্ষ্যমুখে ছুটে চলে। লক্ষ্যচ্যুত হলেই মনে হয় তার ছিঁড়ে গেছে, ভেঙে গেছে বীণা, শুকিয়ে গেছে সরস মুকুল—এ জীবন মরীচিকাময়—মরুভূমির মত। এখন বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ায় পার্থক্য কি? কোথায় আশার আলো? অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার।

কবির বক্তব্য ব্যক্তিসুখের স্বপ্ন নিয়ে যারা ছুটে যায়, এমন অ-সুখ, এমন হতাশা তাদেরই।

প্রশ্ন

১. 'জীবন মরণ একই মত।'—এ কথার অর্থ কি? কি অবস্থায় এমন অনুভূতি হয়?

২. 'হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী মরুভূমি-মত রয়েছে পড়ে।'—কি অবস্থায় সংসারকে লোকে এমন দেখে? এইরূপ দেখার কারণ কি?

৩. 'সকলি গিয়াছে—কি আছে আর?' —কি কি 'গিয়াছে'? কি থাকবার কথা ছিল?

৪. 'লক্ষ্যতারা ভূমে খসিয়া পড়িল।' —লক্ষ্যতারা কি? তা ভূমিতে খসবার কারণ কি? এ কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি?

পঞ্চম থেকে সপ্তম স্তবক

মূলকথা ঃ প্রাণ গেলে যদি এ জ্বালা কমে তবে যাক প্রাণ। আয় ভাঙা বীণা আবার গান গাই। যন্ত্রণা—যন্ত্রণা—যন্ত্রণাই সার হয়েছে জীবনে—মানুষের ভাগ্যে সুখ নেই কখনও।

বিষাদ—বিষাদ—সর্বত্রই বিষাদ। নর-ভাগ্যে সুখ লেখা নেই। কাঁদবার জন্যই যেন মানবজীবনের আবির্ভাব—যতদিন বেঁচে থাকব—ততদিন কেঁদেই যেতে হবে।

তবে কি সুখ নেই? মানবজীবনে কি সুখের কোন অস্তিত্বই নেই? এ পৃথিবী কি শুধুই বিষাদে ভরা! যন্ত্রণায় জ্বলে, কেঁদে মরবার জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ করে?

আলোচনা ঃ এই অংশে কবির চিন্তায় অবিমিশ্র হতাশা নেই। আর একবার ভাঙা বীণা নিয়েই বাজাবার অর্থাৎ সুর ও সুখের সন্ধান করতে চেয়েছেন। সংসারের সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যেও কবির মনে জেগেছে সামান্য আশা। কিন্তু এ আশাও ক্ষণিক-দীপ্ত। কবির হৃদয় দ্বিধায় দুলছে। আবার হতাশা। কবি স্থির করেছেন মানবজীবনে শুধুই দুঃখ—কাঁদবার জন্যই তার জন্ম। কিন্তু এটাও এই অংশের শেষ কথা নয়। একবার আশা ও একবার হতাশার মধ্যে দুলে শেষে কবি সংশয়ে বাসা বেঁধেছেন। প্রশ্নে শেষ হয়েছে বক্তব্য। তবে কি সুখ নেই? তবে কি ধরা শুধুই বিষাদময়? তবে কি শুধু কেঁদে মরতেই জন্ম নেয় মানুষ?

মনে রেখ এমন সংশয় ও প্রশ্নের ভেতর দিয়েই মানুষ এসে পৌঁছায় দার্শনিক উপলব্ধিতে। পরের স্তরে তাই হয়েছে।

প্রশ্ন

১. 'আয় ভাঙ্গা বীণে আবার গাই'—এই উদ্ধৃতি থেকে কবির মনোভাব বুঝিয়ে দাও।

২. 'নাই কি রে সুখ? এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?'—কোন অবস্থায় কবির মনে এই প্রশ্ন? এই প্রশ্ন থেকে পরে কবি কোন উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন?

অনুবাদ

গত সংখ্যায় প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির অনুবাদ নিচে লক্ষ্য কর।

প্রাথমিক অনুবাদ

প্রথম বাক্য ঃ গরীব স্ত্রীলোকটি / একদা / বুদ্ধের কাছে এল / তাকে জিজ্ঞাসা করতে / তিনি তাকে কোন ওষুধ দিতে পারেন কিনা / ফিরিয়ে আনতে তার মৃত শিশুকে জীবনে //

দ্বিতীয় বাক্য ঃ পুণ্য লোকটি / স্পর্শিত হয়ে / স্ত্রীলোকটির গভীর বেদনার দ্বারা / বলল তাকে যে / যেখানে ছিল একটি ওষুধ / যা পারত ফিরিয়ে আনতে তার পুত্র //

তৃতীয় বাক্য ঃ 'তুমি কি আনতে পার একমুঠো সরষে / একটি গৃহ থেকে / যেখানে মৃত্যু কখন প্রবেশ করেনি //

চতুর্থ বাক্য ঃ বেদনার্ত মা / এক দরজা থেকে আর এক দরজায় গেলেন / সরষে চাইতে চাইতে / কিন্তু / ফিরে এলেন / ভারী মন নিয়ে / পবিত্র লোকটির কাছে //

পঞ্চম বাক্য ঃ তখন বুদ্ধ বললেন তাকে মৃদু ভাবে যে / সে নিশ্চয়ই বেশি চিন্তা করবে না তার দুঃখ সম্পর্কে / যেহেতু দুঃখ এবং মৃত্যু হয় সাধারণ সকলের কাছে //

খসড়া অনুবাদ

একদা গরীব স্ত্রীলোকটি বুদ্ধের কাছে জিজ্ঞাসা করতে এল যে তিনি তার মৃত শিশুকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে কোন ওষুধ দিতে পারেন কিনা।

পুণ্য লোকটি স্ত্রীলোকটির গভীর বেদনার দ্বারা স্পর্শিত হয়ে বললেন যে তার পুত্রের জীবন ফিরিয়ে আনতে একটি ওষুধই আছে।

'যেখানে কখন মৃত্যু প্রবেশ করেনি এমন গৃহ থেকে তুমি কি একমুঠো সরষে আনতে পার ?'

বেদনার্ত মা সরষে চাইতে চাইতে এক দরজা থেকে আর এক দরজায় গেলেন কিন্তু ভারী মন নিয়ে ফিরে এলেন পবিত্র লোকটির কাছে।

তখন বুদ্ধ তাকে মৃদু ভাবে বললেন যে নিশ্চয়ই এখন সে আর নিজের দুঃখকে বড় বলে ভাববে না যেহেতু দুঃখ এবং মৃত্যু সকলের কাছেই সাধারণ।

চূড়ান্ত অনুবাদ

একদিন একটি গরীব স্ত্রীলোক বুদ্ধের কাছে জিজ্ঞেস করতে এল যে তিনি তাকে এমন কোন ওষুধ দিতে পারেন কিনা যা তার মৃত শিশুকে পুনর্জীবন দান করবে। পুণ্যাত্মা স্ত্রীলোকটির গভীর বেদনায় ব্যথিত হয়ে বললেন যে তার পুত্রকে পুনর্জীবন দিতে একটি ওষুধই আছে। 'যে বাড়িতে কেউ কখন মারা যায়নি এমন বাড়ি থেকে তুমি কি একমুঠো সরষে আনতে পার ?' বেদনাবিধুর মাতা সরষে ভিক্ষা করতে করতে দরজায় দরজায় ঘুরলেন কিন্তু পুণ্যাত্মা বুদ্ধের কাছে ফিরে এলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। তখন বুদ্ধ তাকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন যে এখন নিশ্চয়ই তার নিজের দুঃখকে আর গভীর বলে মনে হবে না। কারণ দুঃখ আর মৃত্যু সকলের কাছে আসবেই।

অনুশীলনের জন্য

Muhammad Mohasin was a very rich man of Hooghly. But he was famous for his kindness.

One night he was sleeping in his room. The night was

dark and still. Suddenly he heard a sound. He woke up and lighted a lamp. In the light he saw a man shaking with fear. Mohasin asked him why he had come there. The thief began to weep. Mohasin then asked him, 'You do not seem to be a set hand. How long are you in this line?' The thief said in a broken voice, 'Sir, I am quite new. I am very poor. My family has been without food for days together I have had no job and so cannot earn anything. So I come to your house to steal.'

Hearing this Mohasin melted. He gave him money. A job also was given to him.

ভাবসম্প্রসারণ

এবারে ভাব সম্প্রসারণের জন্য আমরা একটি আধুনিক কবিতার দুটি পংক্তি তুলে দিলাম।

ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে
গোলাগুলির গোলাতে নয়,
গভীর ভালবেসে।

এই পংক্তি দুটি আমাদের মনে কি ভাব জাগিয়ে তুলছে? ভয়কে হেসে জয় করব। অর্থাৎ ভয়কে ভয় পাব না। গোলাগুলি দিয়েও ভয়কে তাড়াব না। আমাদের পথ হবে ভালবাসার পথ। প্রীতির পথ। অর্থাৎ পশুশক্তিকে আমরা স্নেহ প্রেম দিয়ে বশ করব।

এই ভাবটিকেই নিচে বাড়ান হল।

মানুষকে জয় করার অস্ত্র দুটি। এক শক্তি দিয়ে, দুই ভালবাসা দিয়ে। এই দুই-এর মধ্যে দ্বিতীয় পথটিই মহৎ।

সাধারণভাবে মানুষ শক্তিকে ভয় করে। অস্ত্রবলেই বিশ্বজয়ী বাহিনী বের হয় দিগ্বিজয়ে। তাদের পশু-শক্তির কাছে সুসভ্য রাজ্য জনপদ সব একের পর এক হয় পদদলিত। কিন্তু সেইসব পদদলিত রাজ্যের একজন মানুষও সেই জয়কে হৃদয়ের সঙ্গে বরণ করে না। তারা মনের আক্রোশ মনের মধ্যেই চেপে রাখে এবং কপট প্রসন্নতা দেখায় এবং সুযোগ পেলেই চাপা আক্রোশে ফুঁসে ওঠে। কিন্তু যে মানুষ অস্ত্র ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে বিশ্বমানবের মধ্যে নিজের ভালবাসা ও সহানুভূতি ছড়িয়ে দিতে পারে, তার আসন টলান যায় কি?

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক এ কথা অনুভব করেছিলেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেছিলেন কিন্তু জয়ের আগে সেই দেশে বিজেতার প্রতি যে ধিক্কার তিনি শোনেন তাতে তিনি বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। শেষে তিনি যুদ্ধ জয় ত্যাগ করে ধর্মবিজয়ের পথ বেছে নেন। এর ফলে অশোক চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হন। পৃথিবীতে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু একজন মাত্র রাজপুত্র আজও মানুষের মনে রাজপুতের মত বেঁচে আছেন।

তাই, ভয়কে যেমন হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চাই, তেমনি চাই সকলের জন্য বুক-ভরা ভালবাসা। আর তাতেই বিশ্বজয় হবে।

প্রবন্ধ রচনা

গত সংখ্যায় আমরা প্রকৃতি-বিষয়ক, আরও নিখুঁতভাবে বললে, কতকগুলো ঋতু বিষয়ক রচনা দিয়েছি। এবারেও আমরা একটি ঋতু-বিষয়ক রচনা দিলাম। কিন্তু মনে রেখ, ঋতু-বিষয়ক রচনাগুলোর সঙ্গে এ রচনাটির উপস্থাপনগত পার্থক্য অনেক। পার্থক্যগুলো তোমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে এখানে প্রবন্ধটি দেওয়া হল।

বাঙলার ফুল-ফল

বাঙলা দেশ এক বিচিত্র দেশ। এর উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়, যা একদিন নাকি ছিল সমুদ্রগর্ভে। ফলে কেবলমাত্র নিম্ন-বঙ্গের ব-দ্বীপ অঞ্চলই নয়, সমস্ত দেশটির বুক জুড়ে ছিল পলল আর পলল। দীর্ঘকাল চাষের কারণে নদী সরে যাওয়ায় কোথাও কোথাও আজ বন্ধ্যা মাঠ, নিস্ফলা জমি দেখা যায় বটে, তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে বাঙলার রূপের এটাই শেষ কথা নয়। কবি বাঙলার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

মেঘ কুন্তলা বন অঞ্চলা সুজলা বঙ্গভূমি।
ফুলে আর ফলে, রূপে আর রসে তুলনা-
বিহীনা তুমি!

দেশে যার প্রাচুর্য, স্বাভাবিক ভাবে তা দেশাচারের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে ফুল ও ফলের প্রাচুর্যই আমাদের সামাজিক আচার বিচারের অংশ নিয়েছে। আমাদের দারিদ্রের সংসারে বনফুলই শোভার অলঙ্কার। একসময় বাঙলা দেশের ফুলের অলঙ্কার হার মানাত জড়োয়ার গহনাকেও। আমরা আমাদের প্রাণের আকুতি অন্তরের ভক্তি জানিয়ে থাকি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। আমাদের দেশে বিয়ের উৎসবে ফুলশয্যা নামে যে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে এর নজীর আর কোন দেশে আছে বলে জানা নেই। যে কোনরকম ব্রত উপবাসে বাঙালীর খাদ্য বলতে শুধু ফল। 'ফল-আহার' কথাটি থেকেই বাংলাদেশের ফলার কথাটির উৎপত্তি বলা চলে। অম্বুবাচীতে, এ ছাড়া নানাজাতীয় পুণ্যকর্মে ফলই আমাদের প্রধান উপচার। দেবতার নৈবেদ্যেও ফলেরই তাই প্রাধান্য লক্ষ্য করি আমরা।

ষড়ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রকৃতিও আপন যত্নে ফুল ফোটাতে থাকে। আর সেইসব ফুলের গন্ধ এত তীব্র যে, 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই।' গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে যখন তৃণদল গাছটি পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, সেই সময় চাঁপা তার গন্ধ ছড়িয়ে আকাশ বাতাস আমোদিত করে তোলে। বকুলের ছোট ছোট ফুলে বনবীথি যায় ঢেকে। গন্ধরাজ, বেলার সুবাসে গ্রীষ্মবাসর হয়ে ওঠে আনন্দমুখর। রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের এই কালটিকে বলেছেন তপস্বীর কাল। এই সময় আমরা পাই ফলের রাজা আমকে। পাই বহু রকম বৈচিত্র্যে-ভরা স্বাদের আম। যেমন—ল্যাংড়া, বোম্বাই, গোলাপ-খাস, তোতাপুলি, বেগমখাস, হিম-সাগর। আর পাই কাঁঠাল। এ ছাড়া লিচু, জামরুল, পেয়ারা, তরমুজ ত আছেই।

বর্ষা যদিও বন্যা মহামারীর কারণ তবু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বর্ষাই আমাদের প্রাণস্পন্দনের মূল চাবিকাঠি। বর্ষার জল জোগান দেয় আমাদের মুখের

আহার। বর্ষার জলেই হয় সারা বছরের চাষ। বর্ষাকে নিয়ে তাই অনেকেই অনেক কাব্য করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে কুরচি, কদম্ব, কেতকী যা বাঙলা কাব্যের অমর সৃষ্টি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। বর্ষায় অসংখ্য বুনো নামহারা ফুলের কথা বাদ দিলেও এই সময় অনেক নামী ফুলও ফোটে। যদিও এদের মধ্যে শ্বেতবর্ণের ফুলই বেশি। অবশ্য জবা-ধরনের উজ্জ্বলবর্ণ ফুলও এই ঋতুর ফসল। বর্ষার প্রধান ফল আনারস যা একাই একশ।

উৎসবের ঋতু শরৎ। ফসল পাকার প্রতীক্ষায় চাষী অপেক্ষা করে এই সময়ে। চারিদিকে উৎসবের সাজ। আকাশও যেন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে হাল্কা সাদা মেঘ গায়ে জড়িয়ে নিয়ে। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাশফুলের ঝাঁকও যেন নদীর পাড়ে পাড়ে পাল্লা দিতে থাকে। শেফালি ফুলের হলুদ রং আনন্দের প্রতীক হিসেবে এই সময়েই ফোটে। দোপাটি, সর্বজয়া, অতসী, সন্ধ্যামণি, স্থলপদ্ম, নানা জাতের জলপদ্ম, শাপলা শরতের আনন্দ গায়ে মেখে হাজির হয় একে একে এই সময়টাতেই। এই সময়কার ফলের সম্ভারে কিছুটা টান দেখা যায়। যদিও বারোমেসে নারকেল, শশা, কলা, আখ এই শরৎকালেরই ফল।

হেমন্ত ঋতুর বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ঋতুর মত বিশেষ কিছু নেই। এই ঋতুটিতে শরতের সম্প্রসারণ, অন্যদিকে শীতের প্রস্তুতি চলে।

শীত ঋতু ফুলে ও ফলে সমৃদ্ধ হয়ে আসে আমাদের সামনে। অশোক, পলাশ শিমূল দিগন্তকে লাল আভায় রাঙিয়ে তুলে আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির হয়: গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা (ক্রিসেন্থামাম্), করোনেশন, গ্লাডিউলি-ধরনের ফুলও এই সময়কার ফুলের মেলায় এসে আসর জমিয়ে বসে। এই ঋতুর ফসল কমলা। শাকালু, কুল, নারিকেল-কুলের মরশুমও এই সময়েই।

বসন্ত আসে ফুলের বাহার নিয়ে। শীতের সব ফুলের সঙ্গে মিলন হয় গ্রীষ্মের ফুলের। বসন্তে প্রাধান্য দেখা যায় বারোমেসে ফুলের।

একসময় এই ফুল বাঙালীর মনকে প্রফুল্ল করে রাখত, ফল রাখত শরীরকে সুস্থ ও সবল। অনেক দরিদ্র পরিবার অন্য খাদ্যের অভাবে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, তাল, নারকেল ফল খেয়েই দিন কাটাত।

বাঙালীর ফুল ত 'মালাকর' নামে এক সম্প্রদায়েরই জন্ম দিয়েছিল।

ইংরেজ শাসনের আরম্ভ থেকেই বাঙালীর প্রাচীন জীবনযাত্রা ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। ফলে, ফুল ও ফল আজ প্রবাদ মাত্র। যেটুকু ফুল ফোটে তা ধনীর অর্থে কেবল তার ড্রয়িংরুমের শোভা বাড়ায়। ফল গিয়ে জায়গা নেয় হিমঘরে।

আজ আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি যে, আবার আমাদের দেশে সেই দিন আসুক, যে দিন আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বাড়তি জমি থাকবে—থাকবে এক টুকরো অবসর। আমরা সেই এক টুকরো জমিতে ফুল ফোটাব, ফল ফলাব। যা ধনীর অর্থ দিয়ে কেনা যাবে না—যা হিম-ঘরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমাদের সুজলা সুফলা জমির দানে আমাদের প্রত্যেকটি ঘরের ছেলে ও মেয়েরা দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ভাব সংকোচন

গত সংখ্যায় প্রদত্ত অনুশীলনীর অনুচ্ছেদটি পড়লেই এর মূলকথা তোমাদের মনে ধরা পড়বে। এতে সুখ ও আনন্দের মধ্যে প্রভেদ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাধারণত সুখ আর আনন্দের মাঝের সীমারেখা আমাদের নজরে আসে না। একই অনুভূতির নামান্তর মনে হয়। অথচ বিপরীত মেরুতে এদের অবস্থান। লেখক তাই সাবলীলভাবে এদের চরিত্রগত প্রভেদ তুলে ধরেছেন।

উত্তর : এক

সুখের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যক্তির, সময়ের, অবস্থার। আনন্দ কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক। সুখের জন্য চাই বাহ্যিক সঞ্চয়। সংকীর্ণতাতেই তার পরিতৃপ্তি। আনন্দ অন্তঃকরণের উদ্ভাস। বিলিয়ে দেওয়াতেই তার চরিতার্থতা। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আনন্দ মানে না। নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙে অনিয়মের দিকেই তার প্রবাহ। (৩৬)

উত্তর : দুই

সুখ ও আনন্দকে আপাত এক মনে হলেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। সুখ আত্মকেন্দ্রিক, আনন্দ পরার্থপর। তাই সুখ শুধুই বন্ধন ও ভালর জন্য কাঙ্ক্ষিত আর আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুই-ই সমান, সে মুক্তও বটে। (৩২)

অনুশীলনের জন্য কোনও নতুন অনুচ্ছেদ এবারে দেওয়া হল না।

কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের বিলুপ্ত পাখি : পাহাড়ি বটের

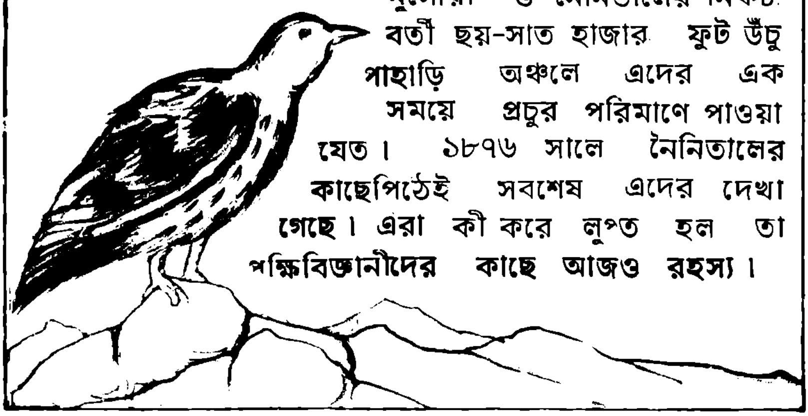

পাহাড়ি বটের বা লাব পাখি (Ophrysia Superciliosa) : উত্তর ভারতের মুসৌরী ও নৈনিতালের নিকটবর্তী ছয়-সাত হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে এদের এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। ১৮৭৬ সালে নৈনিতালের কাছেপিঠেই সবশেষ এদের দেখা গেছে। এরা কী করে লুপ্ত হল তা পক্ষিবিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্য।

পাঠ সংকলনঃ গদ্যাংশ

মেজদা ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা গত ১৬ মে, ১৯৮২ সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদা' গল্পাংশের প্রাথমিক আলোচনা শেষ করেছি। এবার আমরা গল্পপাঠ ও বিশ্লেষণ শুরু করব।

সংকলকেরা মাত্র পঁচিশটি অনুচ্ছেদ এখানে সংকলন করেছেন। আমাদের আলোচনা পাঠের আগে সমগ্র গল্পাংশ বেশ মনোযোগের সঙ্গে কয়েকবার পড়ে গল্পরস উপভোগ করে নেব—তারপর পরবর্তী অংশের পাঠ শুরু করব।

এই পঁচিশ অনুচ্ছেদকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করব।

প্রথম পর্ব ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। এই অংশে মূল ঘটনার পরিবেশ বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্ব প্রস্তুতি সারা হয়েছে। দু-একটি বাদে প্রায় সব চরিত্রেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অংশে। এদের কার্যকলাপের ভিতর দিয়েই ঘটনা এগিয়েছে এবং ঐ ঘটনার আবর্তে আমরা অন্যদের পরিচয় জেনেছি। একে সংকলিত গল্পাংশের ভূমিকা-পর্ব বলা যায়।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত। এই পর্বে বাড়ি বাঘের বা মতান্তরে ভালুকের আবির্ভাবে বিভীষিকা চূড়ান্ত হয়েছে। কিশোরী সিং সেই জন্তুকে কোথাও দেখে 'উহ বয়ঠা' বলতে আত্মরক্ষার এক সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

তৃতীয় পর্ব ঃ ষোড়শ থেকে পঞ্চবিংশ অনুচ্ছেদ। এই পর্বে ইন্দ্রের আগমন ও রহস্যভেদ বর্ণিত হয়েছে।

আজ আমরা প্রথম পর্ব পাঠ করব।

★

পাঠ-সংকলনের সংকলকেরা এক কৌতূহলোদ্দীপক বাক্যে 'মেজদা' গল্পের সংকলনের সূচনা করেছেন। বাক্যটি হচ্ছে 'সে দিনটি আমার খুব মনে পড়ে।' লাইনটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনেও যে প্রশ্ন জাগবে পরীক্ষকও সেই প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করবেন। প্রশ্নটি হল, কেন খুব মনে পড়ে? এখানে আমিটি কে? 'সে দিনটিই' বা কোন দিনটি?

আমরা উত্তর তিনটি একটু আগে পরে দিচ্ছি। (তোমরা পরীক্ষার খাতায় কখনই ক্রমের পরিবর্তন করবে না। আগের প্রশ্নাংশের উত্তর আগে, পরের প্রশ্নাংশের উত্তর পরে দেবে।) এখানে 'আমি বলতে শ্রীকান্তকে বোঝাচ্ছে। কখনই শরৎচন্দ্রকে নয়। বহু খাতায় আমির পরিচয় লেখক শরৎচন্দ্র লেখা হয়। সাবধান। তা কখনই লিখবে না।

দিনটি হচ্ছে একটি শ্রাবণ দিন। কাল সন্ধ্যা। সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি হয়েও যেন মেঘের জলভার কমেনি। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারের মধ্যেও যে আলো পাওয়া যায় আজ তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। এই দিনে বহুরূপীকে কেন্দ্র করে ঘটল এক বিচিত্র ঘটনা। এই ঘটনাটির জন্যই শ্রীকান্ত দিনটিকে ভুলতে পারে না—তার খুবই মনে পড়ে।

সাধারণভাবে ওপরের **কথাগুলো** লিখতেই তোমাদের ইচ্ছে করবে। **নোট** বইগুলোতেও এই প্রশ্নের এই জাতীয় **উত্তর** লেখা আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যদি শ্রীকান্তের সমগ্র জীবনের দিকে তাকান যায়, তাহলে দিনটি 'খুব মনে পড়ার' আরও গভীর কারণ বোঝা যায়। কারণ-গুলো হল ঃ

১. দিনটি অন্য যে কোন দিনের চেয়ে চমকপ্রদ ঘটনায় ভরা।
২. এই দিনটির বহুরূপীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীকান্ত মেজদা-পিসেমশাই-দারোয়ান-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের চেয়ে ইন্দ্রনাথের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্ত-ভাবে উপলব্ধি করল। এই ইন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে শ্রীকান্তের জীবন দর্শন নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করে সবচেয়ে বেশি।
৩. এই বহুরূপীর ঘটনার পরেই শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম অভিযানে বের হয়। বলা যায় এই হল তার যাযাবরী জীবনের সূত্রপাত। এই জন্যই সে ঐ দিনটিকে কিছুতেই ভুলতে পারে না—খুবই মনে পড়ে।

★

প্রথম বাক্যের পর থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ জুড়ে লেখক চরিত্রগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, বর্ণনা করেছেন সমগ্র পরিবেশ। লক্ষ্য করবে কত অল্প কথার আঁচড়ে লেখক এক একটি ব্যক্তি ও অবস্থার নিখুঁত চিত্র আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা লেখকের চরিত্রাঙ্কন দক্ষতা এবং পরিবেশ বর্ণনার বিশিষ্টতার পরিচয় পাই।

এই দুই অনুচ্ছেদ থেকে আমাদের বুঝে নেওয়ার বিষয় অনেক। প্রথমে বুঝে নিতে হবে 'কয় ভাই-এর নিত্য প্রথামত পাঠের অভ্যাস', দ্বিতীয়ত জেনে নিতে হবে ঐদিন ঐ সময় কে কোথায় কিভাবে অবস্থান করছিলেন।

শ্রীকান্তরা চার ভাই একত্রে পড়তে বসত। কে কে? প্রথম শ্রেণীতে (অর্থাৎ আজকের দশম শ্রেণী) পড়তেন মেজদা। তিনি দু-বার এণ্ট্রাস ফেল করেছেন। তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির। যেন নিদারুণ শিক্ষানুরাগী। নিজের পড়াশুনার সঙ্গে তিনি ছোটদের পড়াশুনা তত্ত্বাবধানের স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব নিয়েছেন।

যাদের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের মধ্যে বড় ছোড়দা। অবশ্যই শ্রীকান্তের ছোড়দা। সে পড়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ আজকের ক্লাস এইটে।

অবশিষ্ট যতীনদা এবং শ্রীকান্ত পড়ে চতুর্থ শ্রেণীতে অর্থাৎ ক্লাস সেভেনে।

এরা পড়তে বসেছে **বাইরের বৈঠক-খানায়**। বৈঠকখানায় ঢালা বিছানা পাতা। মাঝখানে একটি রেড়ির তেলের সেজবাতি। [সেজবাতি কাকে বলে তা নিয়ে নোট বইগুলো বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ওঁরা লিখেছেন ঃ শেড দেওয়া অর্থাৎ ঢাকনা দেওয়া বাতি। কিন্তু 'সেজ' বাতি তাকে বলে না। আগেকার দিনে আমাদের দেশে একরকম দোতলা মাটির

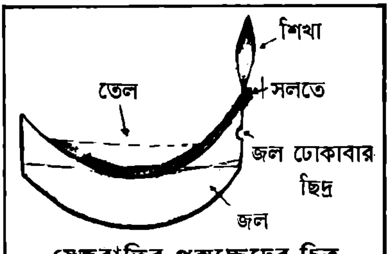

সেজবাতির প্রস্থচ্ছেদের চিত্র

প্রদীপ ব্যবহার করা হত। তার একতলায় থাকত জল, দোতলায় তেল-সলতে ইত্যাদি। বলা হত এতে তেলের অপচয় হত না। এ কথার পিছনে বৈজ্ঞানিক

কারণ কি আছে, তা অবশ্য আমার জানা নেই। তোমরা জানলে আমাদের জানিও।] ওরা সম্ভবত আসনপিঁড়ি হয়ে ঘাড় হেঁট করে পড়তে বসেছে।

পরের বর্ণনা থেকে মনে হয় শ্রীকান্ত দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। তাই বহুরূপীর ব্যাপারে প্রথমে সে কিছু বোঝেনি। মেজদা বসেছিল শ্রীকান্তের ঠিক উল্টো দিকে, প্রদীপের ওপারে। তাই সে যতীনদা এবং ছোড়দার চেঁচামেচিতে মুখ তুলতেই মেজদা বহুরূপী দেখেন এবং সজোরে পা ছুঁড়ে উল্টে দেন প্রদীপ। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায় সব। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এদের দু-পাশে বসেছিল যতীনদা ও ছোড়দা।

বৈঠকখানার সঙ্গে বাইরের দিকে বারান্দা। সেই বারান্দায় ছিলেন দুটি ব্যক্তি। [১] পিসেমশাই, যাঁর নাম দ্বারিকবাবু [২] ঐ বাড়ির পুরোহিত রামকমল ভট্টাচার্য। তাঁরা কি করছিলেন? দ্বারিকবাবু ক্যাম্বিশের খাটে শুয়ে সান্ধ্য তন্দ্রাটুকু ভোগ করছিলেন আর ভট্টাচার্য মশাই আফিং খেয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। শ্রীকান্ত ইঙ্গিত দিয়েছে বাড়িটি নেহাত অসংরক্ষিত নয়। ঢুকবার দেউড়ি এবং সে দেউড়িতে দারোয়ান থাকে কয়েকজন। সেদিন ঐ সময় তারা সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছিল।

বাড়ির মেয়েদের কথা বলা হয়নি। তাঁরা অন্দরমহলের এবং দোতলায় ছিলেন। আগেই শ্রীকান্ত জানিয়ে দিয়েছে যে সেদিন তারা সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়তে বসেছিল। পড়া শেষ হলে তারা শুয়ে পড়ত, এ ইঙ্গিতও আছে। অর্থাৎ রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সাতটার মধ্যেই সারা হয়ে যেত।

এই বর্ণনাগুলো থেকে আমাদের নাটকের একটা মোটামুটি ছবি এঁকে নেওয়া যেতে পারে। মনে রেখ এটা একটা সম্ভাব্য চিত্র মাত্র। ছবিটা সামনে থাকলে বিষয়টা মনে রাখতে সুবিধা হবে।

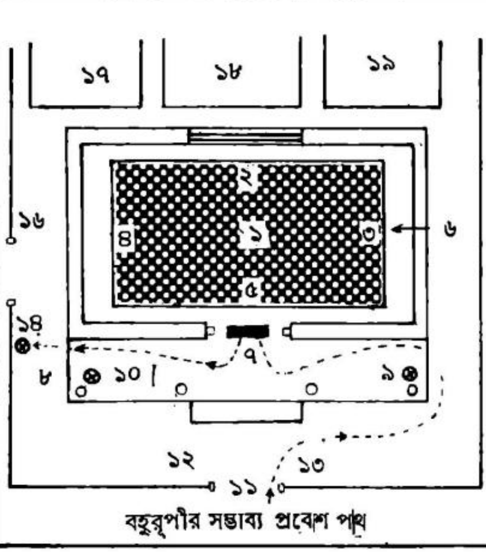

বহুরূপীর সম্ভাব্য প্রবেশ পথ

১. সেজবাতি
২. মেজদা
৩-৪. যতীনদা ও ছোড়দা
৫. শ্রীকান্ত
৬. ফরাসপাতা বিছানা
৭. পাপোষ যার ওপর বহুরূপী হুম করে বসেছিল
৮. বাইরের বারান্দা
৯. পিসেমশাই-এর ক্যাম্পখাট
১০. ভটচাজমশাই-এর কেদারা
১১. দেউড়ি
১২১৩. দেউড়ির পাশে দারোয়ানদের থাকবার জায়গা
১৪. ডালিমগাছ
১৬. খিড়কির দরজা
১৭ ১৮ ১৯ বাড়ির অন্যান্য অংশ

এই আলোচনা থেকে নিচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করে রাখ। তাহলে অনেক বড় প্রশ্নের উত্তরও তৈরি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন

১. সেদিনটিকে কেন খুব মনে পড়ে ? কার মনে পড়ে ?
২. সেদিনটির প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর।
৩. সেই দিনের কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে ? তখন কে কোথায় ছিল ?
৪. 'আমরা কয় ভাই' কে কে ?
৫. তারা কে কোন শ্রেণীতে পড়ত ? তাদের শ্রেণীর তখনকার এবং এখনকার নাম বল।
৬. সেজ বাতি কাকে বলে ?
৭. রেড়ির তেল কি ?
৮. তুলসীদাসী সুর বলতে কি বোঝ ?

এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে শেষ দুটি অংশের উত্তর আগের আলোচনায় পাবে না। ঐ দুই অংশের উত্তর নিচে দিলাম।

৭. 'রেড়ি' শব্দটি সংস্কৃত 'এড়ণ্ড' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এড়ণ্ড থেকে ধ্বনি লোপের ফলে সরলীকৃত রূপ হয়েছে এড় বা এড়ি। এবারে 'র-কারের আগম হয়েছে রেড়ি। এড়ণ্ড বা বাঙলায় যাকে ভেরেণ্ডা বলা হয়, তার বীজ থেকে একরকম গাঢ় তেল পাওয়া যায়। কেরাসিন তেল, (যাকে দীর্ঘকাল বাঙলা-দেশের সাধারণ মানুষ সাদা তেল বলত।) চালু হবার আগে এই তেলই বাঙলাদেশে বহুল ব্যবহৃত হত। একেই চলতি ভাষায় রেড়ি বা রেড়ির তেল বলে।

৮. তুলসীদাস ছিলেন সুবিখ্যাত হিন্দী কবি ও পরমভক্ত সাধু। তিনি আকবরের সমসাময়িক কালের লোক ছিলেন। হিন্দীভাষায় রচিত তাঁর রামায়ণ উত্তর ও মধ্য ভারতের হিন্দীভাষী জনসমাজে সুবিখ্যাত। তাঁর রামায়ণের নাম 'শ্রীরামচরিত মানস।' এই রামায়ণ পাঠের একটি বিশিষ্ট সুর আছে। তাকেই বলা হয়েছে 'তুলসীদাসী সুর।'

* * *

প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিত্য প্রথা মত পড়াশুনার ব্যবস্থার বর্ণনা। এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক ও উদ্ভাবক মেজদা। ব্যবস্থাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এই ব্যবস্থায় নির্বিঘ্ন পড়াশুনা হচ্ছে, এক মুহূর্তও সময়ের অপচয় হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবটুকুই অপচয়। মেজদার মন পড়ে আছে কঠোর ব্যবস্থাপনা অনুসরণে আর অন্য তিন ছাত্রের মন পড়ে আছে কিভাবে ঐ ব্যবস্থাপনার মধ্যেও পরিপূর্ণ ফাঁকি দেওয়া যায় তার দিকে।

ব্যবস্থাপনাটি দেখ। পড়তে বসে তেস্টা পেয়েছে বা বাইরে যাব ইত্যাদি বলে পাছে কেউ সময় নষ্ট করে বা মেজদার 'পাশে'র পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ ছিন্ন করে দেয়, তাই ওদের কথা বলা বন্ধ করতে মেজদা পড়তে বসেই প্রথমে কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে বিশ-ত্রিশ খানা টিকিটের মত তৈরি করে তাতে কোনটায় 'নাক ঝাড়া', 'তেষ্টা পাওয়া', 'থুথু ফেলা', 'বাইরে' ইত্যাদি লিখে রাখতেন। [ভেবে দেখ, এতে মেজদার পড়াশুনার সূচনা কি দারুণ সময় নষ্ট না হওয়ার ভেতর দিয়ে শুরু হল।]

পড়া শুরুর পর কোন পড়ুয়া তার প্রয়োজনের টিকিটটি এগিয়ে দিল। মেজদা হিসেব কষে তাতে লিখে দিলেন আটটা তেত্রিশ মিনিট থেকে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত দেড় মিনিট তার ছুটি

মঞ্জুর করা হল। ফিরে এলে মেজদা হাতের টিকিট নিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে ফিরবার সময় লিখে সেই কাগজটা আবার খাতায় আঠা দিয়ে এ'টে রাখলেন। ইতঃমধ্যে আর একজন হয়ত আর একখানা টিকিট পেশ করল। মেজদা লিখে দিলেন 'না'। সে ব্যাচারা একটু চুপ করে বসে থেকে অন্য অজুহাতের আর একটি পেশ করল। এবার হয়ত মঞ্জুরী মিলল। এবং সে ফিরলে নিশ্চয় আবার ফেরার সময় লিখে তা গঁদ দিয়ে এ'টে রাখা হল। সপ্তাহ শেষে এইসব টিকিটের হিসেব মিলিয়ে মেজদা কৈফিয়ৎ নিতেন ভাইদের।

এই মহা শিক্ষাবিদের কঠোর শাসনের নিশ্ছিদ্র পড়াশুনায় এতই ভাল পড়াশুনা হত যে স্বয়ং বিদ্যার দেবী সরস্বতী বোধ হয় একান্ত পরিতৃপ্ত হতেন। ওদের পড়াশুনার সময় ছিল সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত। ন'টা বাজলেই খুশী সরস্বতী যেন বাছাদের এত পড়াশুনার ক্লেশ দূর করতে তাদের শোবার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেতেন। আহা, বাছাদের কত কষ্টই না হয়েছে। এবার ঘুমোও বাছারা!

সরস্বতীর পরিতৃপ্তির যে কাল্পনিক চিত্রই আঁকা হোক না কেন, পরীক্ষক এবং শিক্ষকদের কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যেত না। মেজদা পর পর দুবার ফেল করেছেন। তার ভাইয়েরা বিদ্যালয়ে নানা রকম সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করত। কি রকম সম্মান? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। সকলে বসে আছে আর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজনকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখল বা নিলডাউন করে রাখা হল বা নাড়ুগোপাল করা হল—এই যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠা এ ত সম্মান! শ্রীকান্তের বিদ্রূপ এখানে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। শ্রীকান্ত বলছে, 'নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করাইয়া দিতে লাগিল।' বস্তুতপক্ষে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ বা সময়ের মূল্যবোধ বা দায়িত্ববোধ কিছুই ছিল না মেজদার।

প্রশ্ন

১. 'তাহার প্রচণ্ড শাসনে এক মুহূর্ত কাহারও সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না।'
এই বাক্য উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বড় প্রশ্ন বা একটি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে।

ব. প্র. কার শাসনের কথা বলা হয়েছে? তার শাসনের পরিচয় দাও। এতে কি সত্যিই সময় নষ্ট করবার জো ছিল না?

[১ + ৫ + ৪]

ব্যা. প্র. অংশটির প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। প্রচণ্ড শাসন কেন বলা হয়েছে? 'সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না' বলবার তাৎপর্য কি?

[৩ + ২ + ২]

সং. প্র. ১. মেজদাদের পড়বার সময় ছিল কটা থেকে কটা পর্যন্ত? ২. সন্ধ্যাবেলা পিসেমশাই ও পুরোহিতমশাই কে কি করতেন? তাঁদের নাম বল। ৩. মেজদা ক'বার এণ্ট্রান্স ফেল করেছেন? ৪. মেজদার তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করায় ভাইরা পরদিন কি রকম ফল পেত? ৫. 'ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ-বিচার?' কে কেন একথা বলেছেন?

ব্যা. প্র. 'তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন।'—'তখন' কখন? মা-সরস্বতীর এগিয়ে দেওয়ার কারণ কি? 'নিশ্চয়ই'

কথাটির মধ্যে যে ব্যঙ্গ আছে তা বুঝিয়ে বল। [২ + ৩ + ২]

সংকেত ঃ লক্ষ্য কর এখানে প্রসঙ্গের কথা বলা হয়নি। কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় ওটুকু তোমাকে লিখতেই হবে। ব্যঙ্গটি নিশ্চয়ই বুঝেছ। এতক্ষণ ত তারা পড়া পড়া খেলা করেছে। বলা যায় পড়াকে ব্যঙ্গ করেছে। তাই মা-সরস্বতী অবশ্যই তাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন। তা কিন্তু সমাদরে নয়—ঘাড় ধরে চৌকাঠের বাইরে বের করে দেওয়া।

এই অংশ থেকে নিচের ব্যাকরণগত প্রশ্নগুলো পাঠ করবে।

অবিশ্রান্ত ঃ [ব্যুৎপত্তি] = অ-বি-√শ্রম্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্য)। [বিপরীত শব্দ] = বিশ্রান্ত। লিঙ্গান্তর ঃ অবিশ্রান্তা। প্রতিশব্দ = অবিরল, অবিচ্ছিন্ন, একটানা। [সমাস] নয় বিশ্রান্ত (নঞ তৎপুরুষ সমাস)।

ঘনমেঘে ঃ [সমাস] ঘন যে মেঘ (কর্মধারয় সমাস) + এ। কারক বিভক্তি = করণে এ বিভক্তি।

সমাচ্ছন্ন ঃ [সন্ধি] = সম্ + আচ্ছন্ন। [ব্যুৎপত্তি] = সম্-আ-√ছিদ্ + ক্ত (কর্মবাচ্য)। পদান্তর ঃ সমাচ্ছন্নতা।

উত্তীর্ণ ঃ [ব্যুৎপত্তি] উৎ—√তৃ + ক্ত (কর্মবাচ্য, কর্তৃবাচ্য দুই-ই হয়)। লিঙ্গান্তর ঃ উত্তীর্ণা। বিপরীত ঃ অনুত্তীর্ণ।

পিসেমশাই ঃ যিনি পিসে তিনিই মশাই (কর্মধারয় সমাস)।

সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু ঃ [সমাস] সান্ধ্য যে তন্দ্রা (কর্মধারয় সমাস। এটা মধ্য-পদলোপী কর্মধারয় হয় না।) = সান্ধ্যতন্দ্রা। সান্ধ্যতন্দ্রার টুকু (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)।

উপভোগ ঃ [ব্যুৎপত্তি] উপ—√ভুজ্ + ঘঞ্ (ভাববাচ্য)। পদান্তর ঃ উপভোগ্য, উপভুক্ত।

ধূমপান ঃ ধূমকে পান (দ্বিতীয় তৎপুরুষ বা কর্মবাচক তৎপুরুষ সমাস)।

নাক ঝাড়া ঃ নাক হইতে ঝাড়া (পঞ্চমী তৎপুরুষ বা অপাদান বাচক তৎপুরুষ)।

তুলসীদাসী ঃ [ব্যুৎপত্তি] তুলসী-দাস + ঈ।

গম্ভীর প্রকৃতি ঃ [সমাস] গম্ভীর প্রকৃতি যার (বহুব্রীহি সমাস)।

জো থাকা ঃ [বিশিষ্ট প্রয়োগ] অর্থ ঃ উপায় থাকা। জো থাকতে জাল ফেল। বাপুহে, এখন আর জো নেই। জাল ফেললেও নবডঙ্কা।

প্রত্যহ ঃ [সমাস] অহের পর অহ (অব্যয়ীভাব সমাস) একে বলে বীপ্সা অর্থে অব্যয়ীভাব।

মুখ ভারী করা ঃ [বিশিষ্ট প্রয়োগ] অপ্রসন্ন হওয়া। বন্ধুটি টাকা ধার চাইতেই তিনি মুখ ভারী করলেন।

সপ্তাহ ঃ [সমাস] সপ্ত অহের সমাহার (সমাহার দ্বিগু সমাস)।

অত্যন্ত ঃ [সন্ধিবিচ্ছেদ] অতি + অন্ত। সূত্র ঃ ই ঈ + ভিন্ন স্বর = ই/ঈ স্থানে য-ফলা। পরের স্বর য-ফলায় যুক্ত হবে। অনুরূপ ঃ পর্যন্ত = পরি + অন্ত।

চৌকাঠ ঃ [সমাস] চৌ (চারি) কাঠ আছে যার [বহুব্রীহি সমাস]।

নির্বোধ ঃ [সমাস] নাই বোধ যার [বহুব্রীহি সমাস]।

যাক—এখন আর সে দুঃখ জানিয়া কী হইবে? [প্রশ্ন পরিহার কর]।

যাক—এখন আর সে দুঃখ জানিয়া লাভ নাই।

অব্যয়

এবারে আমরা অব্যয় সম্পর্কে পাঠ শুরু করব। তোমরা প্রথমেই প্রশ্ন করতে পার, অব্যয় কাকে বলে? এস, সেই আলোচনা দিয়েই আজকের কাজ শুরু করা যাক।

সংস্কৃত ভাষায় এক ধরনের পদ ছিল, যারা বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা ক্রিয়ার মত লিঙ্গ, বচন, কারক, বিভক্তি ইত্যাদি চিহ্ন গ্রহণ করত না। ফলে ঐ ধরনের শব্দ পদে পরিণত হতে গেলে তার মূল রূপের পরিবর্তন (যাকে ব্যাকরণে ব্যয় বলা হয়) হত না। এজন্য ঐ পদগুলোকে **অব্যয়পদ** বলা হত। যেমন—অপি, চ, তথা, তু ইত্যাদি। বাঙলায় এমন বিকারহীন অব্যয়পদ অল্প। যেমন—আর, না, ও, তো ইত্যাদি।

বাঙলায় সংস্কৃত ভাষা বা অন্য বহুতর ভাষা থেকে বহু বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এবং নানা বাক্যাংশ অব্যয়পদ রূপে ব্যবহৃত হয়। মূল ভাষায় শব্দগুলো মোটেই অব্যয় নয়। কিন্তু মূল ভাষার বিভক্তি ইত্যাদি যে সব চিহ্নসহ বাঙলায় যে রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, ঠিক সে রূপেই সবসময় ব্যবহৃত হয়—বাঙলা ভাষায় ঐ রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব বাঙলা ভাষায় এই শব্দগুলো একান্তভাবেই অব্যয়। যেমন—বরং, অর্থাৎ, হঠাৎ ইত্যাদি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত তিন রকম অব্যয়ের কথা পেলাম।

১. সংস্কৃত অব্যয়ঃ যাদের ব্যবহার বাঙলা ভাষায় নেই। যেমন—অপি, চ, তথা, তু ইত্যাদি।

২. খাঁটি বাঙলা অব্যয়ঃ যেমন—আর, না, তো ইত্যাদি।

৩. সংস্কৃতের বিভক্তিঃ যুক্তপদ কিন্তু বাঙলায় অব্যয়। যেমন—বরং, অর্থাৎ, হঠাৎ ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যয় কি কাজ করে? অব্যয় বাক্যের ভাবপ্রকাশের প্রাথমিক কাজে লাগে না, কিন্তু ভাবকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে তুলতে অব্যয়ের তুলনা নেই। বাক্যগত উক্তিকে এবং অন্যান্য পদগুলোর পরস্পরের সম্বন্ধকে বা স্থান কাল পাত্র ও প্রকারকে পরিস্ফুট করে দেয় অব্যয়পদ।

অব্যয়কে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

অর্থের দিক থেকে অব্যয়গুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়।

১. **সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক** এবং
২. **মনোভাববাচক বা অনন্বয়ী।**

সংযোগবাচক বা সম্বন্ধ-বাচক অব্যয়

যে অব্যয় একাধিক পদ, বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে সম্পর্ক বা সংযোগ স্থাপন করে দেয় তাদের সংযোগবাচক বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। এই শ্রেণীর অব্যয় নানা ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত হয়। সেদিক থেকে সম্বন্ধবাচক অব্যয়কে পনের ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. সংযোজক বা সহযোগীঃ এবং, ও, আর, তথা, মায়, বনাম ইত্যাদি। যেমন—পড় এবং অনুশীলন কর। মুড়ি আর চানাচুরে জমে ভাল।

খ. বৈকল্পিক বা বিযোজকঃ বা, কিংবা, অথবা, নচেৎ, না হয়, নইলে, নয়ত ইত্যাদি। যেমন—'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।' হয় করব না হয় মৃত্যুবরণ করব।

গ. সংকোচক বা প্রতিষেধক বা প্রতিপাক্ষিক ঃ কিন্তু, পরন্তু, তবু, তথাপি, অথবা, বরং, প্রত্যুত, বরঞ্চ, পুনরায়, পুনশ্চ, আবার, এদিকে, ওদিকে ইত্যাদি। যেমন—'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' তোমার আগমনে দুঃখ ত পাই-ই নি পরন্তু পরম সন্তোষ লাভ করেছি।

ঘ. ব্যতিরেকাত্মক ঃ যদি না, না হলে ইত্যাদি। যেমন—যদি না জন্মাতাম তবে পৃথিবীর এত শোভার কী মূল্য থাকত! পরিশ্রম কর, না হলে ব্যর্থ হবে।

ঙ. অবস্থাত্মক ঃ যদি, যদিস্যাৎ, যদি নাকি, যাই, হলে, পরে, যদি না হয়, না হলে ইত্যাদি। যেমন—যাই তুমি এলে। বৃষ্টি যদি না হয় তবে খেলায় জিতবই।

চ. ব্যবস্থাত্মক ঃ তবে, তা হলে, তাই, তবে নাকি, তার জন্য, সে জন্য, তদনন্তর, কখনও কখনও, তেঁই (কাব্যে) ইত্যাদি। যেমন—যদি ব্যবস্থা করতে পার তবে খুব ভাল হয়। তদনন্তর তিনি গাছটির নিকটে গিয়ে দেখলেন এক বিচিত্র দর্শন ব্যক্তি সেখানে মৃতবৎ পড়ে আছে।

ছ. কারণাত্মক ঃ কারণ, কারণ কি, যেহেতু, যে কারণে, যে কারণ, বলে ইত্যাদি। যেমন—মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ সত্যি বললে মার খেতাম। .অসুস্থ ছিলাম বলেই আসতে পারিনি।

জ. অনুধাবণাত্মক ঃ এই জন্য, এই হেতু, এই কারণে, এদিকে, তাই, তাইতে ইত্যাদি। যেমন—এদিকে যাত্রার সময় উপস্থিত।

ঝ. সমাপ্তিসূচক ঃ যাতে, শেষ, শেষটায়, আখেরে। যেমন—যাতে অনুশোচনা না করতে হয়, তেমনভাবে কাজ কর। আখেরে পস্তিও না।

ঞ. সংশয়বাচক ঃ বুঝি, নাকি ইত্যাদি। যেমন—আসবে নাকি? সে এল বুঝি।

ট. নিত্যসম্বন্ধী বা সাপেক্ষ ঃ বটে, কিন্তু, যদি, তবু ইত্যাদি। যেমন—তিনি যদিও ধনী তবুও অসৎ নন। একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ।

ঠ. অনুগামী সমুচ্চয়ী ঃ সে বলল যে সে স্কুলে যাবে।

ড. নিরপেক্ষ ঃ নহিলে,

যেমন ঃ 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।'

ঢ. পদান্বয়ী অব্যয় ঃ

অ. উপমাবোধক ঃ সদৃশ, মত, ন্যায়।

আ. বিভক্তিসূচক অনুসর্গ ঃ দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে।

ণ. ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার ঃ ঝন্‌ঝন্, ঝর্‌ঝর্ ইত্যাদি।

মনোভাববাচক বা অনন্বয়ী

মনোভাববাচক অব্যয়গুলোকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। ক. **ভাববোধক**, খ. **প্রশ্নবোধক**, গ. **সম্বোধনসূচক**, ঘ. **অলঙ্কারসূচক**।

ভাববোধক

ক. **বিস্ময়সূচক ঃ** বাঃ, ওমা, মরি মরি। যেমন ঃ বাঃ, কি চমৎকার দৃশ্য! ওমা, এরই মধ্যেই এসে গেলি!

খ. **শোক ঃ** হা, হায়, হায় হায়, আঃ ইত্যাদি। যেমন ঃ হায় হায়, একি হল।

গ. **ঘৃণা ঃ** ছিঃ, দূর দূর, রাম রাম, থু থু। যেমন ঃ ছিঃ, ধুলোমাটিতে হাত দিও না।

ঘ. **প্রশংসা ঃ** সাবাস, ধন্য, বলিহারি, বাঃ বাঃ বেশ, খুব, বেড়ে (হিন্দি বঢ়িয়া), চমৎকার, কি সুন্দর, খাসা, বহুৎ আচ্ছা।

ঙ. **সম্মতি ঃ** হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, আচ্ছা, আজ্ঞে, বটে, জী, জী হাঁ।

চ. **অসম্মতি ঃ** না, একদম না, কখনই না, না ত, না বটে, মোটেই না, আদৌ না।

প্রশ্নবোধক

প্রশ্নবোধকের কোন বিভাগ নেই। কি, নারে, কেন, অ্যাঁ, নাকি, হ্যাঁ।

সম্বোধনসূচক

ক. **সম্ভ্রম পূর্ণ ঃ** হে, ওহে, তো।

খ. **কোমল ও সস্নেহ ঃ** ওগো, ওরে, ওগো বাছা!

গ. **অতি পরিচিত ঃ** রে, ওরে, ও।

ঘ. **নিকৃষ্ট ঃ** হ্যাঁরা, হ্যাঁরে, হ্যাঁলা, হেদে, তুতু, চৈ চৈ, আ আ ইত্যাদি।

ঙ. **স্ত্রীকে ঃ** ওগো।

অলঙ্কারসূচক

ক. **বাক্যালঙ্কার অব্যয় ঃ** তো, ত, না ইত্যাদি।

খ. **অবধারণমূলক অব্যয় ঃ** যাব গো যাব! আসব বটে।

গ. **পাদপূরণ ঃ** সিন্, মেনে, বটি, বটে।

সূক্ষ্ম অর্থে অব্যয়ের ব্যবহার

আর

এবং ঃ আমি আর তুমি একত্রে চলব।

অথবা ঃ পারি আর না পারি, চেষ্টা করব।

অন্য ঃ আর কেউ এখানে নেই।

অধিক ঃ আর বুটি দিতে পারব না।

গত ঃ আর বছর বন্যা হয়েছিল।

পুনরায় ঃ এই শেষ, আর নয়।

কখনও ঃ দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে?

তদবধি ঃ তার বাবা সেই যে গৃহত্যাগ করলেন, আর ফিরলেন না।

অব্যবহিত পরে ঃ আমরা স্কুলে পৌঁছলাম আর ঘণ্টা পড়ল।

বাক্যালঙ্কার ঃ সে কি আর না এসে পারে!

ই

নিশ্চয়ার্থ ঃ 'যাবই, আমি যাবই, ওগো বাণিজ্যেতে যাবই।'

কেবল ঃ তোমারই কাগজপত্র নিরাপদে আছে।

অধিক ঃ ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে ততই।

অবিচ্ছিন্নতা ঃ জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে।

পূরণবাচক বিশেষণ ঃ সাতই পৌষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকব।

হেতু ঃ জলেই ফসলের বৃদ্ধি।

বক্রোক্তি ঃ আহা! কী পরীক্ষাই দিয়েছ।

ও

এবং ঃ ঝড়ে ও জলে দুর্দশার একশেষ হল।

আদৌ ঃ আমি তাকে চিনিও না।

সম্বোধন ঃ ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।

সম্ভাবনা ঃ আজ বৃষ্টি হলেও হতে পারে।

নির্দেশ ঃ তার হাত দিয়ে জলও গলে না।

দৃঢ়তা ঃ প্রাণ গেলেও মিথ্যা বলব না।

কি, কী

প্রশ্ন ঃ আজ পড়া তৈরি হয়েছে কি?

কিংবা ঃ কি ইংরাজী কি বাঙলা, সব বিষয়েই অতনু সমান।

আনন্দ বিস্ময় ঃ কী আনন্দ! আজ ছুটি।

বিতর্ক ঃ জিতবে কিনা, তা এখনই কি করে বলব?

সম্বোধন : কি ভাই, তুমিও কুম্ভমেলায় চলেছ !

বক্রোক্তি : সাজ-পোশাকের কী বাহার !

ত

প্রশ্ন : এখনই যাবেন ত !

নিশ্চয়তা : না পড়লে ফেল ত করবেই।

যদি : দেবেন ত বলে দিন।

কিন্তু : আমি পড়তেই চাই, তারা ত পড়তে দেয় না।

অনুজ্ঞা : একবার যা ত বাবা !

আদেশ : ঘরটা ঝাঁট দে ত।

বাক্যালঙ্কার : এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।

না

প্রশ্ন : যাবে না ?

সন্দেহ : সে কি এল না ?

নিশ্চয় : না, সে এল না।

বিতর্ক : তাই ত, এবার উত্থান না পতন !

অনুজ্ঞা : দে না বাবা।

আতিশয্য : কত রঙ্গই না জান !

বাক্যালঙ্কার : আসুন না, একসঙ্গে যাই।

বা

কিংবা : তুমি বা হরি যে কেউ একজন এলেই হবে।

সম্ভাবনা : এত মেঘে বৃষ্টি কি হবে ? হবেও বা।

বিতর্ক : কেনই বা হবে না ?

ঔদাসীন্য : হলেই বা কি না হলেই বা কি ?

বাক্যালঙ্কার : কেউ বা হাসে কেউ বা কাঁদে।

যে

হেতু : দিন যে গেল, সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।

সংশয় : কী যে হবে।

শাসন : মিথ্যে বললি যে।

বিস্ময় : পরীক্ষার হলে চুপচাপ বসে যে।

অধিকতর : যে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।

যেন

উপমা : মেয়েটি যেন চাঁদ।

কল্পনা : মনে কর যেন কোন বিপদ না ঘটে।

অনুমান : কোথায় যেন গলদ আছে।

উৎপ্রেক্ষা : পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে যেন দুটি শ্লোক।

এবার আমরা কতকগুলো অব্যয়ের বিশিষ্ট ব্যবহার দেখাব। একই অব্যয়, অন্বয়ের পার্থক্যে কেমন অর্থের পার্থক্য ঘটায়, এখানে তাই বোঝান হবে। কি, আর, যেন, বটে, মাত্র কেবল প্রভৃতি নানা অব্যয় বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন পদের পরে যোগ করলে বাক্যের অর্থের পার্থক্য ঘটে। অব্যয়গুলো যে পদের পরে বসে তারাই গুণবাচক হয় ও অর্থ বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা অব্যয় স্থাপনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।

ই

আমি তাকে চিঠি লিখেছি। —এই বাক্যটির প্রতি পদের শেষেই 'ই' অব্যয়টি প্রয়োগ করা যায়। তার ফলে অর্থের পার্থক্য লক্ষ্য কর।

১. আমিই তাকে চিঠি লিখেছি। (আমিই লিখেছি, আর কেউ নয়)।

২. আমি তাকেই চিঠি লিখেছি। (তাকেই লিখেছি, অন্য কাউকে নয়)।

৩. আমি তাকে চিঠিই লিখেছি। (চিঠিই লিখেছি, আর কিছু নয়)।

৪. আমি তাকে চিঠি লিখেছি-ই। (নিশ্চয় লিখেছি, এর অন্যথা নেই)।

ও

বিনয় এখন খেলার মাঠে আসেনি।

—এই বাক্যটির প্রতি পদের শেষে 'ও' অব্যয়টি প্রয়োগ করে অর্থের পার্থক্য দেখা যাক

১. বিনয়ও এখন খেলার মাঠে আসেনি। (অন্যেরা ত আসেইনি, বিনয়ও আসেনি। অর্থাৎ অন্যদিন সে ইতঃমধ্যে আসে)।

২. বিনয় এখনও খেলার মাঠে আসেনি। (বিনয়ের আসা ঘটেনি এখনও)।

৩. বিনয় এখন খেলার মাঠেও আসে নাই। (বিনয়কে যেন খোঁজা হইতেছে। সে খেলার মাঠে আসে নাই।)

৪. বিনয় এখন খেলার মাঠে আসেও নাই। (আসার পরে অন্য কাজ করার কথা ছিল। তাহা করা ত দূরের কথা। আসাটুকুও হইয়া ওঠে নাই।)

গদ্য সহায়ক পাঠ

গল্প সংকলন ঃ অনধিকার প্রবেশ

তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় যে গল্প-সংকলন থেকে আমাদের মোট পাঁচটি গল্প পড়তে হবে এবং তার মধ্যে তিনটি গল্প আমরা ইতঃমধ্যেই পড়েছি। অবশিষ্ট আছে মাত্র দুটি গল্প। অনধিকার প্রবেশ এবং অতিথি। এর মধ্যে 'অনধিকার প্রবেশ' খুব বড় গল্প নয়। অতিথি মস্ত বড় গল্প। অর্থাৎ সংখ্যায় দুটি গল্প হলেও তোমার কাজ খুব কম নেই।

*

মাত্র ছত্রিশটি অনুচ্ছেদে সমাপ্ত এই ছোট্ট গল্পটির মূল বিষয়বস্তুও সংক্ষিপ্ত। এক ধর্মপ্রাণ বিধবা মহিলা, যার বাইরের সব আচরণে পৌরুষ ফুটে ওঠে, মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার্থে যিনি নিজ-আশ্রিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে পর্যন্ত নির্দয় শাস্তি দেন, তিনি প্রাণভয়ে ভীত এক শূকরকে লতাবিতানে ঢুকতে দেখলেন। ছুটে এল একদল প্রমত্ত ডোম। ওরা শূকরটিকে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে। মহিলা কিন্তু শূকরটিকে বের করে দিলেন না এবং মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন জন্তুটিকে।

কিন্তু কেন? তিনি কি জন্তুটির মন্দিরে প্রবেশকে 'অনধিকার প্রবেশ' ভাবলেন না? না, তাঁর মনে হল প্রাণ-ভয়ে ভীত জীব আশ্রয় নিয়েছে দেবতার প্রাঙ্গণে। দেবতার আশ্রয়েই ত বরাভয়। আর্তই ত প্রবেশ করবে মন্দিরে, আশ্রয় নেবে দেবতার পদপ্রান্তে। সেই হবে অধিকারীর প্রবেশ।

গ্রাম্য সমাজ-নেতারা কিন্তু এ অর্থ বুঝলেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁরা ঘোঁট পাকাতে থাকলেন।

* * *

এই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাইশ অনুচ্ছেদ ব্যয় করেছেন জয়কালীর পুরুষালি চরিত্রটি পাঠকের মনে এঁকে দিতে। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কতখানি নির্মম, নলিনীর ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

কাহিনী শুরু হচ্ছে দুই বালকের বাজি ধরা নিয়ে। কি বিষয়ে বাজি? ঠাকুর-বাড়ির মাধবীবিতান থেকে ফুল তুলে

আনতে হবে—এই হল বাজির বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে কাজটিকে সহজ বোধ হলেও কাজটি যে অসমসাহসিক ব্যাপার তার পরিচয় দিতে রবীন্দ্রনাথ জয় কালী-দেবীর চরিত্র ব্যাখ্যা শুরু করেছেন।

জয়কালীদেবীর স্বামী ছিলেন স্বর্গত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতি। বুঝতেই পারছ যে মাধবচন্দ্রের কৌলিক উপাধি এখানে বলা হয়নি, বলা হয়েছে অর্জিত উপাধি। আমরা যেমন বলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তাঁর অর্জিত উপাধি। পৈত্রিক বা কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। নিশ্চয়ই মাধবচন্দ্র কোন টোল থেকে এই উপাধি পেয়েছিলেন।

কিন্তু লেখক মাধবচন্দ্রের এই উপাধি নিয়ে কম রসিকতা করেননি। উপাধি-টিকে দুবার দু'রকমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'তর্কবাচস্পতি' কথাটির অর্থ যিনি তর্ক এবং বাক্যের অধিপতি। অর্থাৎ যিনি তর্ক এবং বাক্যে কখনই কারও কাছে পরাজিত হননি। কিন্তু পারিবারিক জীবনে যত বার স্ত্রী জয়কালীর সঙ্গে তাঁর তর্ক হয়েছে বা বিনিময় হয়েছে বা বাক্য বিনিময় হয়েছে —তার কোন বারেই তিনি জয়ী হতে পারেননি। অন্যত্র তিনি 'তর্কবাচ-স্পতিত্বে'র পরিচয় নিশ্চয়ই প্রমাণ করেছিলেন, না হলে উপাধিটি তিনি পাবেন কেন? তবে স্ত্রীর কাছে তিনি কোন দিনই নিজ উপাধির সার্থকতা প্রমাণ করতে পারলেন না।

অবশ্য কেউ কেউ একে অন্য রকমভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, তাঁর উপাধি সার্থক। কারণ, তিনি ত তর্কবাচস্পতি। তর্ক এবং বাক্য দুই-ই লাভ করেছিলেন তাঁর পত্নী জয়কালী। তিনি ছিলেন তাঁর পতি, এই অর্থেই উপাধি সার্থক।

প্রশ্ন

১. 'ইহা লইয়াই তর্ক'—কি নিয়ে কাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়েছিল? কাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়? এদের মধ্যে কারও নাম জান কি?
২. জয়কালীদেবীর স্বামীর নাম কি? তাঁর উপাধি কি ছিল। তাঁর উপাধির সার্থকতা বা অসার্থকতা বিষয়ে কি কি মত পাওয়া যায়?

এই বর্ণনা থেকে কারও মনে হতে পারে যে জয়কালীদেবী বুঝিবা খুব মুখরা এবং ঝগড়াটে ছিলেন। কিন্তু তা নয়। তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা। তিনি বেশি কথাই বলতেন না। মাঝে মাঝে দু-একটি যা কথা বলতেন, এমন কি নীরব থেকেও অনেকের অনেক কথা থামিয়ে দিতে পারতেন।

জয়কালীর ব্যক্তিত্ব তাঁর চেহারাতেও পরিস্ফুট। কেমন তাঁর চেহারা? লেখক বলেছেন, তিনি দীর্ঘকায়া (লম্বা গড়ন), দৃঢ় শরীর (মজবুত শরীর), তীক্ষ্ণনাশা (নাক তীক্ষ্ণ) এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন নারী ছিলেন।

তাঁর বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন লেখক। কি? মাধবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। বিধবা জয়কালী নিজের ক্ষমতায় (১) সমস্ত বকেয়া আদায় করলেন, (২) সীমাসরহদ্দ স্থির করলেন, (৩) বহু-কালের বেদখল উদ্ধার করে সমস্ত পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করলেন। এক কানাকড়িও ফাঁকি দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব হল না।

শুধু বুদ্ধি ও দক্ষতা নয়—তাঁর চরিত্রে নারীসুলভ গুণ ছিল না বললেই চলে। সাধারণ নারীদের মত তিনি পরনিন্দা বা নাকীকান্না সহ্য করতে পারতেন না। এমন কি গ্রামের নিষ্কর্মা যে সব লোকেরা

মণ্ডপে এসে আলস্যে কাল কাটাতেন, তাদেরও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এসব কিছুকে পর্যুদস্ত করতে যে তাঁকে অনেক বাক্য বা তিরস্কার বর্ষণ করতে হত এমন নয়। তাঁর নীরব উপস্থিতি বা তীব্র দৃষ্টিই এত ঘৃণা এবং নিষেধ ছড়িয়ে দিত যে তার সামনে প্রতিপক্ষ পালাতে পথ পেত না। অপরাধী তার সামনে মাথা তোলা ত দূরের কথা—অন্তর দহনেই পালাত।

তাঁর এইসব স্বভাবের জন্য তিনি পল্লীর কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। সুন্দর বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই জন্যই কেউ তাঁকে ভালবাসতেও সাহস পেত না, অবহেলা করতেও সাহস পেত না।

অথচ সকলের সমস্ত আপদে-বিপদে তিনি ছিলেন সহায়। রোগীর সেবাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর ভয়ে রোগী পথ্য এবং ওষুধ খেতে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে সাহস পেত না। ফলে রোগমুক্তি অনায়াস সাধ্য হত।

এইসব কারণে পল্লীর সকলের ওপরে তিনি নিয়মরক্ষকের মত বর্তমান ছিলেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী।

গোটা গ্রামের সঙ্গে জয়কালীর সম্পর্ক সম্বন্ধে দশম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর এসেছে জয়কালীর পারিবারিক জীবনের কথা।

প্রশ্ন

১. স্বামীর মৃত্যুর পর জয়কালী কিভাবে স্বামীর দেবোত্তর সম্পত্তিরক্ষা করেন?
২. কি কি নারীসুলভ ব্যাপার জয়কালী পছন্দ করতেন না? পুরুষদেরও কি কি ব্যবহার তাঁর অপছন্দ ছিল?
৩. 'সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।'—কি সম্বন্ধে? কেন সন্দেহ থাকত না?
৪. 'পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।'—কার কথা বলা হয়েছে? পল্লীর সকলের সঙ্গে তাঁর কি রকম যোগ ছিল? তিনি একাকিনীই বা ছিলেন কেন?
৫. জয়কালীর পরুষ চরিত্রের বর্ণনা দাও।

পদার্থ বিদ্যার নবযুগ : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইলেকট্রনের জয়যাত্রা

এই প্রবন্ধটির প্রথম সাতটি অনুচ্ছেদ বিশেষ কোন উপশিরোনামের অধীনস্থ করা হয়নি। কিন্তু তারপর থেকেই রেডিও, টকি, টেলিভিশন, রেডার ইত্যাদি অনেকগুলো উপশিরোনামের অধীনে আলোচনা রাখা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় উপশিরোনামহীন অংশটি অন্য অংশগুলোর সাধারণ ভূমিকা মাত্র।

এই উপশিরোনামহীন ভূমিকা অংশে লেখক ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর, ইলেকট্রনকে কিভাবে কাজে লাগান হয়েছে তারই প্রাথমিক বর্ণনা শুরু করেছেন।

ইলেকট্রনকে কাজে লাগাতে শুরু করবার আগে ইলেকট্রন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যেসব সাধারণ সূত্র জানলেন তা হল,

১. **অ্যাটমের এক ক্ষুদ্র অংশ হল ইলেকট্রন।**

২. অ্যাটম নিরীহ কিন্তু ইলেকট্রন অমিত বলশালী।

এই অমিত বলশালী ইলেকট্রনকে কাজে লাগাতে তিনটি যন্ত্র তৈরি হল। এই যন্ত্র তিনটি হল, ১. ভালভ, ২. আলোককোষ এবং ৩. আলোক-রশ্মিকোষ।

এছাড়াও নানা রকমে ইলেকট্রনকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করা শুরু হল।

প্রশ্ন

১. 'যেই এ কথা বিজ্ঞানী জানল, অমনি ইলেকট্রনদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করল।'
—কি কি কথা বিজ্ঞানীরা জানল?
—কি কি ভাবে ইলেকট্রনদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করল?

২ 'প্রধানত তিনটে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি হল।'—এই যন্ত্র তিনটির নাম বল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে ভালভের বর্ণনা শুরু হয়েছে। লেখক প্রথমেই জানিয়েছেন কোন ধাতব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন পাবার সহজ উপায়। উপায়টি কি? উপায়টি হচ্ছে পদার্থটিকে উত্তপ্ত করা।

কিন্তু উত্তপ্ত করলেই ইলেকট্রন বের হবে কেন?

আসলে একটা অ্যাটমের ভেতরে ইলেকট্রনগুলো অবিরত ঘুরে চলেছে। এবার যদি তাকে তপ্ত করা হয়, তবে তার ঘোরার বেগ বেড়ে যায়। বাড়তে বাড়তে একটা সময় আসে যখন সে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

ইলেকট্রনের বেরিয়ে আসাকে বোঝাতে গিয়ে লেখক একটা উপমা দিয়েছেন। মনে করা যাক একটি ছেলে একটা দড়ির

মাথায় একটি ঢিল বেঁধে মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে। সে যদি ক্রমাগত ঘোরাবার বেগ বাড়াতে থাকে আর দড়িটা যদি শক্ত না হয় তবে একসময় ঢিলটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে। এই কাণ্ডই ঘটে ইলেকট্রনের বেলায়।

প্রশ্ন

১. ধাতব-পদার্থ থেকে ইলেকট্রন পাবার সহজ উপায় কি?

২. তাপ পেলে ইলেকট্রনের কি পরিবর্তন ঘটে? আরও তাপ বাড়ালে কি হয়?

৩. 'ইলেকট্রনের বেলাতেও ঠিক সেই রকম ঘটছে।' সেই রকমটি বলতে কোন রকমকে বোঝান হয়েছে?

তৃতীয় স্তবকে লেখক ইলেকট্রন বের হবার পর অ্যাটমটির অবস্থা বোঝাচ্ছেন।

তোমরা আগেই জেনেছ, ইলেকট্রন নেগেটিভ বা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত থাকে। তাই ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে অ্যাটমটি ধনাত্মক বা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হয়ে যায়। তার আকর্ষণ থাকবে ঋণাত্মক তড়িতযুক্ত ইলেকট্রনের প্রতি। এই আকর্ষণের জন্যই

ইলেকট্রন সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু যদি বাইরে যাবার জন্য উৎসুক একটি ঋণাত্মক ইলেকট্রনের পাশে একটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পদার্থ ধরা যায়, যার বিভব শক্তি অ্যাটমের ভেতরের পজিটিভ তড়িতের চেয়ে অনেক বেশি, তবে বহির্মুখী ইলেকট্রনটি সহজে সেই দিকে চলে যাবে।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে 'ইলেকট্রন' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়বার সময় আমরা 'এডিসন ক্রিয়া' নামে একটা ব্যাপার পেয়েছিলাম। যার ব্যাখ্যা স্বয়ং এডিসনও তখন করতে পারেননি। লেখকও দেননি। [আমাদের পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যার (১ ফেব্রুয়ারি) ৩৩ পৃষ্ঠায় ব্যাপারটি বর্ণিত আছে।]

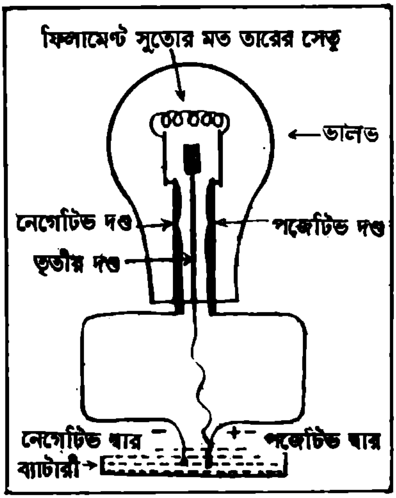

এবারে কিন্তু 'এডিসন ক্রিয়া'র ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। মাঝের পাতটি উচ্চ বিভব পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হওয়ায় ইলেকট্রন ছুটে যায় ওর দিকে এবং তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনের যাত্রার ফলেই ঐ কাণ্ডটি ঘটেছিল।

এডিসনের পূর্বোক্ত পরীক্ষা নিয়ে আর বড় পরীক্ষা করলেন ফ্লেমিং। তিনি বালবের ভেতরে উত্তপ্ত তার চাকতির মাঝে বাধাস্বরূপ একটি অভ্র খণ্ড রাখলেন। দেখা গেল, মাঝের চাকতি উজ্জ্বল হল না। এরপর এই জাতীয় অনেকগুলো পরীক্ষা করে ফ্লেমিং সিদ্ধান্ত করলেন যে, বালবের ভেতরের উত্তপ্ত তার থেকে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ তড়িৎ বেরিয়ে আসে।

ফ্লেমিং অবশ্য সেদিনই একে ইলেকট্রন বলে চিনতে পারেননি। এর কয়েক বৎসর পর ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।

ফ্লেমিং-এর পরীক্ষাগুলো থেকেই আধুনিক ভালভের সূচনা হল।

প্রশ্ন

১. ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে অ্যাটমটির অবস্থা কেমন হয়? তখন অ্যাটমটির মধ্যে কি প্রবণতা দেখা দেয়?
২. তপ্ত পদার্থের অ্যাটম থেকে ইলেকট্রনকে বের করে নেবার পক্ষে কোথায় বাধা থাকে? এই বাধাকে অতিক্রম করবার সহজ পদ্ধতি কি?
৩. 'এডিসন-ক্রিয়া'র কি ব্যাখ্যা আমরা ইলেকট্রন আবিষ্কারের পরে জানতে পারি?
৪. আধুনিক ভালভের সূচনা, কার পরীক্ষার পর থেকে?

পঞ্চম অনুচ্ছেদ থেকে লেখক ফ্লেমিং-এর পরীক্ষা সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রথমেই লেখক বলেছেন যে, এ জাতীয় পরীক্ষায় ফ্লেমিং-এর আগ্রহের পিছনে ছিল এক ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা। ফ্লেমিং ছিলেন কালা (অর্থাৎ কানে কম শুনতেন)। তখন বিনা তারে সংকেত পাঠান শুরু হয়েছে। ফ্লেমিং তার সংবাদ পড়ছেন, জানছেন কিন্তু নিজে শুনতে

পাচ্ছেন না।

এই করুণ অবস্থা থেকেই ফ্লেমিং-এর মনে আগ্রহ জাগল যে বিনা তারে পাঠান সংকেতকে শব্দে প্রকাশ না করে এমন কিছু করা যায় কি না, যা কানে না শুনতে পারলেও বোঝা যাবে। কি হতে পারে তা? ধরা যাক, সংকেতটি যদি কোন যন্ত্রের কাঁটাকে নাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করে! এইটুকু ইচ্ছে নিয়েই ফ্লেমিং কাজ শুরু করলেন বটে, কিন্তু তিনি যা করে ফেললেন তাতে মানুষের লাভ হল অনেক বেশি।

প্রশ্ন

১. 'তার মূলে ছিল এক করুণ কাহিনী' লেখক বর্ণিত করুণ কাহিনীটি বল। এই করুণ কাহিনীর ফলে কি হল?
২. ফ্লেমিং কেন এই বিজ্ঞান পরীক্ষায় নামলেন? তাঁর আকাঙ্ক্ষা কি ছিল?

'ইলেকট্রন' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচনায় তোমরা পাশের ছবিটি দেখেছ। এই ব্যবস্থাপনাকেই একটু পরিবর্তিত করলেন ফ্লেমিং। ফ্লেমিং-এর ব্যবস্থাপনার ছবি ডান দিকে রইল।

যুক্ত ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় তপ্ত চাকতির দিকে ছুটে চলল ইলেকট্রনরা। ফলে তড়িৎ প্রবাহিত হল। মনে রেখ,

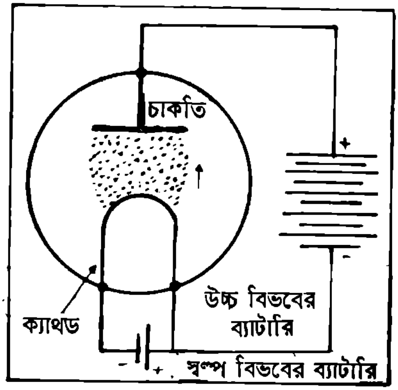

চাকতি পজিটিভ বিভবযুক্ত হতে হবে। নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হলে তড়িৎ-প্রবাহ থাকবে না। অর্থাৎ এটি পজিটিভ হলে প্রবাহের শক্তি বেড়ে যায়।

তোমরা জান বিদ্যুৎ প্রবাহ দুরকম। একরকম বিদ্যুৎকে বলে A. C. অন্যটিকে বলে D. C.। দ্বিতীয়টিতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ একমুখী কিন্তু A. C.-তে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে। একবার

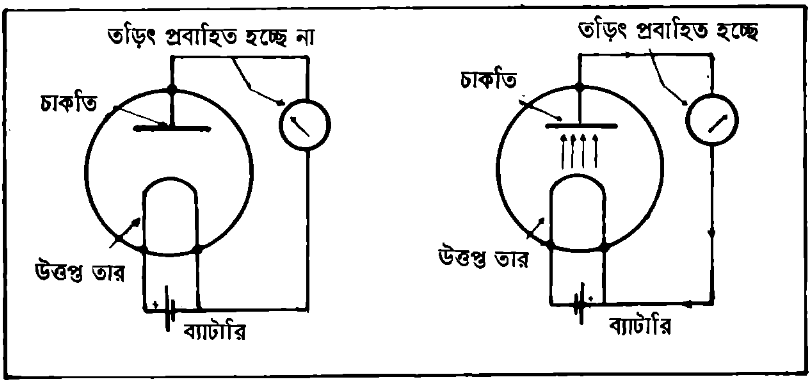

ছবির দিকে তাকালে বুঝবে কম বিভবের ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ক্যাথড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হল। উচ্চ বিভব-

যা থাকে পজিটিভ, পরমুহূর্তে তা হয় নেগেটিভ।

এখন ফ্লেমিং তার যন্ত্রে A. C. বিদ্যুৎ

প্রবাহ চালিয়ে দেখলেন যে ওতে একমুহূর্তে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলছে, নেগেটিভ হলেই চলছে না। অর্থাৎ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ একমুখীই থাকছে।

ফ্লেমিং-নির্মিত এই যন্ত্রকে বলা হল **'ভালভ'**। ভালভে রইল দুটি ব্যবস্থা। ১. একটি তার : যাকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে আর ২. ঐ তারকে ঘিরে একটি গোল চাকতি যা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত হয়ে ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবে।

প্রশ্ন

১. ফ্লেমিং-এর তৈরি যন্ত্রের নাম কি?
২. তাতে কি কি ব্যবস্থা রইল?
৩. ভালভ কি কি কাজ করতে পারে?
(উঃ সঃ দুটি কাজ। ১. প্রবাহের শক্তি বৃদ্ধি ২. পর্যাবৃত্ত তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়েও একমুখী প্রবাহ লাভ)

আজ আমরা যে ভালভ ব্যবহার করি আর ফ্লেমিং যে ভালভ আবিষ্কার করেছিলেন, দু-এর মধ্যে অনেক তফাৎ। এবারে লেখক সেই বর্ণনায় মেতেছেন।

১. এই ভালভকে যিনি প্রথম উন্নত করেন, তাঁর নাম লি. দ্য-ফরেস্ট। তিনি চাকতি আর তারের মাঝে একটা জালতি বসালেন। এই জালতিকে বলে গ্রিড। এর ফলে ভালভের যে উন্নতি হল, তা রেডিওর উন্নতিকে ত্বরান্বিত করল।

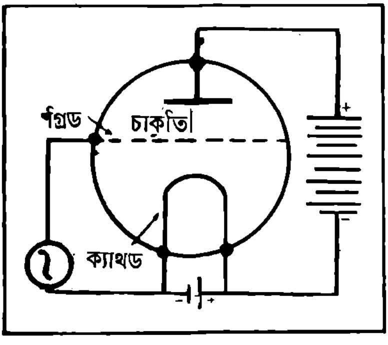

২. নানাভাবে ভালভের আরও উন্নতি সাধন করা হল। যেমন, যে তার থেকে ইলেকট্রন বের হয়, সেই তারের উপর যদি ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম বা স্ট্রনসিয়াম অক্সাইডের একটা আস্তরণ দেওয়া যায়, তবে দেখা গেল, অল্প উষ্ণতায় অনেক বেশি ইলেকট্রন বের হয়।

৩. এতদিন যে ভালভে যে তারটি তপ্ত হয়ে ইলেকট্রন ছাড়ত, সে তারটিই ক্যাথডের কাজ করত। এখন সেই তার আর ক্যাথড আলাদা করা হল। ক্যাথড হিসাবে সেই তারের মাথায় একটা

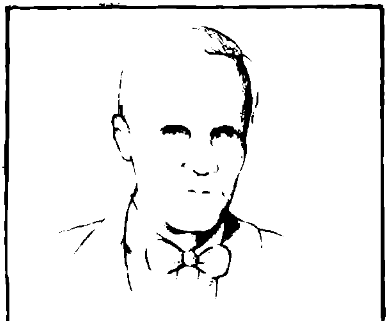

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

প্লেট বসান হল। ঐ প্লেট থেকে বের হত ইলেকট্রন।

৪. পরবর্তীকালে প্লেটের বদলে ব্যবহার করা হল একটা চোঙ। সেই চোঙটিতে লাগান হল অক্সাইডের আস্তরণ।

এখনকার ভালভে আর আগের মত দুটি জিনিস রইল না। রইল চারটি জিনিস। ভালভটি আর কাচের তৈরি করা হল না, তৈরি করা হল ধাতু দিয়ে।

এর ফলে জিনিসটি আকারে ছোট হল। ব্যবহারযোগ্যতা বেড়ে গেল। মোটরগাড়ি ইত্যাদিতেও ব্যবহার হতে থাকল। আর ধাতু-নির্মিত হওয়ায় বাইরের তড়িৎ-চুম্বকীয় আলোড়ন ভেতরে পৌঁছতে পারল না।

আজ পৃথিবীর বিজ্ঞানের অনেক পরিবর্তন করেছে এই ভালভ। ভালভের দৌলতেই মৃদু শব্দ বহু দূর অতিক্রম করেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

প্রশ্ন

১. ভালভের প্রথম উন্নতি সাধন করেন যিনি তাঁর নাম বল। তিনি ফ্লেমিং-এর ভালভের কি পরিবর্তন করেন?

২. গ্রিড কাকে বলে? কে কিসে গ্রিড প্রথম সংযোগ করেন?

৩. 'অন্য দিকে কিছু কিছু পরিবর্তন করে এর শক্তি বাড়ান হল।' —কিসের শক্তি বাড়ান হল? কি কি পরিবর্তন করে শক্তি বাড়ান হল?

৪. 'আজ বিজ্ঞান যে পৃথিবীর রূপ একেবারে বদলে দিয়েছে তা প্রধানভাবে সম্পাদন করল এই ভালভ।' —লেখকের এ মন্তব্য সত্য কি? কি কি ভাবে?

নির্মল লাহিড়ী

বীর সন্ন্যাসী

একদিন একটি মিনমিনে পিনপিনে ভিজেবেড়াল গোছের ছোকরা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে বেলুড়ে এল। বলল, 'আমি সাধু হব। স্বামীজী আগাপাশতলা একবার তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওহে, সাধু হওয়া অত সহজ নয়। আগে চুরি- ডাকাতি কর গে যাও, তারপর সাধু।

দুই লেখক

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ কবি নবীনচন্দ্র সেনকে লিখছেন 'এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়, আমার হাতের লেখা পত্র আমি না পড়িয়া দিলে মানুষের সাধ্য নাই যে পড়ে। যার হস্তাক্ষর, সে আমার সন্তানের তুল্য, আমার সঙ্গে বসিয়া লেখে।' এর উত্তরে নবীনচন্দ্র লিখছেন— 'হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি তোমার কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা বলা কঠিন।'

দ্বিতীয় ভাষা ঃ ইংরাজী

TEXT

A DAILY DRAMA

[Jerome K Jerome]

I

1. তোমাদের ইংরাজী Text বইয়ের A Daily Drama নামের গল্পটি লিখেছেন Jerome K Jerome. তাঁর নামের মাঝখানে যে K অক্ষরটি বসান আছে সেটা Klapka শব্দের প্রথম অক্ষর। লেখকের পুরো নাম Jerome Klapka Jerome. Jerome গত শতকের শেষের দিক থেকে এই শতকের শেষ দিক পর্যন্ত অনেকগুলো হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং অভিনয়ও করতেন। Three Men In A Boat, Diary of a Pilgrimage, Three men on the Bummel, Paul Kelver ইত্যাদি তাঁর কয়েকখানি নামকরা গ্রন্থ। A Daily Drama গল্পটি তাঁর Three Men on the Bummel গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

2. A Daily Drama—একটি রোজকার নাটক। যদিও এটি একটি গল্প বা স্কেচ-ধর্মী গল্প (Sketch : a short humorous piece of writing) তবু এর নামকরণে drama বা নাটক শব্দটি ব্যবহার করা হল কেন—সেখানে একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে। তোমরা মঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখেছ। সেখানে চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা, অভিনয়, দৃশ্য—এমনি আরও কত কী থাকে। এখানে ঠিক সেই অর্থে A Daily Drama কোনও নাটক নয়। এমন কি নাটকের আকারেও এটি লেখা হয়নি। তবুও এটিকে Drama বলা হয়েছে এইজন্য যে, এই গল্পে এমন একটি মজার চরিত্র আছে, এমন কিছু ব্যঞ্জনাময় সংলাপ আছে এবং এমন কয়েকটি আকর্ষণকারী ঘটনা আছে—যাকে তোমরা এককথায় নাটকীয় উপাদান বা Dramatic elements বলতে পার। সুতরাং গল্পের নামকরণে Drama শব্দের ব্যবহার সার্থক।

II

1. এবার গল্পের কিছুটা অংশ বলি শোন। (বইটা খুলে দেখ এবং From my Uncle Podger's house থেকে but they tried their hardest পর্যন্ত ঃ অর্থাৎ প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদ চিহ্নিত কর)।

আমার (লেখকের) Podger খুড়োর (পোজার, বানানটা খেয়াল রেখ) বাড়ি থেকে রেল স্টেশন আট মিনিটের হাঁটা-পথ। খুড়ো সব সময় বলতেন, 'পনের মিনিট সময় হাতে রাখবে এবং ধীরে-সুস্থে হাঁটবে।'

আর নিজে যা করতেন তা হল নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়ে দৌড়ন।

অনেক মোটা সোটা ভদ্রলোক Ealing (ঈলিং, একটি শহরতলীর গ্রাম)-এ বাস করতেন এবং শহরে যেতে এই ট্রেন ধরতেন। তাঁরা সবাই দেরিতে রওনা হতেন। সবাই এক হাতে একটি কালো

ব্যাগ ও খবরের কাগজ এবং অন্যহাতে একটি ছাতা বয়ে নিয়ে যেতেন। আর স্টেশনে পৌঁছবার শেষ পোয়া মাইলটা ছুটতেন, তা সে আবহাওয়া খারাপ হক বা ভাল হক।

কোন কাজকর্ম নেই এমন লোকরা ওঁদের এই স্টেশনে যাওয়ার ব্যাপারটা দেখবার জন্য সুন্দর সকালগুলোতে রাস্তায় এসে জড়ো হত এবং চিৎকার করে উৎসাহ দিত। ওঁরা ভাল দৌড়তে পারতেন না, এমন কি জোরেও না। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

2. যতটুকু গল্প বলা হল তার মূল ইংরাজী অংশ পড়ে যাতে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পার সেজন্য নিচে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণগত তাৎপর্য এবং বিশেষ বিশেষ বাক্যের গঠনরীতি ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হল।

A. WORDS : **Eight minutes walk**—আট মিনিটের হাঁটা পথ, **The distance that can be covered on foot in eight minutes time. Minute :** এখানে **minute** বানানটি খেয়াল রেখ। এই শব্দটির অন্য একটি অর্থ হল 'অতিক্ষুদ্র', (**very small**) বা পুঙ্খানুপুঙ্খ (**Giving small details, exact**)। এই দুই অর্থের যে কোন একটিতে ব্যবহৃত হলে শব্দটির উচ্চারণ

হয় 'মাইনিউট'।

Walk : শব্দটি এখানে Noun হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। Give yourself........hour—সোয়া ঘণ্টা (অর্থাৎ পনের মিনিট) সময় হাতে নাও ; allow yourself fifteen minutes **quarter** এক চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$)।

A quarter of an hour : এক ঘণ্টার, অর্থাৎ ৬০ মিনিটের, চারভাগের একভাগ—অর্থাৎ পনের মিনিট বা সোয়া ঘণ্টা। It is a quarter to ten (পৌনে দশটা). It is a quarter past ten (সোয়া দশটা)।

An hour: 'hour' শব্দটি যদিও 'h' (consonant) দিয়ে শুরু তথাপি শব্দটির আগে an article ব্যবহৃত হয়। কারণ শব্দটিতে 'h' উচ্চারিত হয় না এবং স্বরধ্বনি দিয়ে উচ্চারণ শুরু হয় (আওয়ার)।

ধীরে ধীরে ; slowly / leisurely.

Before the time (এখানে) ট্রেন ছাড়ার সময়ের আগে। Caught this train ট্রেনটি ধরত।

N. B. লক্ষ্য কর, ট্রেন ধরার ইংরাজী হল 'to catch a train'

To Town—শহরে, নগরে। **N.B.** লক্ষ্য কর 'Town' শব্দটি capital 'T' দিয়ে শুরু হয়েছে এবং শব্দটির আগে কোনও article (a/the) ব্যবহার করা হয়নি। তাই সম্ভবত 'Town' শব্দটি এখানে London বোঝাচ্ছে। **Started late** দেরিতে রওনা হত। **Late** শব্দটি এখানে Adverb হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। এটা Adjective হিসাবেও ব্যবহার হতে পারে। যেমন : He came at a late hour. **Weather** (ওয়েদার)—আবহাওয়া। Cf. whether : শব্দটির বানান এবং অর্থ ভিন্ন, কিন্তু উচ্চারণ অনেকটা একরকম। **Wet**—ভেজা, (এখানে) বর্ষণসিক্ত ; rainy. Cf. wait, weight। শব্দ দুটো প্রায় একই উচ্চারণ-এর শব্দ অর্থ এবং বানান ভিন্ন।

People with nothing else to do—অন্য কোন কাজ করার নেই, এমন সব লোক—অর্থাৎ নিষ্কর্মা লোক ; lazy people, idles. **Watch**—লক্ষ্য করা ; to keep the eyes on। 'Watch' এখানে verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—শব্দটি Noun হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যেমন : Keep a watch on the movements of this man. **Encouragement**—উৎসাহ, প্রেরণা ; encouraging, stimulus.

N.B. গ্রামের মোটা সোটা লোকগুলো যখন এক হাতে খবরের কাগজ ও কালো ব্যাগ এবং অন্য হাতে ছাতা নিয়ে স্টেশনে দৌড়ত তখন তাদের দেখতে মজা লাগত এবং আরও মজা করার জন্য গ্রামের নিষ্কর্মা লোকগুলো ওদের দৌড়বার জন্য উৎসাহ দিত। **Fast**—দ্রুত, quickly, শব্দটি এখানে Adverb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি Adjective, Verb এবং Noun হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। (**See Lexical Test**).

B. SENTENCES : **1. From my uncle Podger's house to the railway station was eight minutes walk** i.e. It was eight minute's walk from Uncle Podger's house to the railway station.

2. What he alwawys did was to start five minutes before the time and run : বাক্যটির বক্তব্য হল এই : He always started five minutes before the time and ran. কিন্তু বাক্যটি বলার ভঙ্গীর একটা বিশেষত্ব আছে, তাই বাক্যগঠন অন্যরকম

হয়েছে। যেমন, বাঙলায় যদি বলি, তিনি সব সময়ই যা করতেন তা হল নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়ে দৌড়ন —তাহলে ইংরাজী বাক্যটি **what he always did was to**…দিয়েই শুরু হবে।

3. Lexical Test

1. Synonyms

Gently—slowly ; / bleisurely
Wet—rainy
Gather—assemble
fast (adv.)—quickly
Shout—cry

Antonyms

Uncle—aunt
Always—never
Late—early
Fast (adv.)—slowly
Encouragement—discouragement

2. Pick out the right word from the quotation given below and, with it, fill in the gap in each of the sentences under the quotation :

a. From my Uncle Podger's house to the railway station was eight minutes walk.

i. The man — quite fast.
ii. I take morning — everyday.

(Ans : 'walk' used as a verb and a noun.)

b. They all started late.

i. He came at a — hour.
ii. He goes to bed —

(Ans : 'late' used as an adjective and an adverb)

c. They did not even run fast.

i. Milkha Singh was a—runner.
ii. They cannot run —
iii. Jatin was — till death.
iv. The hungerstrikers broke their —

(Ans : 'fast' used as an adjective, adverb, verb and noun.)

3. Pick out the right word from those given within brakets and, with it, fill in the gap in each sentence here.

a. Give yourself a quarter of an — (our, hour).
b. They all started — (let, late).
c. Whether the — was wet or fine, they all ran. (whether, weather)
d. Whether the weather was — or fine, they all ran. (wait, wet, weight).

(Ans : a. hour, b. late, c. weather, d. wet).

Short Questions & Answers

Q : How far was the railway station from Uncle Podger's house ?

A : From Uncle Podger's house the railway station was eight minutes' walk.

Q : What advice did Uncle Podger always give others ?

A : Uncle Podger always advised others to start a quarter of an hour before the time when the train to Town was to leave the Station, and walk gently.

Q : What did he himself do ?

A : He himself started late, just five minutes before the time and ran.

Q : Where did the fat gentlemen live ?

A : The fat gentlemen lived at Ealing, a suburban village.

Q : What did they carry with them ?

A : They carried a black bag and a newspaper in one hand, and an umbrella in the other.

Q : What did they do for the last quarter of a mile ?

A : Whether the weather was wet

or fine they all ran for the last quarter of a mile.

Q : Who were the people who used to gather in the street ?

A : People who had nothing else to do used to gather in the street.

Q : Why did they gather ?

A : They gathered to watch the fat gentlemen run to the station and encourage them to run faster.

Q : How did the fat men run ?

A : The fat men did not run well or even fast, but they tried their best.

5. প্রশ্নপত্রের 2 নং প্রশ্নগুলো সাধারণত Prose Text থেকে লাইন তুলে দিয়ে তার ওপরে করা হয়। তিনটি প্রশ্ন থাকে। উত্তরগুলোও তিনভাগে লিখতে হয়। নম্বর থাকে $2+3+2=7$.

এখন গল্পের যে অংশটি তোমরা পড়লে তার থেকে একটা লাইন তুলে দিয়ে তার ওপরে প্রশ্নোত্তর কেমন হবে দেখে নাও।

Q : 'Give yourself a quarter of an hour, and walk gently.'

i. Who said this and to whom ?

ii. In what connection did the speaker say this ?

iii. What did the speaker do himself ?

A : i. Uncle Podger said this. He said to those of his village, Ealing, who started late to catch the train to tour and so had to run to the station.

ii. From Uncle Podger's house the railway station was eight minutes' walk. If anybody was to avail himself of the train for the town he ought to start fifteen minutes before the time. This was enough to cover the distance gently on foot. In this connection Uncle Podger said this.

iii. Uncle Podger, the speaker of the quoted words would himself start five minutes before the time. So he had to run to catch the train.

প্রশ্নপত্রের নির্দেশমত উত্তরগুলোর লাইনসংখ্যা ঠিক রাখা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সর্বদা বাধ্যবাধকতা নেই।

GRAMMAR

(*Active & Passive Voices*)

(Assertive Sentence, Present Tense, Single Object)

Class IX-এ ওঠার আগেই তোমরা Voice কাকে বলে তা নিশ্চয়ই শিখে গেছ। তোমরা জান যে, Voice দু ধরনের Active এবং Passive। Voice দুটির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব অর্থাৎ Active Voice-কে Passive-এ এবং Passive Voice-কে Active-এ রূপান্তরিত (transform) করা যায়। একেই Voice-change বলা হয়। ইংরাজী শিখতে গেলে Voice change ত জানতেই হবে, তাছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের Grammar অংশে যেখানে Re-writing বা Transformation of sentences থাকে তার মধ্যে Voice change করতে দেওয়া হয়। সুতরাং বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

Cats kill rats. (বেড়াল ইঁদুর মারে)

Rats are killed by cats. (ইঁদুর বেড়াল দ্বারা নিহত হয়।) লক্ষ্য কর, এই দুটি Sentence-এর অর্থ কিন্তু একই। অথচ, প্রথম Sentence-টির Subject cats, Object rats এবং verb kill দ্বিতীয় sentence-এ স্থান এবং রূপ পরিবর্তন করেছে। অথবা,—

The girls are plucking flowers.

Flowers are being plucked by the girls. অথবা—

The boys have done it.

It has been done by the boys.—এই সব জোড়া জোড়া Sentence-এ তোমরা ওই একই জিনিস লক্ষ্য করেছ। এখন ওপরের ওই তিন জোড়া Sentence খুঁটিয়ে দেখলে তোমরা বুঝবে প্রথম Sentenceগুলোতে Subject (Cats, The girls, The boys) নিজেরাই সক্রিয়ভাবে (বা actively) kill, pluck এবং do এই verb-গুলো সম্পন্ন করছে এবং প্রত্যেক verb-এর একটি করে object (কর্ম) (rats, flowers, it) আছে। অর্থাৎ, verb গুলো সকর্মক বা transitive. তাহলে, যখন Sentence-এর Subject সক্রিয়-ভাবে নিজেই কোন verb বা ক্রিয়া সম্পন্ন করে বা act করে verb-এর Object স্বস্থানে থাকে তখন Sentence-টিকে তোমরা Active Voice-এর উদাহরণ বলে জেনে রাখবে।

1. Cats kill rats.

2. The girls are plucking flowers.

3. The boys have done it.

—এইগুলো Active Voice-এর উদাহরণ। Active Voice-য়ে ক্রিয়ার কর্তা (Subject) প্রাধান্য লাভ করে (made prominent)।

আবার,

1. Rats are killed by cats.

2. Flowers are being plucked by the girls.

3. It has been done by the boys.—এই Sentenceগুলোতে যে শব্দ তিনটি Subject-এর স্থান অধিকার করে আছে তা হল rats, flowers এবং it। এরা নিজেরা কোন কাজ সম্পন্ন করছে না। তারা নিষ্ক্রিয় বা Passive। কারণ, এই Subject গুলো ত Active Voice-এ কর্ম বা Object ছিল। এরা কোন কাজই করেনি। সুতরাং, এই Sentence গুলো Passive Voice-এর উদাহরণ। Passive Voice-এর বাক্যে Active Voice-এর Subject (অর্থাৎ doer of the action) প্রাধান্য লাভ করে না। (এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য কর। কোন বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার Object যখন রূপান্তরিত বাক্যে Subject হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখনই তাকে আমরা Passive Voice-এর বাক্য বলি। ফলে দাঁড়াচ্ছে এই যে একমাত্র **সকর্মক** ক্রিয়ারই (transitive verb) Passive Voice হতে পারে। যেমন **অকর্মক** ক্রিয়ার (intransitive verb) Passive Voice হয় না।)

এখন তোমাদের মনে রাখতে হবে Active থেকে Passive-এ পরিবর্তন করার সময় কি কি নিয়ম মেনে চলতে হয়;

১. Active Voice-এর Object Passive Voice-এ Subject হয়ে বসবে এবং Active Voice-এর Subject বাক্যটিতে সাধারণত by যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার Agent হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

২. Active Voice-এ মূল verb যে Tense-এ ব্যবহার করা থাকবে Passive Voice-এ সেই Tense-ই ব্যবহার হবে এবং verb-টির Past Participle রূপটি ব্যবহার করতে হবে। যেমন, আগের উদাহরণগুলোতে Passive Voice-এ killed, plucked এবং done ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. Active Voice-এ ব্যবহৃত মূল verb-টির Past Participle রূপ Passive Voice-এ ব্যবহৃত হবে এবং সেই Past Participle রূপের ঠিক আগে মূল verb-এর Tense এবং Passive Voice-এ ব্যবহৃত Subject অনুযায়ী be verb-এর প্রয়োজনীয় রূপ ব্যবহৃত হবে। যেমন: Present Indefinite—**is / am / are**, Present Continuous—**being**, Present Perfect—**been.**

ওপরে দেখান Passive Voice-এর বাক্য তিনটি আবার দেখ:

1. Rats **are killed**······
2. Flowers **are being plucked**····
3. **It has been done**······

৪. শেষ নিয়মটি হল, Active Voice-এ ব্যবহৃত Subject Word (Subject-doer of the action / agent) Passive Voice-এ সাধারণত by যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আগেই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। ওপরের উদাহরণ-গুলোতে তোমরা যেমন দেখেছ **by** cats, **by** the girls এবং **by** the boys.

লক্ষ্য কর, সাধারণত শব্দটি ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ সর্বদাই by বসবে এমন কথা নেই। যে সব Passive Voice-এ Subject নিতান্তই গৌণ এমনকি হয়ত অজানা সে সব ক্ষেত্রে by-যুক্ত Subject-word উল্লেখই করা হয় না। যেমন ধর, তোমার কলমটি চুরি গেছে এবং কে যে চুরি করেছে তা তুমি জান না। তখন তুমি কি বাঙলায় কি ইংরাজীতে যে বাক্য ব্যবহার করবে তা হল: আমার কলমটি চুরি গেছে—My pen has been stolen. এসব ক্ষেত্রে Subject-এর উল্লেখ নেই। Subject-এর উল্লেখ করতে হলে যা বলতে হবে তা হল: আমার কলমটি কোন ব্যক্তি দ্বারা হৃত হয়েছে—My pen has been stolen by somebody. এ অতি স্বাভাবিক ভাষা।

আবার অনেক সময় এমন কতকগুলো transitive verb থাকে যাদের Passive Voice-এ Object-এর আগে by-এর পরিবর্তে to or with বসাতে হয়; যেমন—

Ram knows Shyam. (Active)

Shyam is known **to** Ram. (**Passive**) অথবা,—

Smoke has filled the room (**Active**)

The room has been filled **with** somke. (**Passive**)

Present tense-এ Voice change-এর ব্যাপারটা এক নজরে দেখ

Present Indefinite

	Subject	Verb	Object
Active :	Cats	kill	rats
Passive :	Rats	are killed	by cats

Present Continuous

Active : The cat is killing a rat.
Passive : A rat **is being killed by** the cat.

Present Perfect

Active : The cat has killed a rat.
Passive : A rat **has been killed by** the cat.

TRANSLATION

বাঙলা ভাষা থেকে ইংরাজীতে **translation** করতে গেলে কি কি লক্ষ্য রাখতে হয় এবং কেমনভাবে **sentence** সাজাতে হয় সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বিগত বারটি সংখ্যায়। **Grammer** অংশে তোমরা voice change শিখতে আরম্ভ করেছ। Translation অংশেও আমরা grammer অংশের সূত্র ধরে voice change-এর চর্চা করব। প্রথমে কয়েকটি বাক্য, পরে একটি বাঙলা অনুচ্ছেদ বা passage-এর ইংরাজী translation করে দেওয়া হচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য কর।

Sentence : 1. রাত্রিবেলা ভ্রমণকারীরা প্রায়ই ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হয়—Travellers are often attacked by robbers at night.

2. ছেলেটি তার শিক্ষক কর্তৃক তিরস্কৃত হচ্ছে—The boy is being scolded by the teacher.

3. এই শিল্পী দ্বারাই ছবিটি আঁকা হয়েছে—This picture has been painted by this artist.

4. একমাত্র তোমার দ্বারাই এই কাজটি হতে পারে—This work can be done by you alone.

5. আমার বাইসাইকেলটি চুরি গেছে—My bicycle has been stolen.

Passage : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর নাম সকলের কাছে পরিচিত। তিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙলা সাহিত্য আজ সকলের দ্বারা সম্মানিত। হিমালয় পর্বতের মতই তাঁর কাব্যের মহত্ব। প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। কিন্তু আমরা তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করছি কি? আমরা কি মনে করি—তাঁর সম্পর্কে সবকিছু আমাদের জানা হয়ে গেছে?

Rabindranath is **one of the greatest Poets**[1] of the world. His name **is known to**[2] all. He has enriched the **Bengali**[3] language and literature. Bengali literature is now **honoured by**[4] all. The greatness of his Poetry is like **that**[5] of **the Himalayas**[6]. His birthday **is celebrated**[7] every year **on the 25th**[8] **day of** Vaishakh (or, the 25th Vaisakh or, 25 Vaisakh). But are we following his ideals? Do we think—everything about him **has been learnt by**[9] us?

এই ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে লক্ষ্য করার মত যে সব ব্যাকরণগত বিষয় আছে সেগুলো সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। 1. One of ব্যবহার করা হয় অন্যতম বা অনেকের মধ্যে একজন বা অনেকাকিছুর মধ্যে একটিকে বোঝাবারজন্য। ফলে যাদের বা যে জিনিসগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেখানে অবশ্যই Plural Number ব্যবহার হবে। যেমন হয়েছে—Poets-এর ক্ষেত্রে। 2. Present Indefinite Tense-এর Passive Voice-এর একটি উদাহরণ। তোমরা এই Lesson-এর মধ্যেই শিখেছ। 3. কোন জাতি বা ভাষা বুঝান হয় যে শব্দের দ্বারা সেই শব্দ Capital

Letter দিয়ে আরম্ভ হয়। 4, 7 ও 9 যথাক্রমে Present Tense-এর Indefinite, Continuous এবং Perfect form-এর Passive Voice-এর উদাহরণ। 5. এখানে যে 'that' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা 'the greatness'-এর পরিবর্তে বসেছে। আসলে Sentence টা হওয়ার কথা—The greatness of his Poetry is like the greatness of the Himalayas. একই Sentence-এ অত কাছাকাছি একই কথার পুনরাবৃত্তি শ্রুতি-কটু। তাই এই 'that'-এর ব্যবহার। 6. Himalayas শব্দটি সর্বদা Plural. প্রথম অক্ষর H সর্বদা Capital Letter এবং শব্দটির আগে সব সময় the ব্যবহার হবে। এসব কথা Articles, Number এবং Capital Letter-এর ব্যবহার সংক্রান্ত Lesson গুলোতে তোমরা অবশ্যই পড়েছ। 8. বাঙলা বাক্যটিতে ব্যবহৃত ২৫ শে বৈশাখ শব্দ দুটি বলতে বোঝা হচ্ছে ২৫ শে বৈশাখে, ফলে তারিখটির পূর্বে On বসবে। আর যদি শব্দ দুটোর ইংরাজী কর 25th Vaisakh তবে তার পূর্বে the নামক articleটি বসবে। কিন্তু যদি ওর ইংরাজী শুধু 25 Vaisakh করতে চাও তবে তার পূর্বে the বসবে না।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে ওপরের Passageটিতে Present Tense এর Indefinite ও Perfect form এবং তার ভিত্তিতে Assertive ও Interrogative sentence এবং Active ও Passive Voice-এর ব্যবহার হয়েছে। এখন এই ধরনের আর একটি Passage নিচে দেওয়া হল। তোমরা বাড়িতে Passage-টির ইংরাজী Translation করে রেখ। পরের সংখ্যায় আমরা Translationটি করে দেব। তখন মিলিয়ে এবং দরকার মত correct করে নিও।

TASK

অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বভারতী একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। দেশ-বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা এইখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসেন। এইখানে অনেক বিষয়ের পড়াশুনা হয়। দিনে দিনে বিশ্ববিদ্যালয়টি বড় হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত হইতেছে। সেখানে অনেক ঘরবাড়ি নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি ?

[**Hints :** প্রতিষ্ঠিত—founded / established, বিদেশ—abroad, পড়াশুনা হয়—studied, সাহায্যপ্রাপ্ত—aided, উদ্দেশ্য—aim / object.]

COMPREHENSION TEST

গত মে মাসের দুটো সংখ্যা এবং ১৬ জুনের সংখ্যায় Comprehension Test বলতে কি বোঝায় এবং কেমন করে তার উত্তর লিখতে হয় তার নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। তারই ভিত্তিতে এ সংখ্যায় আরও একটু চর্চা করা যাক। তারপরে মে মাসের প্রথম সংখ্যায় যে Task দেওয়া ছিল তার উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে।

১৬ জুন সংখ্যায় পড়েছ যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বর্তমান নিয়ম অনুসারে একটি Passage দিয়ে তার নিচে কতকগুলো অসমাপ্ত বিবৃতি দেওয়া হয় এবং প্রতি অসমাপ্ত বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করার জন্য পাশেই একাধিক বাক্যাংশ দেওয়া হয়—তার একটি সঠিক, অপরটি বা অপরগুলো বেঠিক বা আধা ঠিক। তোমাকে শুধু সঠিক বাক্যাংশটি বেছে নিয়ে অসমাপ্ত

বিবৃতিটিকে Sentence আকারে সম্পূর্ণ করতে হবে।

Passage : Our Master was a good, kind man. He gave us food, good lodging and kind words and spoke as kindly to us as he did to his little children. We were all fond of him, and my mother loved him very much. When she saw him at the gate she would neigh with joy and trot up to him.

i. The Master here Means :
   a. The teacher.
   b. The owner.
   c. The keeper.

ii. The speaker here in :
   a. A Cow
   b. A Girl
   c. A Horse

iii. In the clause 'as he did to his children above', 'did' means :
   a. Worked
   b. Was kind
   c. Spoke

iv. The speaker's mother loved her master because :
   a. He was good and kind
   b. He gave us food
   c. He gave us good lodging.

v. She would trot up to her master :
   a. Because her master trained her to do so
   b. Because she loved her master
   c. Because she used to be full of joy to see the master.

Passage-টা মনোযোগ দিয়ে পড়। তারপর প্রত্যেক statement-এর মধ্যে যে সঠিক বেঠিক মিলিয়ে multiple choice দেওয়া আছে তার মধ্যে এমন একটিকে choose কর (বা pick out) অর্থাৎ বেছে নাও যেটা সঠিক।

Passage-টা পড়লেই বুঝতে পারবে যে তার ভাষা এবং বিষয়বস্তু কঠিন নয়। কিন্তু, সব থেকে বড় যে প্রশ্নটা তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে সেটা—বোধহয়—এই Passage-এর বক্তার পরিচয় কি ? এই পরিচয় না পেলে Passage-টার সম্যক উপলব্ধি (comprehension) হবে না এবং ফলে উত্তরগুলোও ঠিক ঠিক বেছে নেওয়া যাবে না। মনে হতে পারে— এখানে বক্তা একটা ছেলে বা মেয়ে। সে তার মা এবং তাদের প্রভু (master) সম্বন্ধে বলছে। আবার, statement-গুলোর মধ্যে cow এবং horse শব্দগুলো দেখে তোমরা অনেকে ভাবতে পার যে— না, ব্যাপারটা কোন জন্তু নিয়ে হতে পারে। সত্যিই ত, এ ধরনের একটা ধাঁধা দেখা দিতে পারে, কারণ, বক্তা সম্পর্কে কোন পরিষ্কার পরিচয় এখানে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই ধাঁধা-র উত্তর লুকিয়ে আছে মাত্র দুটো verb-এর মধ্যে। যারা verb দুটোরই বা অন্তত একটার অর্থ জান তাদের কাছে ব্যাপারটা কঠিন মনে হবে না। Verb দুটো হল—neigh (ঘোড়ার ডাক, হ্রেষা) এবং trot (ঘোড়ার চাল বা কদম)। এবারে নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি তোমরা বুঝে গেছ।

প্রথম statement-এর মধ্যে master শব্দটির অর্থ এখানে আর teacher হতে পারছে না এবং keeper শব্দের অর্থ মোটেই master নয়। সুতরাং, প্রথম সঠিক উত্তরটি হবে (i) The master here means the owner. দ্বিতীয় উত্তরটি খুবই সোজা, (ii) The speaker here is a horse. তৃতীয় উত্তরটি grammatical. তোমরা যেমন একই Noun একই জায়গায় বারবার ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে Pronoun ব্যবহার কর, তেমনি একই verb একই sentense-এর বিভিন্ন অংশে বারবার ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে 'do' verb ব্যবহার করা হয়। এখানে একবার spoke ব্যবহার করে পরে তার পরিবর্তে 'did' verb-টি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তৃতীয় উত্তরটি হবে ঃ (iii) In the clause 'as he did to his children' 'did' means spoke. চতুর্থ উত্তর ঃ (iv) The speaker's mother loved her master because he was good and kind. অন্য choice দুটো আংশিক সত্য, তাই সেগুলো সঠিক নয়। পঞ্চম বা শেষ উত্তরটি হবে ঃ (v) She would trot up to her master because she used to be full of joy to see the master.

* এই প্রসঙ্গে তোমরা জেনে রাখ যে, এতক্ষণ তোমরা যে multiple choice বা objective type comprehension test সম্বন্ধে শিখলে তা ছাড়াও আর এক ধরনের উত্তরদান পদ্ধতি আছে যেখানে একটা passage-এর ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয় এবং তার উত্তরগুলো passage থেকে খুঁজে নিয়ে বা passage-এর প্রসঙ্গ অনুযায়ী উত্তরটা তোমাকেই তৈরি করে লিখে দিতে হয়। একে Essay-type Test বলা হয়। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, দেখে নাও ঃ

About three hundred years ago, the Mughal Emperor, Aurungzeb, ruled in India. He had many enemies in the country, but Shivaji was his chief enemy.

Questions :

i. Who was Aurungzeb ?

ii. Who was his chief enemy ?

Answers :

i. Aurungzeb was a mughal emperor who ruled in Indla about three hundred years ago.

ii. Shivaji was his chief enemy.

এই ধরনের Essay-type comprehension test আজকাল বোর্ডের পরীক্ষায় দেওয়া হয় না। তবুও তোমাদের জেনে রাখা ভাল, কারণ, অন্য কোথাও কাজে লেগে যেতে পারে।

এইবার, গত ১ মে সংখ্যায় যে Task তোমাদের করতে দেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা করে দিচ্ছি। তোমরা মূল passage-টা এবং তোমাদের উত্তরগুলো সামনে রেখে মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজন হলে সংশোধন কর।

Passage-টাতে. এমন কতকগুলো word আছে যেগুলোর সঠিক অর্থ হয়ত তোমাদের জানা নেই। যেমন endured (সহ্য করেছিলেন), slavery (দাসত্ব) chafe (ক্রোধে অধৈর্য্য হয়ে ছটফট করা) delighted (খুশি হইতেন), valour (শৌর্য) ইত্যাদি। এই word-গুলোর

মোটামুটি অর্থ তোমরা passage-এর content (প্রসঙ্গ) দেখে আন্দাজ করে নিতে পার। তবে, এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর বাছাইয়ের ব্যাপারে (একমাত্র তৃতীয় উত্তরটি ছাড়া) ঐ সব শব্দের অর্থ না বুঝতে পারলেও চলবে।

Answers : (i) Hercules was the strongest man of the world. (ii) Hercules spent the major part of his life by helping the people who were weak. (iii) Hercules endured his slavery with impatience. এখানে multiple choice-এ যে wordগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাদের অর্থ খুব সহজ নয়। তাই সঠিক উত্তর (with impatience) choose করার আগে passage-এর মধ্যে ব্যবহৃত unhappy, restless, spirit, chafe ইত্যাদি word-গুলোর সমবায়ে যে অর্থ-দ্যোতনা সৃষ্ট হয়েছে সেদিতে লক্ষ্য রাখতে হবে। (iv) Juno sent Hercules into all sorts of dangers as she hated him and wanted to kill him. (v) Herculean task means a very difficult and dangerous task.

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

কথার কথা

হিয়েরোগ্লিফিক্স (**hieroglyphics**) ছবি দিয়ে কথা তৈরি করা হত প্রাচীনকালে, খ্রিস্ট জন্মেরও ২৬০০ বছর আগে। অর্থাৎ আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছরেরও বেশি আগে। এখনও চীনে ছবি—লেখার যুগ চলছে। প্রাচীন মিশরের অসাধারণ সব ছবি-কথা দেখে, মুগ্ধ গ্রীকরা সেগুলিকে দেবতার লেখা বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন ওগুলো পবিত্র লেখা। হিয়েরোস মানে পবিত্র, আর গ্লিফে মানে খোদাই করা। নানা জন্তু জানোয়ার পাখি এবং মানুষের ছবি খোদাই করা হত পাথরে। সেসব ছবির ভাষা বুঝত তখনকার লোক। কিন্তু এখন ওসব ছবি দেখে পণ্ডিতরা কিছু বুঝলেও সাধারণ মানুষ একেবারেই বোঝেন না, তাই অনেক সময় অবোধ্য হাতের লেখা দেখে কেউ বলে ওঠে, একেবারে যেন হিয়েরোগ্লিফিক্স!

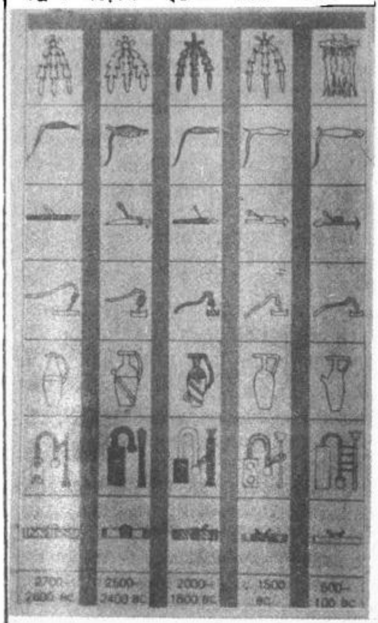

গত সংখ্যায় কনৌজের উত্থান অর্থাৎ হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবারের পাঠ শুরু, বাঙলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্ককে দিয়ে।

শশাঙ্ক

রাজ্যবর্ধনহন্তা হর্ষবর্ধনের ঘোরতর শত্রু যোদ্ধা শশাঙ্কের পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি। উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যখন থানেশ্বর কান্যকুব্জ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, শশাঙ্ক পাল্টা জোট গঠন করেন মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। রাজায় রাজায় মেলবন্ধনে যুক্ত হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা সব যুগের ইতিহাসেই দেখা যায়। দূরদৃষ্টি ও কূটনীতি প্রয়োগে শশাঙ্ক তাঁর প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না।

তৎপর যোদ্ধা এবং কূটনীতিবিশারদ শশাঙ্কের অন্য পরিচয় কি? শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ) প্রথমে এক রাজার অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন যা গৌড়রাজ্য নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ (বহরমপুর শহরের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান রাঙ্গামাটি) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালী নৃপতি যিনি নিজ বাহুবলে বঙ্গদেশের বাইরেও রাজ্য জয় করেছিলেন।

থানেশ্বর-গৌড় সংঘর্ষ

সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড়দেশ ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এর মূলে ছিল শশাঙ্কের সাহস, রাজনৈতিক বুদ্ধি ও রণদক্ষতা। উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তিনি থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে যুদ্ধে নিহত করলে শশাঙ্ক সম্ভবত মল্লযুদ্ধে তাঁকে নিহত করেন। এ বিষয়ে সঠিক বিবরণ জানা যায় না। থানেশ্বররাজের সভাকবির কথায়—'গৌড়রাজ রাজ্যবর্ধনকে ছলনায় ভুলিয়ে একাকী এবং নিরস্ত্র অবস্থায় নিজ শিবিরে নিয়ে হত্যা করেন।' আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন।

রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসন লাভ করে শশাঙ্ককে শাস্তি দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর জীবিতকালে হর্ষবর্ধন গৌড়ের কোনও ক্ষতি করতে পারেননি। ৬১৯ সন পর্যন্ত শশাঙ্ক প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন এবং দক্ষিণে ওড়িশার গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন।

শশাঙ্কের ধর্মমত

শশাঙ্ক শৈব ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি নিজে শিবের উপাসক হলেও রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ প্রজাদের ধর্ম আচরণে বাধা দেননি। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ গৌড় ভ্রমণে এসে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে রক্তমৃত্তি নামে

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম দেখতে পেয়েছিলেন। বৌদ্ধদের এই রকম আশ্রম আরও ছিল এবং দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও বেশ ছিল। এ থেকে শশাঙ্কের ধর্ম সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় মেলে। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ লিখেছেন, শশাঙ্ক বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন ; তিনি নাকি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে নির্মূল করে দিয়েছিলেন আর সেই পাপেই নাকি কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না।

শশাঙ্ক সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি। আলোচনা থেকেই উত্তর বের করতে পারবে।

প্রশ্ন

ক. বাঙলায় প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিলেন ? তাঁর রাজ্য কি নামে পরিচিত ?

খ. সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টায় শশাঙ্কের কী ভূমিকা ছিল ?

গ. শশাঙ্কের ধর্মমত কি ছিল ? তাঁর ধর্মীয় উদারতার প্রতি কটাক্ষ যে যথার্থ নয়,তার প্রমাণ দিতে পার ?

ঘ. হর্ষের সভাকবি বাণভট্টের মত একজন অনুরাগী সাহিত্যিক এবং হিউয়েন-সাঙের মত স্বধর্মাচারী একজন পরিব্রাজক বন্ধু শশাঙ্কের থাকলে তাঁর সম্বন্ধে আমরা অন্যরকম 'ইতিহাস' পেতাম—এ কথা কতদূর সত্য ?

হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ভেতর দিয়ে আমরা সাম্রাজ্যিক ঐক্যের পরিণতি দেখতে পাব, যার সূত্রপাত মগধের উত্থানে এবং পূর্ণ বিকাশ অশোকের কালে ; দ্বিতীয় পর্যায় গুপ্তযুগে, তৃতীয় পর্যায় হর্ষবর্ধনের যুগে এবং শেষ পর্যায় পাল প্রতিহার প্রতিযোগিতায়।

হর্ষবর্ধনের পর তাঁর সাম্রাজ্য অটুট রাখতে পারে এমন কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। স্বাভাবিক নিয়মে দুর্বল রাজার রাজত্বে যা হয়ে থাকে, রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শক্তিমান শাসক না থাকলে দেশে মাৎস্য-ন্যায় দেখা দেয়।

মাৎস্য-ন্যায় কী ? জলে বড় মাছ ছোট মাছ ধরে খায়, বিচারহীন সমাজেও তেমনি শান্তিপ্রিয় দুর্বল মানুষ সবলের অত্যাচার ভোগ করে। এই 'জোর যার, মুলুক তার' অবস্থাকে রাজনীতি-শাস্ত্রে মাৎস্য-ন্যায় বলে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এবং হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে বাঙলায় প্রায় একশ বছরেরও বেশি কাল ধরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। জনগণের দুর্দশার সীমা ছিল না। এই চরম অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় স্থানীয় ক্ষুদ্র শাসকেরা ও জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এক অসাধারণ কাজ করে ফেলল। একজন শক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ শাসকের একান্ত প্রয়োজন এ বিষয় উপলব্ধি করে তারা **গোপাল** নামে এক স্থানীয় নেতাকে বাঙলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করল। অন্যান্য ক্ষুদ্র আঞ্চলিক নেতারা গোপালের নেতৃত্ব মেনে নিল। বাঙলার সিংহাসনে এভাবে গোপালের মনোনয়ন বাঙলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা গোপালের পুত্র ধর্মপাল খালিমপুর তাম্রলিপিতে দুই লাইনের একটি কবিতায় স্থায়ী করে রেখেছেন।

প্রজাগণ-কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা **পালবংশ** নামে খ্যাত। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই বংশ চারশ বছর বাঙলা, বিহার ও

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মৌর্য ও গুপ্তসম্রাটদের মত পালসম্রাটগণ বঙ্গদেশকে আর্যাবর্তের এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন।

পাল-প্রতিহার প্রতিযোগিতা

খানিক আগেই পালবংশের কথা বলেছি যার প্রথম রাজা গোপাল প্রজা-সাধারণদ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালবংশের পরাক্রমশালী নরপতি যিনি বাঙলার গৌরব নানাভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন। শক্তি-সঞ্চয় করে তিনি স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু, তোমরা হয়ত এই প্রথম শুনছ প্রতিহারদের নাম। কে এই প্রতিহাররাজ, কোন অঞ্চলে তাঁর রাজ্য? এ প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠবেই।

প্রতিহার বংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষদিকে ভারতে হূণ আক্রমণ ঘটেছিল, তোমরা সে কাহিনী জেনেছ। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে মধ্য এশিয়ার বিদেশী কিছু কিছু গোষ্ঠী ভারতে বসবাস করতে থাকে। গুর্জর প্রতিহারগণ মধ্যভারতে ও রাজপুতনায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে উত্তর ও পূর্ব ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করছিলেন। প্রতিহার-নৃপতি বৎসরাজ ও তাঁর পর দ্বিতীয় নাগভট্ট শক্তিশালী উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। পূর্বভারতের পাল রাজবংশ এবং পশ্চিমভারতের প্রতিহার রাজবংশ উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল। এই দুই উদীয়মান রাজশক্তির সংঘর্ষ ৮ম ও ৯ম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংঘর্ষের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম সংঘর্ষ

পাল ও প্রতিহার উভয় রাজাদেরই কনৌজের ওপর প্রাধান্য স্থাপনের লক্ষ্য ছিল। কারণ কনৌজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধ রাজ্য এবং এর ওপর কর্তৃত্ব থাকলে তবেই উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কনৌজ অধিকার করা নিয়ে ধর্মপাল ও বৎসরাজের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ বাধে উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন কিন্তু বৎসরাজ জয়ী হয়েও ফলভোগ করতে পারলেন না; দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব অকস্মাৎ আক্রমণে বৎসরাজকে পরাজিত ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি গঙ্গা-যমুনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ধর্মপালকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেন কিন্তু বিজিত রাজ্য নিজ অধিকারে রাখার চেষ্টা না করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব স্বরাজ্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল আবার কনৌজ অধিকার করে অনুগত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত ধর্মপালের প্রাধান্য মেনে নিল। খালিমপুর তাম্রলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে—ধর্মপাল যখন আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন দান করেন তখন ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি দেশের রাজগণ অবনতমস্তকে এই কাজে সমর্থন জানালেন। উত্তর ভারতে ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় সংঘর্ষ

যে প্রতিহাররাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন তাঁর পুত্র ২য় নাগভট্ট রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে বৎসরাজের মতই ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে নাগভট্ট মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) ধর্মপালকে পরাজিত করেন। এবারেও রাষ্ট্রকূটরাজ বিজয়ী প্রতিহার-নৃপতির উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের স্বপ্ন ভেঙে দিলেন। বিপন্ন ধর্মপালের আহ্বানে ৩য় গোবিন্দ সসৈন্যে এসে নাগভট্টকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং ধর্মপালের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। এরপর উত্তর ভারতে ধর্মপালের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমান কোন নৃপতি রইল না। পাল-প্রতিহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী শ্রোতাকে খুব একটা আনন্দ দেয় না; এর মধ্যে বিজয়ের নিখাদ গৌরব বা শৌর্যের অম্লান উজ্জ্বল দীপ্তি নেই। পুতুলনাচের খেলার মত কতকটা। কে হারছে, কে জিতছে, তা যেন কেউই জানে না। অদৃশ্য কোন শক্তির ইঙ্গিতে হঠাৎ এক পক্ষের উদয় এবং ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন।

ধর্মপাল সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত তথ্য এখানে উল্লেখ করি। তিনি, পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর বিজয়-শিবির। বঙ্গ ও বিহার তাঁর শাসনাধীনে ছিল; বিহার ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অঞ্চল ধর্মপালের আশ্রিত রাজ্য কনৌজের অন্তর্গত ছিল। এ ছাড়া পাঞ্জাব, পূর্ব রাজপুতনা, মালব প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকগণ নিজ নিজ রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করলেও ধর্মপালের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ধর্মপালের মহত্তর কৃতিত্ব

ধর্মপাল ছিলেন ধর্ম ও বিদ্যার প্রতি অনুরাগী। তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বিহারে গঙ্গার তীরে পাহাড়ের চূড়ায় বিক্রমশীলা-বিহার নির্মাণ করেন; প্রধান মন্দির ঘিরে ১০৭টি মন্দির বিরাজিত ছিল। বিক্রমশীলা-বিহারে

পালযুগে প্রাপ্ত ভাস্কর্য

১১৪ জন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা-দান করতেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়-পুরে ধর্মপালের যে বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তা সেকালে সোমপুর-বিহার নামে বিখ্যাত ছিল। এখনও পার্শ্ববর্তী গ্রামটির নাম ওমপুর।

ধর্মপাল নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্য সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে তিনি ৫০টি ধর্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; ধর্মমত-নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন।

ধর্মপাল একাধারে যোদ্ধা, ধর্মপরায়ণ ও শিল্পানুরাগী। প্রায় ৩২ বৎসরকাল রাজত্ব করেন তিনি। তাঁর প্রতিভায় বাঙালী জাতির ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তৃতীয় সংঘর্ষ

প্রথম ও দ্বিতীয় সংঘর্ষের ফল প্রতিহাররাজের অনুকূলে যায়নি। যদিও উত্তর ভারতের দুই প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম দিকের সাফল্য ছিল প্রতিহারদের দিকে। প্রতিহারবংশের রাজারা তাই এই পরাজয় সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

প্রতিহাররাজ ১ম ভোজ (আঃ ৮৩৬-৮৮৫ খ্রি:) কনৌজের কিছু অঞ্চল জয় করেন কিন্তু ধর্মপালের পুত্র দেবপালের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে পারেননি।

দেবপাল

ধর্মপালের মৃত্যুর পর (সম্ভবত ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে) পুত্র দেবপাল সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পিতার মতই উচ্চাভিলাষী এবং দিগ্বিজয়ী হতে ইচ্ছুক ছিলেন। গুর্জর প্রতিহার ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সভাকবি বলেছেন, ওড়িশা ও আসাম ছাড়াও দেবপাল হূণদেরও পরাভূত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়—হিমালয় থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত দেবপালের অধীন হয়েছিল। কবির অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে বলা যায়, উত্তরে কম্বোজ অঞ্চল থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত অবধি দেবপালের প্রতিপত্তি-সীমা বিস্তৃত ছিল।

দেবপালের মৃত্যুর পর পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (আনুঃ ৮৮৫-৯১০ খ্রিঃ) পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। দেবপালের পরবর্তী রাজাদের পরাজিত করে তিনি মগধের অধিকাংশ অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। প্রথম দুই সংঘর্ষে পরাজিত প্রতিহারশক্তি তৃতীয় সংঘর্ষের ফলে জয়ী হয়ে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের পর থেকে উত্তর ভারতে রাজরাজড়াদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কলহ ও রাজনৈতিক দাপাদাপি দেখে আমরা কী বুঝলাম? বুঝলাম—হর্ষবর্ধন, সমুদ্রগুপ্ত কিংবা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মত কোন রাজার উদ্ভব হয়নি এ যুগে; নিজেরা হানাহানি করেছে কিন্তু সাম্রাজ্যিক ঐক্যবন্ধনে বিস্তৃত অঞ্চলকে বাঁধতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে এ চিত্র সে যুগের রাজনৈতিক দুর্বলতারই প্রতীক। আর দুর্বল রাষ্ট্র যে বিদেশী শক্তির কাছে লোভনীয় শিকার তার পরিচয় আমরা পরে পাব। অনৈক্য একটা দেশ ও জাতির পক্ষে কি রকম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ইতিহাস সে শিক্ষাও দিয়ে থাকে।

আলোচিত বিষয় সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন। এর কতক বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নাবলী (Test Paper) থেকে নেওয়া।

১. পুষ্যভূতি বংশীয় হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজের উত্থান বর্ণনা কর। ৯

২. হর্ষচরিতের রচয়িতা কে? ১

৩. বাঙলার পালবংশের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? ১

৪. হর্ষবর্ধন কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? গৌড়ের শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। ১+৯

৫. হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে অবস্থান করেন?

৬. মাৎস্য-ন্যায় কাকে বলে? ১

৭. শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

৮. পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে গৌড়ের অবস্থা কিরূপ ছিল? ৩

৯. বিক্রমশিলা মহাবিহার কার রাজত্বকালে স্থাপিত হয় ? ১	১১. শশাঙ্ক কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? ১
১০. বাঙলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিলেন ? ১	১২. মাৎস্য-ন্যায় কাকে বলে ? কিভাবে এর অবসান ঘটে ? ১+২

ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

খ্রি. পূ. ৪র্থ শতক থেকে ১৪শ শতক পর্যন্ত

এর আগে আমরা প্রধানত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা আলোচনা করেছি। কথাপ্রসঙ্গে ধর্ম ও সমাজের কথাও অবশ্য এসেছে। মৌর্যযুগের আগে দেশে আর্যদের সমাজব্যবস্থা কিভাবে বিস্তারলাভ করে জনজীবন সুস্থির করে তুলেছিল, তার কথাও বলা হয়েছে। এখনকার আলোচনায় মৌর্যযুগ থেকে হিন্দুযুগের শেষ অবধি সমাজ-সংস্কৃতির কথা বলব। বিষয়টি যেমন ব্যাপক তেমনি আকর্ষণীয়। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এর মূল্য অসাধারণ, কারণ দেশের আসল ইতিহাস যুদ্ধের ইতিবৃত্ত নয়, মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রা, তার মননশীলতা ও সৃজনমূলক কাজের পরিচয়। সমাজ ও সংস্কৃতির যুগধৃত পরিচয় লাভের জন্য আমরা মৌর্য থেকে বিভিন্ন আমল অনুসরণ করে এগিয়ে আসব যাতে ইতিহাসের গতিপথ ধরে সমাজ ও সভ্যতার রূপান্তর লক্ষ্য করতে পারি। উত্তর ভারত ইতিহাসের প্রধান রঙ্গমঞ্চ হলেও সভ্যতা সংস্কৃতির বিশেষ অবদানের জন্য দক্ষিণ ভারতের কথা অনুরাগের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে।

মৌর্যযুগের কথা

আমরা দেখেছি খ্রি. পূ ৪র্থ শতকের প্রথমার্ধে (আনুমানিক ৩২৪ খ্রি. পূর্বাব্দে) মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। গৌতম বুদ্ধের সমকালে দেশে যে পৃথক পৃথক রাজ্যগুলো ছিল মৌর্য আমলে সেগুলো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যে লীন হয়ে ভারতীয় ঐক্যের ক্ষেত্র রচনা করল। অল্প সময়ের মধ্যে যে বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেল, সমাজ-জীবনে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ? সেখানেও কি সামাজিক রীতিনীতির ওলটপালট ঘটে আর্যদের প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে ? এরূপ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক এই কারণে যে, মৌর্য ও কুষাণ আমলে আফগানিস্তান সহ অনেক বহির্ভারতীয় অঞ্চলও ভারত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। সেসব অঞ্চলের লোকেদের রীতি-নীতি, ধর্ম ও সমাজচিন্তাধারাও ভারতের প্রধান জীবনধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এর ফলাফল কী ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ বৃহৎ নদীপ্রবাহের সঙ্গে মিশলে যে ফল হয়, এখানেও তেমনি দেখা যায়। আর্যদের সমাজগঠন এমনি দৃঢ়মূল ছিল যে, অপরকে সে অনায়াসে আত্মস্থ করে নেয়।

উপাদান

মৌর্য ও কুষাণ যুগের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় দেবার আগে আলোচ্য বিষয়ের তথ্য-উৎস কি তা জানা দরকার। প্রাগৈতিহাসিক যুগ পার হয়ে এলে ইতিহাসের উপাদান বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ যুগে তথ্যের আকর হবে মেগাস্থিনিস ও

অন্যান্য গ্রীক লেখকদের রচনা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, সংস্কৃত ও বৌদ্ধসাহিত্য, সর্বোপরি অশোকের শিলালিপি, ভাস্কর্য ও মুদ্রা। এ সকল উপাদান থেকে সমাজ-সংস্কৃতির একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

বর্ণাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত

'বিদ্রোহী' জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কথা আমরা জেনেছি। আর্যদের ধর্ম ও কিছু সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে মহাবীর এবং বুদ্ধ অভিমত প্রচার করেছিলেন। তাঁরা সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য এবং জাতি-ভেদ প্রথা বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে সমাজের সকলেই মর্যাদার যোগ্য। কাউকে জাতির জন্য অবহেলা বা অবজ্ঞা করা মনুষ্যত্বের অবমাননা—একথা প্রচার করে এই দুই মহামানব সমাজের সামনে উন্নত এক আদর্শ স্থাপন করে-ছিলেন। এঁদের জীবিতকালে উচ্চ নীচ সকল বর্ণের লোকই সমানভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু বর্ণাশ্রম-কাঠামো ভেঙে পড়েনি। মৌর্যযুগে গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে দেখা যায় বর্ণাশ্রম শুধু অটুট নয়, বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন—স্বশ্রেণীর বাইরে কাউকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেওয়া হত না, নিজ নিজ শ্রেণীর পেশা বা শিল্পকর্ম ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধকার্যই পেশা, তার চাষ-আবাদ বা কোন শিল্পকাজের বৃত্তিগ্রহণ নিষিদ্ধ। কেবল ব্যতিক্রম ছিল 'দার্শনিকের' পক্ষে। আত্ম-জ্ঞান লাভ বা উচ্চ চিন্তায় যারা জীবন অতিবাহিত করতেন গ্রীক লেখকদের কাছে তাঁরা দার্শনিক (philosopher বা বা sophist) আখ্যা পেয়েছেন। বলা হয়েছে, সোফিস্টের নির্দিষ্ট কোন জাতি-শ্রেণী নেই; উচ্চ নীচ যে কোন শ্রেণী থেকে এরূপ লোক আসুন না কেন, তিনি অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তাশীলতার জন্য সকলের কাছেই সমাদৃত। সোফিস্টরা সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁদের অনেকে ছিলেন বনবাসী, স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলভোজী; বৃক্ষের বল্কল ছিল তাঁদের পরিধান। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, গ্রীকদের উল্লিখিত এই দার্শনিকদের জীবনযাত্রা আর্যদের বানপ্রস্থ আশ্রমের নামান্তর। অশোকের শিলালিপিতেও 'ভ্রমণশীল তাপসদের' উল্লেখ আছে।

তোমাদের কাছে একটি প্রশ্ন। রামায়ণ মহাভারতের যুগে আর্যদের বর্ণাশ্রম-বন্ধন এতখানি কঠোর ছিল না। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মত্ব-লাভ করেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পেশা গ্রহণ করেছে। কিন্তু মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে সামাজিক নিয়ম এত কঠোর হল কেন? উত্তরে বলব, জীবন্ত সমাজ জীবধর্মবশেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিল। দেশের ভেতর থেকে বিদ্রোহী ধর্ম সমাজের ব্যবস্থায় আঘাত হানতে শুরু করেছিল; বাইরে থেকে অহিন্দু জনগোষ্ঠী দেশে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। ভেতরের ও বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আর্যরা বর্ণাশ্রমকে আঁকড়ে ধরল, উদারতা দেখিয়ে শিথিল হতে দিল না। তবু যেসব যোদ্ধাগোষ্ঠী ভারতের নতুন বাসিন্দা হল তাদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করতে হল কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ক্ষত্রিয় নয়! যবন, শক, পহ্লব বা পার্থিয়ানদের মনুর মানবধর্ম-শাস্ত্রে 'অধম ক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও অধম ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে উত্তম ক্ষত্রিয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং মহাভারতের দ্রোণাচার্যের মত ব্রাহ্মণও যুদ্ধবিদ্যায় পার-দর্শী হয়ে সেনাপতিপদ লাভ করেছে।

বিদ্যা ও ধর্মের সমাদর

যুগে যুগে হিন্দুসমাজে বিদ্বান এবং ধর্মাচার্য জাতি-শ্রেণী-নির্বিশেষে সাধারণের

শ্রদ্ধা লাভ করেছে। এ যুগে চিকিৎসক তাঁর বিশেষ বিদ্যার জন্য সমাজে সমাদৃত হয়েছেন, বনবাসী ধর্মাচার্যের পরই তাঁর স্থান। বিদ্বান ও পবিত্রজীবনাচার্য আমাদের সমাজে চিরদিনই নমস্য।

মেগাস্থিনিসের চোখে

গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে সাদরে অবস্থান করেছিলেন। ভারতীয় সমাজের ব্যবহারিক সচলতা দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ভারতের সমাজ-জীবনে ৭টি জাতি বা শ্রেণী বিদ্যমান। এগুলো হল—১. দার্শনিক, ২. চাষী, ৩. পশুপালক ও শিকারী, ৪. ব্যবসায়ী ওকারুশিল্পকর্ম ৫ সৈনিক, ৬. পরিদর্শক এবং ৭. অমাত্য।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, মেগাস্থিনিস চতুর্বর্ণের পুঁথিগত বিন্যাস আলোচনা করেননি, বাস্তবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে জীবিকা অর্জনের জন্য যে যে কাজে ব্যাপৃত দেখেছিলেন, তাই শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। পেশাকেই তিনি জাতিগত কর্ম বলে ধরে নিয়েছেন। কৌটিলীয় **অর্থশাস্ত্রে** বলা হয়েছে, চাষ-আবাদ, গো-পালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের লোকদের সাধারণ বৃত্তি। দেখা যায়, জাতিবর্ণ হিসাবে শূদ্র সর্বনিম্ন পর্যায়ের হলেও পেশাগত কাজে তারা বৈশ্যবর্গের লোকদের সমতুল্য।

সমাজে নারীর স্থান

আর্যদের সমাজব্যবস্থা আলোচনায় (নবম দশম, ৪র্থ সংখ্যা) সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। মৌর্য ও মৌর্যপরবর্তী যুগে নারী যে সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক গুণের জন্য সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল তার পরিচয় মেলে গ্রীক লেখকদের রচনা ও সমসাময়িক শিলালিপি থেকে। জানা যায়, অনেক রমণী দর্শনচর্চা ও সংযমের জীবনযাপন করে সম্মানিতা হয়েছিলেন। আবার অন্য দিকে দেখা যায়, রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বহুপত্নিক হতেন ; জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায়, বিধবার বিবাহ এবং নারীর একাধিক পতিগ্রহণও অপ্রচলিত ছিল না। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সনির্বন্ধ অনুরোধে নারীদের জন্য পৃথক সংঘ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর ফলে নারী-পুরুষের সমতার পথে বাধা অনেকখানি দূর হয়েছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, আম্রপালী প্রভৃতি বিদুষী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বা 'থেরী'দের জীবনকথা সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করা আছে। অশোকের শিলালিপিতে দেখা যায়, দ্বিতীয়া মহিষী কারুবাকি সম্রাটের সঙ্গে প্রজাকল্যাণকার্যে অংশগ্রহণ করছেন।

আবার, বিধবা রাজমহিষী গৌতমী বলশ্রী সত্যাপ্রয়তা, দানকর্ম, সহনশীলতা ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য সর্বজনপূজ্য হয়ে 'রাজর্ষিবধূ' রূপে কিরূপ সমাদৃতা হয়েছিলেন নাসিক লিপিতে তার উল্লেখ আছে। ভারতের নারী যে কেবল অন্তঃপুরবাসিনী ছিল না, তার পরিচয় মেলে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দেহরক্ষীরূপে নিযুক্তির ব্যাপার থেকে। দেহরক্ষী নারীগণ সশস্ত্র হয়ে সম্রাটের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে। এমন গল্পও আছে যে, এক নারীদেহরক্ষী রাজার মত্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁকে হত্যা করায় পরবর্তী রাজার মহিষী হওয়ার পুরস্কার লাভ করেছিল।

সমাজে দাসত্বপ্রথা

যদিও মেগাস্থিনিস বলেছেন, সকল ভারতীয় স্বাধীন নাগরিক, তাদের মধ্যে দাস কেউ নেই। ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথা শুধু প্রচলিত নয়, নীতিশাস্ত্রেও স্বীকৃত ছিল। অশোকের অনুশাসনে দাস ও ভৃত্যের উল্লেখ আছে। তিনি এদের সকলের

প্রতিই সহৃদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমোদ, উৎসব

খেলাধূলা ও আনন্দোৎসব সমাজের জীবনীশক্তির পরিচায়ক। মানুষ কিরূপ কাজের ভেতর দিয়ে অবসর যাপন করে, কিভাবে তাদের সমবেত শক্তির প্রকাশ ঘটে তা দেখে সমাজের মানসিক উৎকর্ষ ও জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যায়। গ্রীকরা সুঠাম দেহগঠন ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিত জাতীয় খেলার ভেতর দিয়ে; অলিম্পিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার অনেক বিষয় তাদের কাছ থেকেই পাওয়া। খেলাধূলার প্রতি গ্রীকদের এমনই অনুরাগ ছিল যে, অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানকালে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহবিবাদ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে শত্রুমিত্র খোলা উদার মন নিয়ে খেলায় যোগ দিত। রোমানদের জাতীয় খেলার মধ্যে পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই একটা আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। হত্যা ও রক্তপাত দেখার জন্য দর্শকগণ প্রাসাদতুল্য রঙ্গমঞ্চঘেরা 'কলোসিয়ামে' সমবেত হত। যুদ্ধবন্দী ও ক্রীতদাসদের ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে নিরস্ত্র অবস্থায় লড়াই করতে পাঠাত; পশুর আক্রমণে মানুষের জীবননাশ দেখে দর্শকরা উল্লাসে হর্ষধ্বনি করত! সম্রাটগণ এরূপ আমোদের আয়োজন করে জনসাধারণের বাহবা কুড়োতেন।

মৌর্যযুগের শিলা-অনুশাসনে 'উৎসব' ও 'সমাজের' উল্লেখ আছে। বহুলোক আনন্দ-অনুষ্ঠানে সমবেত হত। নাচগান যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ হত **'উৎসবে'** দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত **'সমাজ'**। এইসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মল্লযোদ্ধারা কুস্তি লড়ত, মানুষে-মানুষে লড়াই-খেলা, হাতির সঙ্গে হাতির বা অন্য প্রাণীর এই রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শকদের আনন্দ দিত। রাজধানী পাটলিপুত্রে বৃষ ও ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় প্রতিযোগিতা হত। মানুষ ও প্রাণীদের লড়াইতে অনেক সময় রক্তপাত হত। এজন্য অশোক এরূপ 'সমাজ' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অশোক কি ধারণা পোষণ করতেন তাঁর অনুশাসন (Rock Edict IX) থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি:

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলছেন: লোকেরা নানা উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে। এইসব অনুষ্ঠানের উপলক্ষ হল পরিবারের কারও অসুখবিসুখ, পুত্রকন্যার বিবাহ, শিশুর জন্ম এবং দূরদেশে যাত্রা। বিশেষ করে মেয়েরা নানা ধরনের, তুচ্ছ এবং অর্থবিহীন উৎসব উদযাপন করে।

উৎসবের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ঠিকই কিন্তু এর ফল নগণ্য। পক্ষান্তরে ধর্মের উৎসব (ধর্মমঙ্গল) অতীব ফলপ্রদ। এই উৎসব হল দাস এবং ভৃত্যদের প্রতি যোগ্য ব্যবহার, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবিত প্রাণীর হিংসা থেকে বিরত থাকা এবং পুরোহিত ও সাধুসন্তদের প্রতি বদান্যতা। এইগুলো এবং অনুরূপ অন্যান্য কর্মকে বলা যায় ধর্ম-উৎসব।

রোমানসম্রাটদের সমর্থনপুষ্ট রক্তাক্ত উৎসব এবং সম্রাট অশোকের প্রেরণাপুষ্ট নির্মল উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। এর মধ্যে দিয়ে দুইটি জাতির মানসিক চরিত্রের রূপটি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। একটিতে জীবনের হাল্কা পশু-প্রবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যটিতে আত্মিকবোধ অধিকতর মূল্যবান বলে গণ্য।

নাটক অভিনয় দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। পতঞ্জলি 'শৌভিক' বা 'শোভনিক'দের কথা উল্লেখ করেছেন, এরা নাটকে বর্ণিত কাহিনী প্রত্যক্ষ রূপায়ণ

demonstration) করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করত।

অবসর যাপনে আনন্দদায়ক খেলা হিসেবে পাশার খুব প্রচলন ছিল এবং বাজি ধরে খেলার দরুন এর কুফল সম্বন্ধেও লোকে সচেতন ছিল। অন্য একটি খেলা 'অষ্টপদ', যা থেকে দাবাখেলার সূত্রপাত, বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উৎসবের সময় ছাড়াও নটেরা ভোজবাজি প্রদর্শন করত। ধারাল তরবারি গিলে ফেলে দর্শকদের বিস্ময় জাগান, মুহূর্তের মধ্যে এক বিশাল আমগাছ জন্মিয়ে তাতে সুতোর গুঞ্জি ছুঁড়ে দিয়ে সেই সুতো ধরে ওপরে উঠে যাওয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক খেলা দেখিয়ে কতক নট জীবিকা অর্জন করত। এছাড়া সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে খেলা দেখাত।

সমাজে সহজ সরল আমোদ ও উৎসব লোকেদের জীবনে আনন্দ ও বৈচিত্র্য নিয়ে আসত।

সমাজে চাষীর অবস্থা

চাষ-আবাদ মানবসভ্যতার আদি ভিত্তি। অরণ্যচারী, ফলমূলাহারী, পশু-শিকারী, যাযাবর মানুষ কৃষিকাজ শিখে স্থায়ী বসত গড়ে তুলেছিল। তখন সে খাদ্য সংগ্রহ করত না, উৎপাদন করত। খাদ্যের যোগানদার হিসেবে চাষীর মর্যাদা ছিল। আর্যদের সমাজে দেখি, রাজারা হলকর্ষণের উদ্বোধন করে চাষীর সঙ্গে সাম্মানিক যোগসূত্রের পরিচয় দিতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চাষীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তিনটি প্রধান শ্রেণী

বুদ্ধিবৃত্তিজীবী ও প্রশাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—১. চাষী, ২. পশুপালক ও প্রাণীশিকারী এবং ৩. ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পী। সমাজে চাষীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। মৌর্যযুগে চাষী সমাজের হিতকারী বিবেচিত হত, গ্রীক লেখকদের রচনায় তার পরিচয় মেলে। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও চাষী যাতে নির্বিঘ্নে কৃষিকর্ম করতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল, যুদ্ধের কাজে চাষীকে নিয়োগ বা সৈন্য চলাচলের দরুন ফসলের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত। শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে চাষী বিনা উপদ্রবে আবাদ করত, ফসলের এক অংশ কর হিসাবে রাজকোষে জমা দিত, অতিরিক্ত কর হিসাবে দিত বলি। অশোকের লুম্বিনি শিলালিপিতে বলা হয়েছে, বুদ্ধের জন্মস্থান হিসেবে লুম্বিনি 'উৎবলিক' (বলিমুক্ত) এবং রাজস্ব কমিয়ে 'অষ্টভাগ' করা হয়।

চাষীর সহায়তা

প্রকৃতি-নির্ভর চাষীর চিরন্তন সংকট বন্যা, খরা, দাবানল এবং পঙ্গপালের আক্রমণ। প্রাচীন ভারতে চাষীদের এই সব বিপদ সম্বন্ধে রাজশক্তি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন এবং যথোচিত প্রতিকার উদ্ভাবিত হয়েছিল। আবহাওয়াবিদগণ চাষীদের পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিতেন, শস্যের রোগ প্রতিকারের উপায় জানিয়ে দেওয়া হত, শস্য হানি হলে চাষী এবং জনসাধারণের জন্য আপৎকালীন শস্যভাণ্ডার স্থাপিত হত; বীজশস্য সরবরাহ করে চাষীদের অভাব পূরণ করা হত। কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকেদের প্রতি দেশের শাসকের সুনজরের কথা গ্রীক লেখকগণ প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

বন্য পশুপক্ষীর অত্যাচার থেকে শস্য রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল ব্যাধ ও শিকারী-দের ওপর। কৃষিকাজের লাঙ্গল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তৈরি করত কামার, ছুতার প্রভৃতি কারুশিল্পীরা। চাষীর সহায়ক হিসেবে এরা যে শুধু কর দেওয়া থেকে রেহাই পেত

তাই নয়, সরকার থেকে ভাতা-সাহায্যও লাভ করত।

বিশেষ আলোচনা

আধুনিক কালের মতই প্রাচীনকালেও গ্রামই ছিল ভারতের জীবনকেন্দ্র। এই জীবন সচল রাখার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হত। যুদ্ধবিগ্রহে অসামরিক লোকেদের যাতে কাজে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য থাকত শাসকের। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করা বা নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার অমানবিক বলে বিবেচিত হত। তাই দেখা যায় বিবদমান রাজশক্তির লড়াই হয়েছে লোকালয় থেকে দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। বর্তমানকালে কিন্তু যুদ্ধের স্বভাব সম্পূর্ণ পালটে গেছে ; এখন যুদ্ধ করে শুধু সৈনিকরা নয়, সমগ্র দেশ। যুদ্ধ এখন সর্বাত্মক (Total War)। এখনকার নীতি হচ্ছে—শত্রুর পেটে আঘাত কর, তার শিল্পকারখানা ধ্বংস কর, অসামরিক লোকেদের ভীতসন্ত্রস্ত কর যাতে সমগ্র দেশ ভেঙে পড়ে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ভিয়েৎনামে আমরা দেখেছি অরণ্য, শস্যক্ষেত্র রাসায়নিক অস্ত্রপ্রয়োগে বিনষ্ট করা হয়েছে, উদ্দেশ্য প্রতিরোধকারীদের 'ভাতে মারা'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাপানের হিরোসিমা শহরে পরমাণু বোমা ফেলা হল, নিহত হল প্রায় এক লক্ষ মানুষ। এখা কিন্তু সৈন্যবাহিনী ছিল না, নরহত্যা শুধু জাপানকে ভীত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য।

এবার তোমাদের কাছে কতকগুলো প্রশ্ন রাখছি। পরীক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে না লাগলেও ইতিহাসের জীবন্ত ধারা অনুসরণ করতে এর জ্ঞান বিশেষ উপযোগী।

প্রশ্ন

১. মৌর্য ও মৌর্য-পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক উপাদান কি কি ?
২. বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এর প্রমাণ কি ?
৩ বিদ্যা ও ধর্মের সমাদর ভারতের বৈশিষ্ট্য—এর কি প্রমাণ দিতে পার ?
৪. মেগাস্থিনিসের কাছে ভারতে কয়-শ্রেণীর লোক রয়েছে বলে মনে হয়েছিল ?
৫. সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল ?
৬. সমাজে আমোদ উৎসবের উপকরণ হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর।
৭. সম্রাট অশোক কোন উৎসবকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন ? এর ভেতর দিয়ে অশোকের চরিত্রের কোনদিক উদ্ভাসিত হয়েছে ?
৮. সমাজে চাষীর অবস্থা কেমন ছিল ?

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

সঙ্গীতের মর্যাদা

সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে এক ঘরোয়া সভায় দিলীপকুমার রায়ের গানের জন্য ডাক পড়েছিল। সেখানে চিত্তরঞ্জন, মৌলনা আজাদ, মহম্মদ আলী সব দিকপালরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। দিলীপকুমার যেই গান ধরলেন অমনি মহামহোপাধ্যায়রা সোৎসাহে শুরু করলেন গল্প। সুভাষচন্দ্র অপ্রস্তুত।

এ সংকটকালে জওহরলাল ত্রাণ করলেন। হঠাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বললেন, 'Gentlemen, if you don't want to hear the music, please let those hear who want to' সবাই লজ্জা পেলেন এই তরুণের কাছে।

প্রথম পাঠ থেকে দশম পাঠ পর্যন্ত যা পড়া হয়েছে, সেগুলো একাদশ ও দ্বাদশ পাঠে পুনরালোচনা করেছি। বিভিন্ন পাঠে আলোচনার মাঝে মাঝে অনেক প্রশ্ন ছিল। এ ছাড়া পুনরালোচনার সময়ও নানা ধরনের অনেক প্রশ্ন দিয়েছি—আশা করি ওগুলোর উত্তর করে ফেলেছ।

তোমাদের পাঠ্য তালিকায় এরপর আছে **কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ।** তাহলে এস, আজ আমরা এই ভৌগোলিক অঞ্চলটি নিয়ে আলোচনা করি।

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গুজরাট রাজ্য। আমাদের আজকের আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চল—কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় হল এই গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত দুটি উপদ্বীপ। 'উপদ্বীপে' এসে হোঁচট খেলে ত? ঠিক আছে, উপদ্বীপের অর্থ আগে জেনে নাও—

উপদ্বীপ কাকে বলে ঃ যে জায়গার চারদিকে জল, সেই জায়গাকে বলে দ্বীপ, যেমন ভারতের দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা। আর যার তিনদিকে জল ও একদিকে স্থল সেই জায়গাকে বলে উপদ্বীপ, যেমন, কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়।

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অবস্থান

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়কে উপদ্বীপ বলা হচ্ছে কেন ঃ মানচিত্রে দেখ, কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের তিনদিকে জলভাগ—পশ্চিমে আরব সাগর ও কচ্ছ উপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর ও কাম্বে উপসাগর এবং উত্তরে লোনা জলাভূমি বা রান অঞ্চল। এই তিনদিক বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পূর্বদিকে আছে স্থলভাগ—ভারতের মূল ভূখণ্ড।

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়কে তোমরা আলাদাভাবেও দুটি উপদ্বীপ বলতে পার। কিভাবে দেখ—

১. কচ্ছের পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর আর উত্তর ও পূর্বে কিছুটা স্থলভাগ, বাকিটা জলাভূমি বা রান অঞ্চল।

২. কাথিয়াবাড়েরও তিনদিকে জল—পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে কচ্ছ উপসাগর আর দক্ষিণে আরব সাগর ও কাম্বে উপসাগর। শুধুমাত্র পূর্বদিকে ভারতের মূল ভূ-ভাগের সঙ্গে যুক্ত।

উত্তরে মরু অঞ্চল ঃ তাহলে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অবস্থান বুঝলে। এই অবস্থানের সঙ্গে আর একটি বিষয় মনে রাখবে—কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের ঠিক উত্তরে মরু অঞ্চল। মরু অঞ্চল পাশে আছে বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম। এই অবস্থান যদি মনে রাখতে পার, তাহলে এই উপদ্বীপ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব বৈচিত্র আছে, সেগুলো সহজে বুঝে ফেলবে।

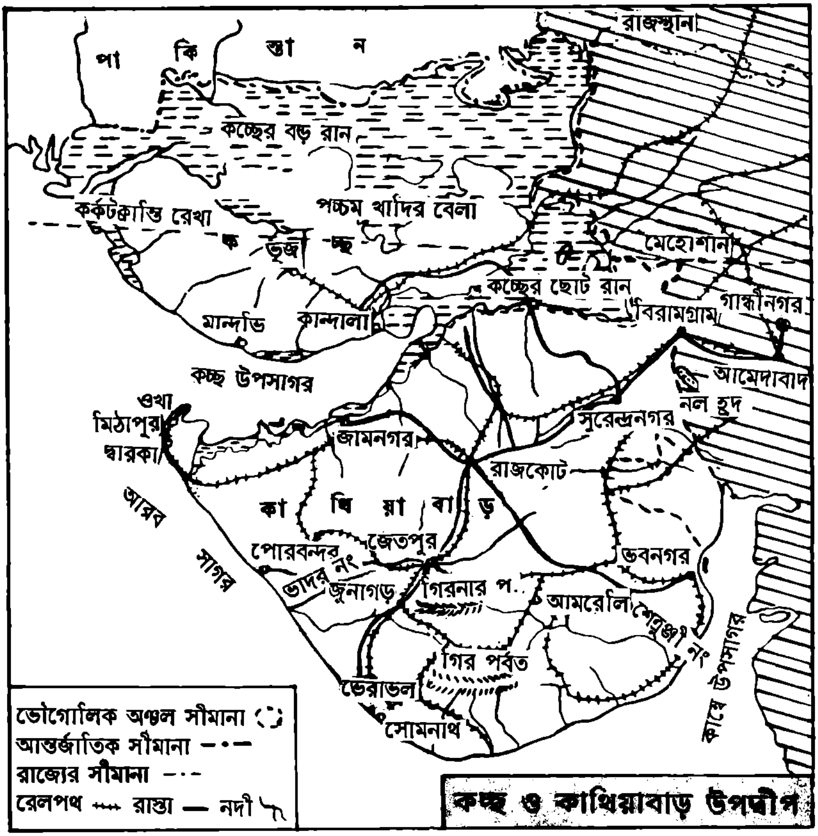

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ

আয়তন ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের মোট আয়তন প্রায় ১,০৯,৯৫০ বর্গ কি.মি.। এর মধ্যে কাথিয়াবাড় ৬৪,৩৩৮ বর্গ কি মি., আর কচ্ছ ৪৫,৬১২ বর্গ কি.মি.। তাহলে কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড় অনেক বড়—১৮ হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি। এটা হল উপদ্বীপের আয়তন। এবার দেখা যাক সমগ্র গুজরাট রাজ্যের মধ্যে এই ভৌগোলিক অঞ্চলটি কতটা জায়গা জুড়ে আছে—

গুজরাট রাজ্যের মোট আয়তন প্রায় ১,৯৫,৯৮৪ বর্গ কি মি.। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের মোট আয়তন বললাম ১,০৯,৯৫০ বর্গ কি মি.। তাহলে গুজরাটের অর্ধেকেরও বেশি অংশ—প্রায় ৫৬ শতাংশ এই ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্গত। এ থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, গুজরাট রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের গুরুত্ব কত বেশি।

জেলা ঃ কাথিয়াবাড় উপদ্বীপটি ৬টি জেলা নিয়ে গঠিত—জামনগর, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, ভবনগর, আমরেলি ও জুনাগড়। তবে কচ্ছে মাত্র একটিই জেলা, নাম—কচ্ছ।

জন্মরহস্য ঃ এখন যাকে আমরা উপদ্বীপ বলছি সেই কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় এক সময় কিন্তু দ্বীপ ছিল অর্থাৎ চারদিকে ছিল শুধু জল। কচ্ছের উত্তর ও পূর্বের

অগভীর জলাভূমি দেখে বা কাম্বে ও কচ্ছ উপসাগর যেভাবে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে তা দেখে তোমরা বোধহয় নিজেরা কিছুটা অনুমান করতে পারছ।

দুটি কারণে ঐ দ্বীপ বর্তমানে উপদ্বীপে পরিণত হয়েছে ঃ

ক. ধীরে ধীরে ভূ-ভাগ উঁচু হয়ে গেছে,

খ. সমুদ্র ও নদীর পলি পড়ে মাঝখানের জলভাগ ক্রমশ ভরাট হয়েছে।

সব জায়গা যে একেবারে ভরাট হয়ে গেছে তা নয়। কাথিয়াবাড় ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কচ্ছের উত্তর ও পূর্বে যে লোনা জলাভূমি আছে তা এখনও পুরো ভরাট হয়নি। তাহলে দেখ, দ্বীপ থেকে কিভাবে উপদ্বীপ হয়ে গেল।

মানচিত্রে কচ্ছের রান অঞ্চল দেখে তোমাদের অবাক লেগেছে ত? প্রথমে নিশ্চয় বুঝতে পারনি—ওখানটা কি রকম। পরে মাথা ঘামিয়ে একটু আধটু যা জেনেছ তা হল—ওটা অগভীর জলা জায়গা—তাই না? কিন্তু রান অঞ্চল সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার আছে। এস, ওগুলো ভাল করে জেনে নাও।

রান অঞ্চল ঃ কচ্ছ উপদ্বীপের উত্তর ও পূর্বে কাদায় ভরা যে লোনা জলাভূমি আছে তার নাম 'রান'। উত্তরের বড় জলাভূমিকে বলে 'বড় রান', আর পূর্বের ছোট জলাভূমিকে 'ছোট রান'। বড় রানে লুনী নদী ও ছোট রানে সরস্বতী নদী এসে পড়েছে।

এই রান অঞ্চল এক সময় কচ্ছ উপসাগরের অংশ ছিল। পরে জায়গাটা সামান্য উঁচু হয়ে যাওয়ায় সমুদ্র সরে গেছে এবং ঐ জায়গাতে পলি ভরাট হয়ে জলাভূমি তৈরি হয়েছে। সমুদ্রের জোয়ারে বা বর্ষাকালে এই রান অঞ্চল এখনও প্লাবিত হয়, কতকগুলো টিলা শুধু জেগে থাকে। বর্ষার পরে লোনা জল বাষ্পীভূত হলে রানে প্রচুর নুন জমে থাকে। ভারতে প্রতি বছর যত নুন উৎপন্ন হয়, তার অনেকাংশ এখান থেকে পাওয়া যায়।

এবার দেখ, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমার জানা হল কিনা ঃ

প্রশ্ন

১. উপদ্বীপ কাকে বলে? কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়কে উপদ্বীপ বলা হয় কেন?

২. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ ভারতের কোন অংশে অবস্থিত? কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের আয়তন কত?

৩. 'কচ্ছের রান' বলতে কি বোঝায়? এই রান কিভাবে তৈরি হয়েছে?

ভূপ্রকৃতি ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের ভূপ্রকৃতি ঠিক এক রকম নয়। তাই দু-জায়গার ভূপ্রকৃতি আলাদা করে বলে দিচ্ছি।

কচ্ছ ঃ কচ্ছের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

১. উত্তরাংশে খুব বড় লোনা জলাভূমি আছে, নাম—বড় রান। বড় রানের পশ্চিম দিকের ভূমি ভূ-আন্দোলনের ফলে একটু উঁচু হয়ে গেছে—দেখতে ঠিক যেন বাঁধের মত, এর নাম হল আল্লাবাঁধ।

২. পূর্বাংশেও লোনা জলাভূমি আছে, তবে ছোট, নাম—ছোট রান।

৩. রানের মধ্যে কতকগুলো উঁচু পাথুরে টিলা আছে, যেমন—পচ্চম, খাদির ও বেলা। এছাড়া কিছু ঘাসে ঢাকা টিলাও আছে, যেমন—বানি। এই টিলাগুলো প্রকৃতপক্ষে জলাভূমির মাঝখানে দ্বীপ।

৪. রান অঞ্চল বাদ দিয়ে কচ্ছের অন্যান্য জায়গার ভূপ্রকৃতি কিছুটা মরুস্থলীর মত—বালিময় সমভূমি, গাছপালাহীন এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ে ভর্তি। এছাড়া

কোন কোন জায়গা আছে যেগুলো শুধু লাভায় গঠিত। 'লাভা' কাকে বলে জান? আচ্ছা, এখানে একটু আলোচনা করে দিচ্ছি:

তোমরা মাটিতে সামান্য একটু গর্ত করে দেখ—ভেতরটা গরম। এ থেকে নিশ্চয় বুঝেছ যে, ভূগর্ভের যত ভেতরে যাবে গরম বাড়বে। হ্যাঁ তাই। সাধারণ ভাবে প্রতি ৩০ মিটার গভীরতায় ১° সে উষ্ণতা বাড়ে। পৃথিবীর গভীরতা ত আর ঐ ৩০ বা ৪০ মিটার নয়, অনেক অনেক বেশি—প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার। তাহলে বোঝ ভেতরে কতটা গরম। তোমরা জান যে,ভীষণ গরমে কোন জিনিস শক্ত থাকতে পারে না, গলে যায়। তাই ভেতরের পাথরগুলোও সব তরল অবস্থায় আছে। ভূগর্ভের ঐ তরল পাথরকে বলে ম্যাগমা (Magma)। এ পর্যন্ত হল লাভার ভূমিকা। এবার লাভা বলতে ঠিক কি বোঝায় দেখ:

ভূগর্ভে ম্যাগমা থাকলেও প্রায়ই তা ফাটলের মধ্যে দিয়ে ওপরে উঠে আসে এবং ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। গলিত পাথর বা ম্যাগমা এইভাবে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হলে তাকে বলে লাভা (Lava)। এই লাভা ঠাণ্ডা হলে শক্ত পাথরে পরিণত হয়।

কোটি কোটি বছর আগে দাক্ষিণাত্য মালভূমি বা এই কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের তলাকার ম্যাগমা হাজার হাজার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ফলে এখন এইসব অঞ্চলের অনেক জায়গা পুরু লাভায় ঢেকে আছে।

৫. কচ্ছের প্রায় মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি ছোট পাহাড় আছে, নাম—চাদুভা ও ঢোল। এ গুলোর উচ্চতা ৪০০ মিটারেরও কম।

৬. কচ্ছের একেবারে দক্ষিণাংশে উপকূলের সমান্তরাল প্রায় ৫০ কিলোমিটার চওড়া একটি উর্বর সমভূমি আছে।

কাথিয়াবাড়ের ভূপ্রকৃতি: কাথিয়াবাড়ের ভূপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. কাথিয়াবাড় প্রধানত লাভা গঠিত মালভূমি।

২. এই উপদ্বীপের মাঝখানটা বেশ উঁচু। এই উঁচু জায়গা বিভিন্ন পাথরে তৈরি, যেমন উত্তর-পূর্ব ভাগ বেলেপাথর, পশ্চিম ভাগ চুনাপাথর ও কাদাপাথর আর দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভাগ পলিমাটি ও বালিতে ঢাকা।

৩. উপদ্বীপের মাঝখানে কতকগুলো পাহাড় আছে, যেমন উত্তরে মাণ্ডভ পাহাড়, দক্ষিণে গির পাহাড় এবং এর একটু উত্তর-পূর্বে গিরনার পাহাড়।

৪. গিরনার পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ হল গোরখনাথ (১১১৭ মি.)। কাথিয়াবাড়ের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা বলতে এই শৃঙ্গটিকে বোঝায়।

৫. একেবারে পশ্চিমে পোরবন্দরের কাছে কতকগুলো ছোট পাহাড় আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওসমান পাহাড়।

৬. উত্তরে কচ্ছ উপসাগরের দিকে কতকগুলো বালির পাহাড় বা টিলা আছে।

তাহলে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জানলে যে দুটি উপদ্বীপেরই মাঝখানটা উঁচু এবং বেশিরভাগ জায়গা লাভা গঠিত।

এবার প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো:

প্রশ্ন

১. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের ভূপ্রকৃতির পরিচয় দাও।
২. কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দুটি পাহাড়ের নাম কর।
৩. লাভা কি? ম্যাগমা কাকে বলে?
৪. কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের নাম কি ও উচ্চতা কত?

অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঃ মরু অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে হল কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়। তাই এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিছুটা 'মরু' ভাব আছে। এখানকার নদনদী, জলবায়ু, গাছপালা ইত্যাদির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর ঃ

নদনদী ঃ নদী এখানে বেশি নেই। কিভাবে থাকবে বল—খুব উঁচু পাহাড় নেই আর বৃষ্টিও কম।

কচ্ছের মাঝখানে যে দুটো পাহাড়ের কথা বলেছি—ওখান থেকে কয়েকটি নদী বেরিয়েছে। তবে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় নদীগুলো শুকনো থাকে।

কাথিয়াবাড়ের পাহাড়ী অঞ্চল থেকেও কিছু নদী বেরিয়েছে। এ গুলোর সংখ্যা ও বিস্তৃতি কচ্ছের তুলনায় বেশি। কারণটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছ—কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ে বৃষ্টি বেশি। কাথিয়াবাড়ের প্রধান দুটি নদী হল—ভাদর ও শেত্রুঞ্জী। ভাদর পশ্চিমদিকে আরব সাগরে পড়েছে আর শেত্রুঞ্জী পড়েছে পূর্বের কাম্বে উপসাগরে।

কাথিয়াবাড়ের পূর্ব সীমানায় একটি হ্রদ আছে, নাম—নল। বর্ষাকালে অনেক সময় ছোট রানের অতিরিক্ত জল এই নল হ্রদের মধ্যে দিয়ে কাম্বে উপসাগরে পড়ে।

জলবায়ু ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন, তবে সমুদ্র সংলগ্ন বলে একেবারে মরুস্থলীর মত নয়। এর কারণ হল—জলভাগ স্থলভাগের তুলনায় দেরিতে গরম ও ঠাণ্ডা হয়। সমুদ্র

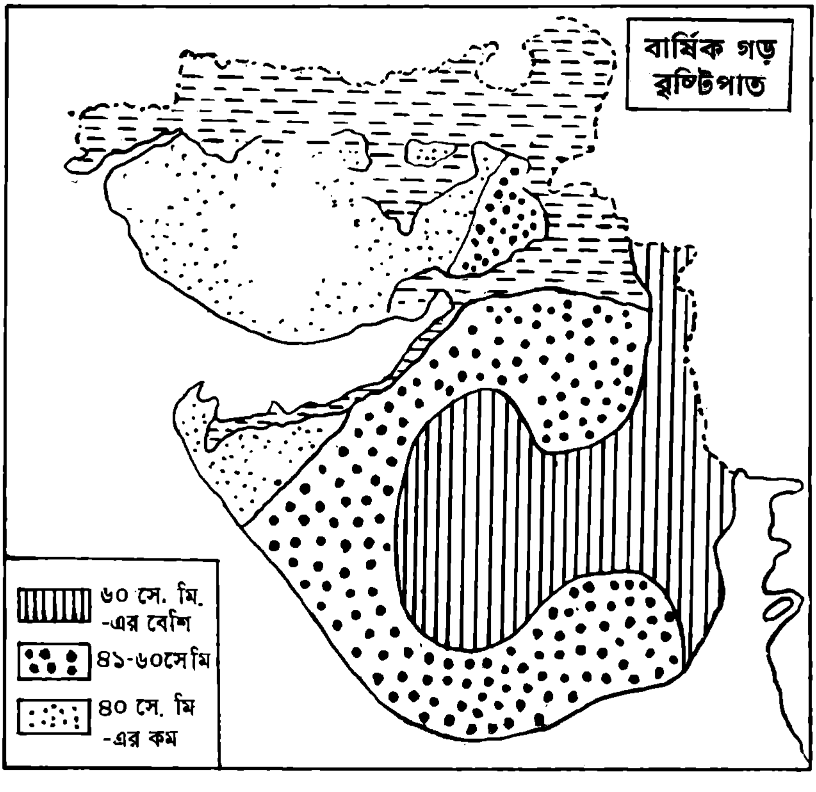

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো এর প্রভাবে সাধারণত খুব গরম বা ঠাণ্ডা হয় না। এ ছাড়া সমুদ্রের কাছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও একটু বেশি।

এখানে গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা হয় ৩০° থেকে ৩৫° সে.। এ হল গড় হিসাব। মে মাসে কোন কোনদিন তাপমাত্রা এর থেকে অনেক বেশি হয়—প্রায় ৪৫° সে,। বিশেষত উত্তরাংশে এই ধরনের উষ্ণতা বেশি দেখা যায়। শীতকালে গড় তাপমাত্রা থাকে ১৫° সে. থেকে ২৫° সে.। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা আরও কমে যায়।

তোমাদের আগে বলেছি যে ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে বৃষ্টিপাতের কিছুটা যোগাযোগ আছে, যেমন পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি আর সমভূমিতে কম। ঠিক এ জন্য কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের মাঝখানে তুলনামূলকভাবে বৃষ্টি বেশি—বছরে গড়ে ৬০ থেকে ৮০ সে.মি.। গিরনার পাহাড়ে বৃষ্টির পরিমাণ ৮০ সে.মি.-এরও বেশি। কচ্ছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম, গড়ে ৪০ সে.মি.ও হয় না।

প্রশ্ন

১. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের নদনদীর পরিচয় দাও।
২. কাথিয়াবাড়ের দুটি নদীর নাম কর।
৩. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের জলবায়ু কি ধরনের? এই দুটি জায়গার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিচয় দাও।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু ঃ জলবায়ু আলোচনায় দেখলে যে এখানকার আবহাওয়া সাধারণভাবে শুকনো। এই শুকনো পরিবেশের জন্য কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের বেশিরভাগ জায়গাতে বড় গাছ বিশেষ দেখা যায় না—শুধু ঘাস, কাঁটাগাছ, ঝোপ ইত্যাদি। বিশেষত কচ্ছে এবং কাথিয়াবাড়ের উত্তর-পূর্ব উপকূলের গাছপালা কিছুটা মরুভূমির গাছপালার মত—ওখানে শুধু ঘাস আর কাঁটাগাছ। রান অঞ্চলে কিছু গরান জাতীয় গাছ হয় এ গুলো শুধু লোনা জায়গাতে জন্মে। গরানের কাঠ জ্বালানী হিসাবে কাজে লাগান হয়।

পাতাঝরা গাছের বন ঃ কাথিয়াবাড়ের পাহাড়ী অঞ্চলে যে সব জায়গায় বৃষ্টি একটু বেশি সেখানে পাতাঝরা গাছের বন আছে। গিরনার ও গির পাহাড়ী অঞ্চলের এই বন বেশ ঘন।

মনে রাখবে ঃ গির পাহাড়ী অঞ্চলে যে ঘন বনের কথা বললাম ঐ বন সিংহের জন্য সংরক্ষিত। ভারতের মধ্যে একমাত্র গুজরাটের এই গির অরণ্যে সিংহ দেখা যায়।

গভীর অরণ্যের অভাবে এখানে অন্যান্য জীবজন্তু বিশেষ দেখা যায় না। তবে কচ্ছে অনেক উট আছে, আর রান অঞ্চলে অনেক পাখি দেখা যায়।

মাটি ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় একটি ছোট ভৌগোলিক অঞ্চল হলেও এখানকার মাটি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। কত ধরনের মাটি এখানে আছে দেখ ঃ

১. এখানকার বেশিরভাগ উঁচু জায়গাতে লাভামাটি বা কালোমাটি (Black Soil) দেখা যায়। সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রকৃতির ক্ষয়কারী শক্তির প্রভাবে লাভা ক্ষয় হয়ে কালো মাটি তৈরি হয়েছে। এই মাটিতে লোহা ও চুনজাতীয় পদার্থ বেশি থাকে বলে উর্বর।

২. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের উত্তরাংশে বেশি পরিমাণে বালি-মেশান লোনা মাটি দেখা যায়। রান অঞ্চলের আশপাশের মাটি আবার বেশি লোনা।

৩. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়—দুটি উপদ্বীপেরই দক্ষিণ উপকূলে সমুদ্রবাহিত পলিমাটি দেখা যায়।

৪. কাথিয়াবাড়ের উত্তর-পূর্বাংশে ধূসর বাদামী রঙের সামান্য পলিমাটি

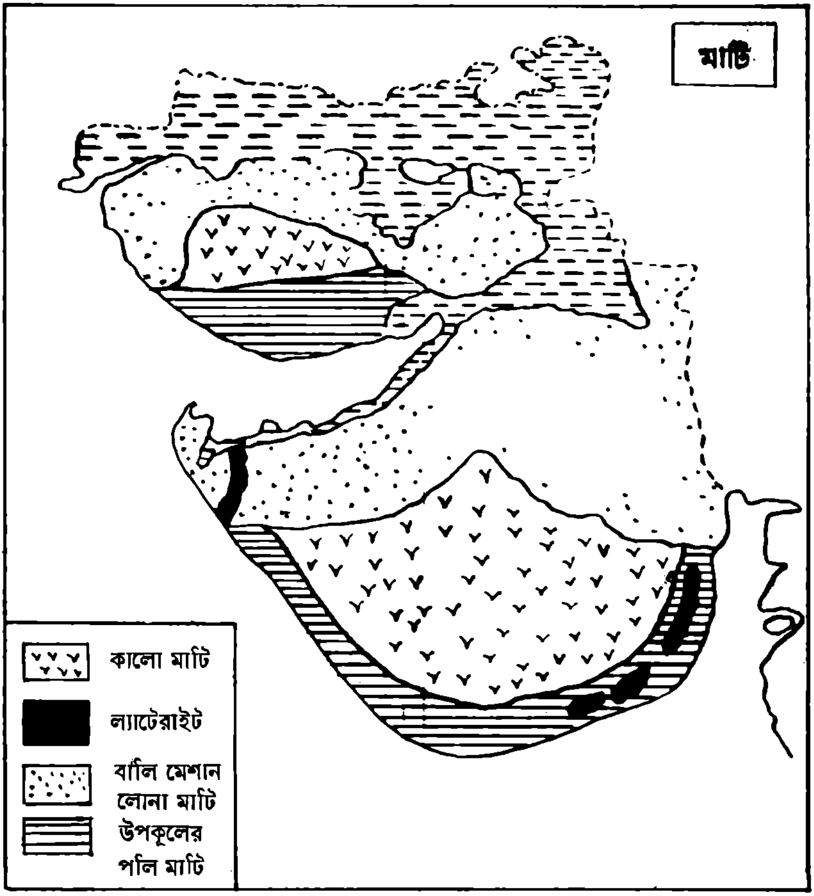

আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা একে 'গোরাডু' মাটি বলে।

৫. কাথিয়াবাড়ের পূর্বাংশে ও পশ্চিমাংশে কিছু ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়।

খনিজ সম্পদ ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ আয়তনে হয়ত খুব বড় নয়, কিন্তু এখানকার খনিজ সম্পদ উল্লেখ করার মত। এখানে যেসব খনিজ পাওয়া যায় তার মধ্যে তুমি মনে রাখবে—প্রধান খনিজগুলোর নাম এবং ওগুলো কোথায় পাওয়া যায়।

এখানকার প্রধান খনিজ হল চারটি—বক্সাইট, চুনাপাথর, নুন ও লিগনাইট কয়লা। এগুলো কোথায় পাওয়া যায় দেখ ঃ

১. কাথিয়াবাড়ের জুনাগড়ে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়, ২. চুনাপাথর পাওয়া যায় কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমাংশে পোরবন্দর থেকে দ্বারকা ও ওখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, ৩. কচ্ছের রান অঞ্চলে ও সমুদ্রের উপকূলে প্রচুর নুন উৎপন্ন হয়, এবং ৪. কচ্ছের পশ্চিমাংশে পাওয়া যায় লিগনাইট কয়লা। ওখানে কিছু কিছু চুনাপাথর ও বক্সাইটও

আছে। এসব ছাড়া হাসানপুর ও রাজকোটে ফায়ার-ক্লে আছে।

সম্ভাবনা ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রশ্ন

১. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ে জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক নির্ণয় কর।
২. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের কোথায় বেশি নুন উৎপন্ন হয় ?
৩ ভারতের কোন অরণ্যে সিংহ আছে ?
৪. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ে কি কি মাটি দেখা যায় ?
৫. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের প্রধান খনিজ দ্রব্যগুলোর নাম কি ? ওগুলো কোথায় পাওয়া যায় ?

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঃ

এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনার মধ্যে জেনেছ যে, এখানে সমভূমি খুব কম, বৃষ্টিপাত অল্প, মাটি পাঁচমেশালি এবং গাছপালা বেশি নেই। সাধারণত এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহজে উন্নতি করা যায় না। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বেশ উন্নত—কৃষিকাজ এখানে মোটামুটি ভাল হয়, শিল্পও অনেক আছে, যোগা-যোগ ব্যবস্থা খুব অনুন্নত নয়—বিশেষত কাথিয়াবাড়ে, আর লোকবসতিও মাঝা-মাঝি। এস, আমরা এখন দেখি কিভাবে এই উন্নতি সম্ভব হচ্ছে ঃ

কৃষিকাজ ঃ

কচ্ছে—ক. জমি ঃ কচ্ছের বেশির-ভাগ জায়গা (প্রায় ৭৭ শতাংশ) চাষের অনুপযুক্ত। এর কারণ জানার জন্য বেশি কিছু চিন্তার প্রয়োজন নেই, শুধু এখানকার জলবায়ু ও মাটি কি ধরনের একবার মনে করে নাও ঃ

১. জলের অভাব,
২ মাটি বেশিরভাগ লোনা,

কাথিয়াবাড়ে—ক. জমি ঃ কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ে কিন্তু চাষ-আবাদ অনেক ভাল হয়। কারণ—

১. এখানকার প্রায় ৬০ শতাংশ জমি চাষের উপযুক্ত,
২. কূপ ও জলাশয় থেকে বা নদীতে বাঁধ দিয়ে এখানকার অনেক জমিতে জলসেচ করা হয়,
৩. বেশিরভাগ জায়গাতে উর্বর লাভামাটি ও পলিমাটি আছে,
৪. কচ্ছের তুলনায় এখানে বৃষ্টি বেশি।

এইসব কারণে এখানে পাহাড়ের কাছে ও নদী উপত্যকাগুলোতে প্রচুর চাষ-আবাদ হয়।

শুধু যেসব জায়গায় উর্বর কালো মাটি আছে যেখানে ভাল চাষ হয়। এ ছাড়া দক্ষিণাংশে সমুদ্রের উপকূলে যে একফালি উর্বর জমি আছে—ওখানেও চাষ ভাল হয়।

খ. প্রধান কৃষিজ ফসল ঃ কচ্ছের প্রধান কৃষিজ ফসল হল বাজরা। এর কারণ তোমরা ত মরু অঞ্চল পড়ার সময় জেনেছ যে, শুকনো পরিবেশে বাজরা চাষ ভাল হয়। বাজরা ছাড়া আর যেসব ফসল এখানে উৎপন্ন হয় সেগুলো হল—তুলো, তৈলবীজ, জোয়ার, চীনাবাদাম ও গম।

গ. অন্যান্য ঃ আর একটি জানার বিষয় হল—কচ্ছে পশুচারণের উপযোগী যে তৃণভূমি আছে তার পরিমাণ মোট জমির প্রায় ২ শতাংশ। এই তৃণভূমি সাধারণত বেশি দেখা যায় উত্তরাংশে—ওখানে পুরো ঘাসে ঢাকা কিছু টিলা আছে। উত্তরাংশের ঐ তৃণভূমিতে অনেক গরু, মেষ, ছাগল প্রভৃতি পালন করা হয়।

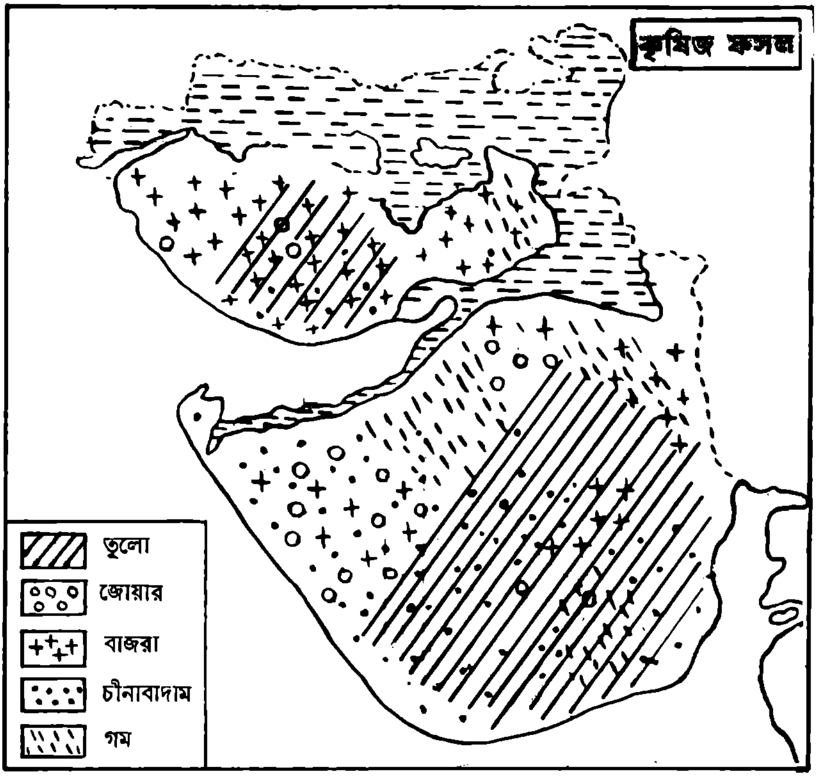

মনে রাখ ঃ পোরবন্দর থেকে রাজকোটের কাছে ভাদর নদী অববাহিকা পর্যন্ত অঞ্চল সমগ্র উপদ্বীপের মধ্যে বেশি উর্বর।

খ. কৃষিজ ফসল ঃ এখানকার প্রধান উৎপন্ন ফসল হল চীনাবাদাম। এই চীনাবাদামের খ্যাতি সারা দেশজুড়ে। পূর্বাংশে প্রচুর তুলো উৎপন্ন হয়। পশ্চিমাংশে হয় জোয়ার ও বাজরা। এ ছাড়া গম, তৈলবীজ ও সামান্য ধান এখানে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে কিছু নারিকেল বাগান আছে।

গ. অন্যান্য ঃ কচ্ছের মত কাথিয়াবাড়েও যথেষ্ট পশুপালন করা হয়।

মাছ ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের আরও একটি প্রধান সম্পদ হল মাছ। এখানকার সমুদ্র থেকে প্রচুর মাছ ধরা হয়। ঐ মাছ বিদেশেও বিক্রি করা হয়। মাছ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রগুলো স্বাভাবিকভাবে উপকূলের কাছে গড়ে উঠেছে, যেমন—পোরবন্দর, কান্দালা, লাখপত, মান্ডভী প্রভৃতি। এ ছাড়া এখানকার সমুদ্রে কিছু কিছু ঝিনুক, মুক্তো ইত্যাদি পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

১. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের কৃষিকাজের পরিচয় দাও।

২ কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ে কৃষিকাজ ভাল হয় কেন ?

৩. কচ্ছের প্রধান কৃষিজ ফসলগুলো কি ?

৪. কাথিয়াবাড়ে প্রধানত কি কি ফসল উৎপন্ন হয় ?

৫. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ে পশুপালনের পরিচয় দাও।

শিল্প ঃ কচ্ছের দক্ষিণাংশে ও কাথিয়াবাড়ে নানা ধরনের ছোট বড় অনেক শিল্প আছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শিল্পস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ওখানে আছে। তাহলে এস, কি কি শিল্প আছে তা জানার আগে এখানকার ঐ সুবিধাগুলোর কথা জেনে নাও ঃ

১. এখানে যে সব কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল পাওয়া যায় সেগুলো শিল্প-গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। যেমন চুনাপাথর থেকে সিমেণ্ট শিল্প, নুন থেকে নুন শিল্প, তুলো থেকে বস্ত্র শিল্প ইত্যাদি।

২. কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের উপকূলে অনেকগুলো বন্দর আছে। এইসব বন্দর কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাই বন্দরগুলোর কাছেপিঠে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, যেমন—ভবনগরে কাপড়, কাগজ ও লৌহ শিল্প, পোরবন্দরে লৌহ ও সিমেণ্ট শিল্প, দ্বারকায় সিমেণ্ট শিল্প ইত্যাদি।

৩. শুধুমাত্র শিল্পোন্নতির জন্য কান্দালা বন্দরে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Zone) গড়ে তোলা হয়েছে।

মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা হল এখানকার শিল্পগুলোকে বাণিজ্য শুল্ক থেকে রেহাই দেওয়া হয়। ফলে জিনিসের দাম কমে, চাহিদা বাড়ে এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

তবে ঐ শিল্পগুলোকে একটি নিয়ম মেনে চলতে হয়—শিল্পজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ-ভাবে বিদেশে বিক্রি করতে হবে।

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা যে সব কেন্দ্রে বেশি সেখানে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, যেমন—রাজকোট।

৫. এগুলো এখানকার প্রধান সুবিধা। এ ছাড়া আরও কিছু সাধারণ সুবিধার কথা বলা যায়, যেমন—সরকারি আনুকুল্য, গুজরাটের অধিবাসীদের শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগ ইত্যাদি।

এবার দেখ, এইসব সুবিধার জন্য এখানে প্রধানত কি কি শিল্প গড়ে উঠেছে ঃ

প্রধান প্রধান শিল্প ও শিল্পকেন্দ্র ঃ

বস্ত্র শিল্প ঃ ভবনগর, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, পোরবন্দর, জুনাগড়, আমরেলি।

সিমেণ্ট শিল্প ঃ দ্বারকা, পোরবন্দর।

কাগজ শিল্প ঃ ভবনগর।

রাসায়নিক শিল্প ঃ রাজকোট, ভবনগর, জামনগর, মিঠাপুর।

রেশম ও পশম শিল্প ঃ জামনগর, আমরেলি, ভবনগর।

প্রশ্ন

১. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের প্রধান শিল্পগুলো কি এবং ওগুলো কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছে ?
২. কি সুবিধার জন্য কচ্ছ ও কাথিয়া-বাড়ে শিল্প গড়ে উঠেছে ?

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। এর প্রধান দুটি কারণ ঃ

১. কচ্ছের জমি নরম, রেলপথ তৈরির উপযোগী নয়।
২. কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ে লোকবসতি বেশি এবং কৃষি ও শিল্পে উন্নত।

ফলাফল ঃ ক. কচ্ছে ঃ এ জন্য কচ্ছে রেলপথ খুব কম। পশ্চিমে ভুজ শহর পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। ঐ রেলপথ থেকে দুটি শাখা-রেলপথ দক্ষিণে টুনা ও কান্দালা পর্যন্ত গেছে।

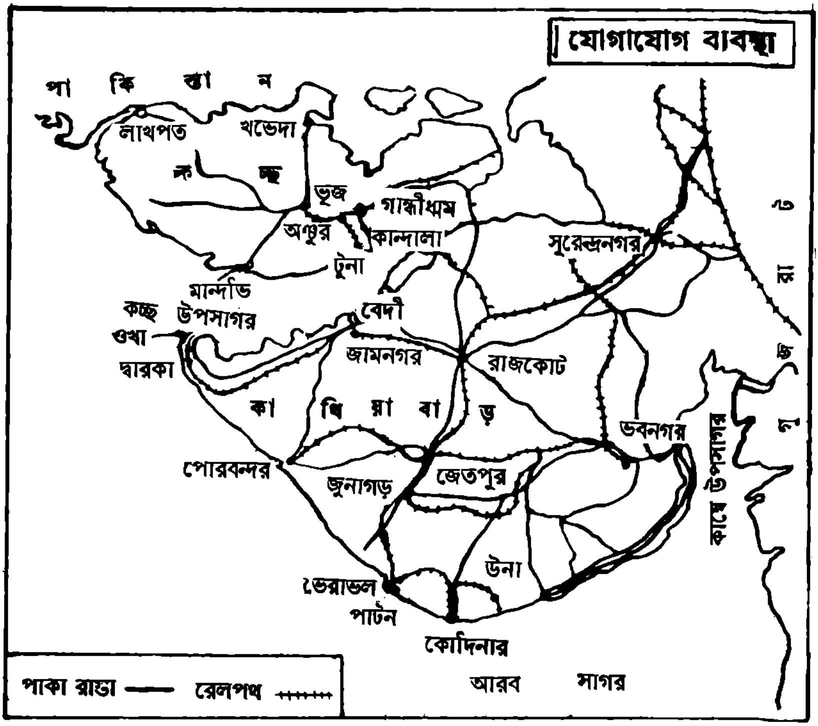

যোগাযোগ ব্যবস্থা

রেলপথের তুলনায় কচ্ছে পাকা রাস্তা অনেক বেশি। পশ্চিমে লাখপত, দক্ষিণে মান্দভি ও উত্তরে খাভদা পর্যন্ত ভাল পাকা রাস্তা আছে।

খ. কাথিয়াবাড়েঃ কাথিয়াবাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা **যথেষ্ট** উন্নত। এখানকার প্রায় প্রতিটি শহর রেলপথ ও পাকা রাস্তার মাধ্যমে যুক্ত, যেমন—জামনগর, ওখা, দ্বারকা, পোরবন্দর, ভেরাভল, উনা, রাজকোট, জুনাগড় প্রভৃতি। রাজকোট হল রেলপথের প্রধান কেন্দ্র।

রেলপথ ও পাকা রাস্তা ছাড়া কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অনেকগুলো শহর বিমান-পথে যুক্ত, যেমন—ভুজ, কান্দালা, ভবনগর, রাজকোট, জামনগর ও পোরবন্দর।

বন্দরঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এখানকার বন্দর-গুলোর গুরুত্ব খুব বেশি। তাই এই বন্দরের কথা একটু আলাদা করেই বলছি।

কান্দালাঃ কচ্ছের প্রধান দুটি বন্দর হল কান্দালা ও মান্দভি। কান্দালা শুধু এই উপদ্বীপের প্রধান বন্দর নয়, ভারতের প্রধান ১০টি বন্দরের ১টি। এ থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে এই কান্দালা বন্দর দিয়ে কত পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়। তবে কান্দালা বন্দরের এই গুরুত্ব দেশবিভাগের পর। কারণ দেশ-বিভাগের পর করাচী বন্দর পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে এই কান্দালা বন্দর তৈরি করা হয়।

পশ্চাদভূমিঃ কান্দালা বন্দরের পশ্চাদভূমিটা খুব বড়—গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী,

মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এর অন্তর্ভুক্ত। পশ্চাদভূমির সঙ্গে কান্দালা বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল।

আমদানি-রপ্তানি ঃ পশ্চাদভূমির জন্য কান্দালা দিয়ে বেশি আমদানি করা হয় খাদ্যশস্য, লোহা ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, কয়লা প্রভৃতি। আর রপ্তানি করা হয়—তুলো, জামা-কাপড়, সিমেণ্ট, নুন, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি। তোমাদের আগেই বলেছি যে কান্দালা হল করমুক্ত অঞ্চল। তাই আজকাল আসামের কিছু কিছু চা এই কান্দালা দিয়ে পশ্চিমী দেশগুলোতে রপ্তানি করা হচ্ছে।

অন্য বন্দর ঃ কাথিয়াবাড়েও অনেকগুলো বন্দর আছে, যেমন—ওখা, পোরবন্দর, ভেরাভল প্রভৃতি।

লোকবসতি ঃ কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় সম্পর্কে এতক্ষণ যে বিস্তৃত আলোচনা করা হল, দেখত তা থেকে এখানকার লোক-বসতি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তগুলো টানা যায় কিনা—

১ সামগ্রিকভাবে কচ্ছ ও কাথিয়া-বাড়ের লোকবসতি খুব ঘন নয়।

২. কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ে লোকবসতি বেশি।

৩. দুটি জায়গারই দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূলের ধারে লোকবসতি বেশি।

৪. শহরগুলো লোকবসতির কেন্দ্র, তবে গ্রামেও অনেক লোক থাকে।

এবার প্রকৃত অবস্থাটা কি দেখ—১৯৭১ সালে লোকগণনার সময় কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। এর মধ্যে কাথিয়াবাড়ের লোকসংখ্যাই বেশি—প্রায় ৮০ লক্ষ। নানারকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও অনুন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশের জন্য কচ্ছে কম লোক বাস করে। কাথিয়াবাড়ে যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ১০০ জনের বেশি লোক থাকে, সেখানে কচ্ছে থাকে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ জনেরও কম, কোন কোন জায়গায় আবার ১৫ জন মাত্র।

এখানকার শহরগুলোতে লোকবসতি খুব বেশি, যেমন—ভুজ, কান্দালা, পোরবন্দর, ওখা, দ্বারকা, ভবনগর, রাজকোট, জুনাগড় প্রভৃতি। এইসব শহর হল শিল্প ও যোগাযোগের কেন্দ্র। জীবিকা ও যাতা-য়াতের সুবিধার জন্য স্বাভাবিক কারণে এখানে লোক বেশি থাকে। এ ছাড়া কতকগুলো শহরের আলাদা কিছু বিশেষত্ব আছে, যেমন সোমনাথ ও দ্বারকা হল হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান, পোরবন্দরে মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন।

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের অনেক শহরের কথা বললাম, কিন্তু মোট লোকবসতি বেশি গ্রামে। গ্রামের লোকেরা বেশি চাষ-আবাদ ও পশুপালন করে। পুরোন গ্রামগুলোতে যদি যাও দেখবে—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, আর বাড়িগুলো দেখতে

কচ্ছে গ্রামের বাড়ি

কিছুটা গোলাকার। তবে নতুন বসতি-গুলো অনেক ছড়ান। কচ্ছের উত্তরাংশে কিছু বসতি দেখা যায় যে গুলো জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন

১. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

২. কচ্ছের তুলনায় কাথিয়াবাড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন উন্নত ?

৩. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের প্রধান বন্দরটির নাম কি ? ঐ বন্দর সম্পর্কে তুমি কি জান ?

৪. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের প্রধান শহর-গুলোর নাম কি ?

৫. কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের লোকবসতি আলোচনা কর।

জানার জন্য

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের আলোচনা এখানে শেষ হল। কিন্তু আজকের আলোচনা শেষ হল না।

কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমে গুজরাটের যে ভূখণ্ড রয়েছে, ঐ জায়গা সম্পর্কে এখন দু-চার কথা বলব। কারণ জায়গাটি সমভূমি এবং কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের সঙ্গে এর বিরাট মিল আছে। তাহলে এস গুজরাট সমভূমি সম্পর্কে একটু জেনে নাও ঃ

১. জায়গাটি কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমে এবং উপদ্বীপ সংলগ্ন, নাম—**গুজরাট সমভূমি**।

২. কাথিয়াবাড়ের সঙ্গে শুধু স্থল-ভাগের মাধ্যমে যুক্ত নয়, এক ভাষাভাষী লোকের বাস এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

৩. গুজরাট সমভূমির ভূ-প্রকৃতি সাধারণভাবে সমতল। সবরমতী, মাহি, মির্দা ও তাপ্তী—এই ৪টি হল এখানকার প্রধান নদী।

৪. এই সমভূমিতে প্রচুর পরিমাণে তুলো, জোয়ার, বাজরা, আখ ও ধান জন্মে।

৫ প্রচুর পরিমাণে কাঁচা তুলো, আর্দ্র জলবায়ু, দক্ষ শ্রমিক, পর্যাপ্ত অর্থ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ, স্থানীয় চাহিদা প্রভৃতির জন্য গুজরাট রাজ্যে অনেক বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের বস্ত্র শিল্প কেন্দ্রগুলোর নাম জেনেছ। এই সমভূমির প্রধান প্রধান বস্ত্রশিল্পকেন্দ্র হল—আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, কাম্বে প্রভৃতি।

৬. বস্ত্রশিল্প ছাড়া সমভূমিতে আরও অনেক শিল্প আছে, যেমন সিমেণ্ট, তামাক, রাসায়নিক সার প্রভৃতি।

৭. এখানকার 'আনন্দ' একটি বিখ্যাত দুগ্ধশিল্প কেন্দ্র। 'আমূল' দুধ ও মাখন এখানে তৈরি হয়।

৮. এই সমভূমির একটি প্রধান সম্পদ হল খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম। কাম্বে উপসাগরের তীরে আঙ্কলেশ্বর ও ব্রোচ-এ প্রচুর পরিমাণে তেল উৎপাদন করা হচ্ছে।

গৌতম মল্লিক

কর্মশিক্ষা

১৯৮২ সালে নবপ্রবর্তিত পাঠ্যসূচীতে যেসব প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে দুটি প্রকল্পের আলোচনা আমরা শেষ করেছি : সাবান-ফিনাইল-কালি তৈরি এবং শাকসবজি ও ফুলের চাষ।

শাকসবজির চাষ বা ফুলের চাষ প্রসঙ্গে বীজতলা তৈরি, চারা লাগান বা সার প্রয়োগের যেসব কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী তোমরা নিশ্চয়ই স্কুলে কাজ শুরু করে দিয়েছ। গরমের ছুটির পর স্কুল খুলে গিয়েছে—এবার নবম দশমের নির্দেশ মত চটপট সবজি চাষ আরম্ভ করে দাও। বর্ষাও এসে গিয়েছে।

সবজির চাষ বা ফুলের চাষের কথা বললেই যে কথাটা মনে পড়ে তা হল বাগানের কথা। শুধু সবজি বাগান বা ফুলবাগান নয়—ফলেরও বাগান আছে। শাকসবজি আমরা মাঠে বা বাগানে ফলাই বটে, তবে ওগুলো আমরা রান্না করে খাই। ফল এমনিতে রান্না করতে হয় না—পেড়ে বা সংগ্রহ করে খাই। তবে হ্যাঁ, ফল থেকে নানান রকমের খাবার উনুনের সাহায্যেই তৈরি করা হয়। পেয়ারার জেলি বা আমের মোরব্বা। এই দেখ, লিখতে গিয়ে আমার জিভেও জল এসে গেল। পড়তে গিয়ে তোমাদেরও ?

ফুল আমরা চোখে দেখে মুগ্ধ হই বা গন্ধ শুঁকে তৃপ্ত হই। শরীরের পুষ্টির জন্যে দরকার শাকসবজি ও ফল, মনের পুষ্টির জন্যে চাই ফুল।

ফুল-ফল কিভাবে তৈরি করতে হয় তার কথা যে বিজ্ঞান বলে তার নাম উদ্যানরচনা (horticulture)।

উদ্যানরচনা

ইংরাজী পত্রে মাস্টারমশাই তোমাদের যখন অনুচ্ছেদ লেখার বিষয় নির্দিষ্ট করে দেন : My Favourite Hobby, তখন অনেকেই হয়ত লেখ : 'বাগান তৈরির শখ'। শুধু ফুল বা ফলের বাগান তৈরি করলেই ত হল না, আরও ভাল জাতের, আরও সুন্দর ফুল বা ফল কিভাবে উৎপন্ন করা যায়—সেদিকটাও নিশ্চয় দেখতে হবে। এ জন্যেই প্রয়োজন উদ্যানরচনার কৌশল জানা। এর মধ্যে থাকবে বাগান তৈরি করার নকসা, গাছের পরিচর্যা, আর্দ্রতা সংরক্ষণ, গাছ ছাঁটা, কলম প্রস্তুতের মাধ্যমে গাছের বংশবৃদ্ধি, লন তৈরি—আরও কত কী—তাই উদ্যানরচনাই আমাদের তৃতীয় প্রকল্প।

সুসমঞ্জস বাগানের নকসা

পরিকল্পনাবিহীন বাগান দেখতে কার ভাল লাগে? তোমাদের স্কুলের সামনে যে জমিটুকু আছে তার একদিকে যেভাবে ফুলের কেয়ারি করা হবে তার উলটো দিকেও ঠিক সেইভাবে ফুলের কেয়ারি করলে দেখতে সুন্দর হবে। মাঝখানে, কেন্দ্রবিন্দুতে গোলাকার প্লট তৈরি করে চন্দ্রমল্লিকা বা অন্য কোন ছোট ফুলের কেয়ারি করা যেতে পারে। স্কুলবাড়ির পিছনের আয়তাকার জমিতে হয়ত বেছে বেছে কিছু ফলের গাছ লাগালে। মোট কথা, এইসব flower-bed বা fruit-bed পরিকল্পনামাফিক হওয়া চাই।

সুসমঞ্জস ধরনের উদ্যানরচনা যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে :

১. জমির ধরন কী রকম—অর্থাৎ

বর্গাকার, না আয়তাকার, না অসম কোণের। জমির আকার বুঝে ফুলগাছের কেয়ারির আকারও ঠিক করে নেওয়া যায়।

২. শিল্পীসুলভ রুচি—বাগানের কোন দিকটায় কী কী থাকবে সেটা নির্ভর করে শিল্পদৃষ্টির ওপর। কিছু ছোট ছোট তোরণ তৈরি করে তার ওপর লতানে গাছ দেওয়া যায়, একটু সবুজ ঘাসের লন, কিছু মরশুমী ফুলের গাছ, কিছু সুগন্ধি ফুলের গাছ বা বাহারী পাতার গাছ, মাঝে মাঝে ছোট্ট বাঁধান রাস্তা, যার পাশ দিয়ে জলের নালা, জলের ওপরে ভাসছে পদ্ম বা শালুক পাতা (যেমন আছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি উদয়নের পিছনের বাগানটিতে)।

অনেক বাগানে আবার (দেখেছি হায়দ্রাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ চিড়িয়াখানায়) কত যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে পাতা ছেঁটে ছেঁটে মস্ত শুঁড়-তোলা হাতি, পেখম-ধরা ময়ূর। এ সবই বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক, তাতে সন্দেহ নেই।

জমি পছন্দ, জমি তৈরি।

খোলামেলা, রোদ-হাওয়া আছে এমন জায়গায় মরশুমী ফুলের গাছ ভাল হয়। কাছাকাছি কোন বড় গাছের ছায়া তাকে ঢেকে দেবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে প্রচুর রোদ পাবে। জমিতে জল জমতে দেওয়া চলবে না। সরস দো-আঁশ মাটিই মরশুমী ফুল চাষের উপযোগী। মাটি এঁটেল থাকলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ৭০ গ্রাম চুনের গুঁড়ো মেশাতে হবে, তা হলে মাটি ঝুরঝুরে হবে। চুন দেওয়ার এক মাস পরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

এক কাজ কর। বাগানের প্রান্তে এক জায়গায় কয়েক ফুট গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে রাখ। বাগানের প্রতিদিনের পাতার আবর্জনা ঐ গর্তে জমিয়ে রাখ। গর্তটি ভরে গেলে এক বস্তা চুন তার ওপর ঢেলে তার ওপরে মাটি চাপা দাও। বছরখানেক পর দেখবে পাতাপচা সার বা কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই কম্পোস্ট শিক্ষকমশায়ের নির্দেশ মত ফুলগাছ বা ফলগাছের জমিতে মিশিয়ে দিলে উৎকৃষ্ট গাছ হবে। পাতাপচা সারের সঙ্গে প্রতি বর্গমিটার জমির জন্যে মেশাতে হবে খইল ২৫০ গ্রাম, সুপার ফসফেট ১০০ গ্রাম এবং মিউরিয়েট-অব-পটাশ ৫০ গ্রাম।

চারা বসান

বড় গাছ লাগাতে হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত করতে হবে। তিন ফুট ব্যাস আর তিন ফুট গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হয়। প্রতি ৬ ঝুড়ি মাটিতে ১ ঝুড়ি কম্পোস্ট বা পাতাপচা সার মিশিয়ে, অর্থাৎ ৬ : ১ হারে গর্তে মাটি দিতে হবে। মাটি যাতে ভালভাবে রোদ পায় সে জন্যে কয়েকদিন ফেলে রাখতে হবে। কয়েকদিন কেটে গেলে ঐ গর্তের মাঝখানে চারা বসাতে হবে—মূল শেকড়টি যেন সোজাভাবে থাকে। এর পর অল্প পরিমাণে জল ঢালতে হবে ঐ গাছের গোড়ায়।

আর্দ্রতা সংরক্ষণ

মাটিতে জল বা রস না থাকলে গাছের বৃদ্ধি হবে কেমন করে? কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মাটির নিচে যে জল থাকে তা মাটির মধ্যেকার রন্ধ্রপথ (pore-space) দিয়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় উবে যায় ; ফলে মাটিতে জলের ঘাটতি হয়। এ জন্যে দরকার জল সংরক্ষণ করা। Mulching প্রক্রিয়ায় এই আর্দ্রতা ধরে রাখা যায়। ফুল বা ফলের মাঝখানের অঞ্চলের মাটিকে খুব ভালভাবে খুঁড়ে ওলোট-পালোট করে গুঁড়ো করে দেওয়ার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হল Mulching. চাষীদের দেখবে যেখানে বড় বড় গাছ লাগান হয়েছে তার চার পাশে খড়, ঘাস

ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন তাঁরা ; এর ফলে মাটির নিচেকার জল বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় উবে যেতে পারে না—মাটিতেই আর্দ্রতা সংরক্ষিত থাকে।

ডাল-ছাঁটা

গাছ যখন বড় হতে থাকে তখন তার গা থেকে বহু ডালপালা এলোমেলোভাবে বেরিয়ে আসে। দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। অপ্রয়োজনীয় ডালপালাগুলো গাছের অনেকখানি খাদ্যই শুষে নেয়। এই সব অদরকারী ডালপালা ছেঁটে দিলে ফুল বা ফল উৎকৃষ্ট হয়, গাছ দেখতেও সুন্দর হয়। যে সব গাছের ডাল নরম সেগুলো বিশেষ ধরনের কাঁচি বা ছুরি দিয়ে ছেঁটে সুন্দর সুন্দর (হাতি, পাখি বা ময়ূরের কথা যা বলেছি) আকৃতি দেওয়া যেতে পারে।

ফুলগাছের বেলায় একটি কাজ হল **কুঁড়ি ভাঙা**। গাছের ডালে প্রথম যে কুঁড়িটি দেখা দেয় তাকে বলে মুকুল কুঁড়ি। পাশের ডালের ফোটা কুঁড়িকে বলে প্রান্ত কুঁড়ি। মুকুল কুঁড়ি রেখে প্রান্ত কুঁড়িগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়। গাছে বেশি ফুল ফুটলে ফুলের আকার ছোট হবেই।

বাগানে চন্দ্রমল্লিকা (crysanthe-mum) লাগিয়েছ ? প্রায় মাস তিনেক লাগবে ফুল ফুটতে ; ফুল ফোটা শেষ হলে মাটি থেকে ২ সে. মি. ওপরে তার কাণ্ড কেটে দিতে হয়। তা হলে গেঁড় গজাতে সুবিধে হবে। উৎকৃষ্ট, ভাল জাতের চন্দ্রমল্লিকা পেতে হলে গেঁড় অথবা কাটিং থেকে চারা করতে হয়।

কলম তৈরি

বীজ থেকে চারা তৈরি করা খুব সহজ ব্যাপার—এ কথা তোমরা জেনেছ। কিন্তু এতে ফুল বা ফল ধরতে দেরি হয়। কিংবা বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ এমন অনেক আছে যেগুলো গুণের দিক থেকে ঠিক মাতৃ গাছের মত হয় না। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি মরশুমী ফুলের চারা এবং জবা, রঙ্গন, করবী, গোলাপ, গন্ধরাজ, হাসনুহানা প্রভৃতি অসংখ্য বহুবর্ষজীবী ফুলের চারা বীজ থেকে উৎপাদন করা যায় না।

এই কারণে আধুনিক প্রথায় অনেক গাছের ডালে কলম করে চারা লাগানো হয়। এতে ফল তাড়াতাড়ি ধরে, ফুল তাড়াতাড়ি হয়। অবশ্য সব গাছেরই কলম করা যাবে না—যেমন পেঁপে, তাল। আবার আম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ কলমে ভাল হয়। কলম বহু রকমে করা যায়।

১. শাখা কলম : চারা করবার সহজতম পদ্ধতি এটা। ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলেই তার শিকড় বেরোবে, চারা হয়ে যাবে। একে বলা হয় stem-cutting বা শাখাকলম।

২. দাবা কলম : লেবু, পেয়ারা, বেল, গন্ধরাজ ইত্যাদি গাছের ডাল না কেটে তাকে নুইয়ে মাটির নিচে দাবিয়ে মাটি চাপা দিলে সেখান থেকে শিকড় বেরিয়ে নতুন গাছ হয়। একে বলে layering বা দাবাকলম। ডালটি যাতে মাটি থেকে উঠে না যায় সে জন্যে মাথা-বাঁকান পেরেক দিয়ে চেপে রাখতে হয়।

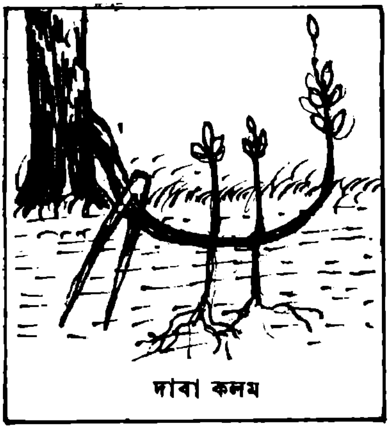

দাবা কলম

ডালটির যে অংশ মাটিতে পোঁতা হয় তার খানিকটা বাকল ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলতে হয়। তারপর ঐ স্থানটি কম্পোস্ট-মেশা মাটি দিয়ে চাপা দিতে হয়।

৩. **গুটি কলম ঃ** ডালের সামান্য অংশের ছাল উঠিয়ে সেখানে গোবরমাটির গুল দিয়ে চট বা নারকেলের ছোবড়া জড়িয়ে রাখতে হয়। ডালটিকে ভেজা রাখবার জন্যে একটি সছিদ্র জলপূর্ণ হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিতে হয় যাতে গুলের ওপরে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। মাস দেড়েক পর দেখা যাবে গুলবাঁধা জায়গা থেকে শিকড় বেরিয়েছে ; তখন গুলের নিচ থেকে কলম কেটে নিতে হবে। ঐ কলম নির্দিষ্ট জায়গায় পু'তে দিলেই হবে। আম, লিচু, কুল, লেবু, জবা, কাঞ্চন, বাগানবিলাস, ক্রোটন ইত্যাদির গুটি কলম করা হয়।

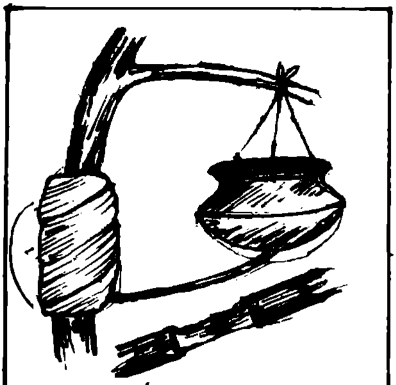

গুটি কলম

এই কয়েকটি কলমের কথা শিখে নাও জলদি। পরের সংখ্যায় আরও কয়েকটি উপহার দেব।

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

শারীর শিক্ষা

অ্যাথলেটিক্স [বাধ্যতামূলক]

তোমরা ত আগের আলোচনাগুলো থেকে বুঝতেই পেরেছ যে অ্যাথলেটিক্স-এর বিভিন্ন বিষয়গুলো হল ব্যক্তিগত অর্থাৎ এককভাবে করতে হয়। এর ব্যতিক্রম কিন্তু রিলে রেসে—এইটাই অ্যাথলেটিক্স-এ একমাত্র দলগত ইভেন্ট বা বিষয়। তাই বোধহয় এটাই দর্শকদের কাছে সব থেকে চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয়।

খেলাধূলার ইতিহাসে দেখা যায় যে এই রিলে রেস ১৯০৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক্স গেমসে প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন অবশ্য ঐ প্রতিযোগিতায় আজকের মত ৪ × ১০০ মি. ও ৪ × ৪০০ মি. রিলে দৌড় ছিল না—ছিল মিডলে রিলে যার দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ২২০—২২০ ৪৪০—৮৮০ গজ। ১৯১২ সালের স্টকহোমের অলিম্পিক্স গেমসে এই মিডলে রিলে দৌড় বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৪ × ১০০ মি ও ৪ × ৪০০ মি রিলে দৌড় এবং প্রথম রিলে ব্যাটনের প্রবর্তন করা হয়। যা আজও চলছে। যে দৌড় প্রতিযোগিতায় সমগ্র দূরত্বের অংশবিশেষ দলের প্রত্যেক প্রতিযোগী বা সভ্য দৌড়িয়ে থাকে তাকে রিলে রেস বা দৌড় বলা হয়। সাধারণত প্রত্যেক দলে চারজন করে সভ্য থাকে। এরা প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দৌড়ে নিজের দলের পরবর্তী সভ্যর হাতে একটি রিলে ব্যাটন বা ছোট একটা লাঠি (দৈর্ঘ্য ২৮ থেকে ৩০ সেমি, পরিধি ১২ থেকে ১৩ সেমি, ওজন ৫০ গ্রামের কম নয়)—একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দিয়ে থাকে। তারপর সেই সভ্য ঐ লাঠিটি নিয়ে দৌড় আরম্ভ করে ও পর্যায়ক্রমে পরবর্তী সভ্যকে দণ্ডটি ঠিক আগের মতই দিয়ে থাকে। এই ভাবেই

দলের সভ্যরা প্রত্যেকে কিছুটা করে অংশ দৌড়িয়ে খেলাটা শেষ করে। যদিও মিডলে রিলে দৌড়ের প্রচলন আজ আর অলিম্পিক্স প্রতিযোগিতায় নেই তবুও এই মিডলে রিলে দৌড় বিদ্যালয়গুলোতে এখনও প্রচলিত আছে। কম বয়সে সবার পক্ষে ৪ × ১০০ মি বা ৪ × ৪০০ মি রিলে দৌড় সম্ভবও নয়। তা ছাড়া শরীরের দিক থেকে এটা ঠিকও নয়। তাই মিডলে রিলে দৌড় বিদ্যালয়গুলোতে শেখান উচিত বা আয়োজন করা উচিত। মিডলে রিলেতে চারজন প্রতিযোগী যথাক্রমে ৫০ মি., ৫০ মি., ৭৫ মি, ৭৫ মি. বা এই রকমের বিভিন্ন দূরত্বে দৌড়ে থাকে।

রিলে দৌড়ে ব্যাটন বা দণ্ড পরিবর্তন বা বদল করা হয় দুই ভাবে—

ক. দেখে বদল করা [visual exchange]

এই ক্ষেত্রে পরবর্তী দৌড়বীর (runner) যে ব্যাটন নেবে সে দেখে দেখে ব্যাটন বদল করবে। এই ভাবে সাধারণত ৪ × ৪০০ মি. রিলে দৌড়ে ব্যাটন বদল করা হয়ে থাকে। ছোটরা বা যারা প্রথম প্রথম রিলে ব্যাটন বদল করা শিখছে তাদের কিন্তু এই ভাবেই ৪ × ১০০ মি. বা মিডলে রিলেতে ব্যাটন পরিবর্তন বা বদল করা উচিত।

খ. না দেখে বদল করা [non-visual exchange]।

এ ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগী ব্যাটন নিয়ে দৌড়ে থাকে সে ব্যাটন পরিবর্তন বা বদল করে না দেখেই। এই ভাবে ৪ × ১০০ মি. বা মিডলে রিলেতে ব্যাটন বদল করা হয়।

তোমাদের আগেই বলেছি ব্যাটন বদল করা হয় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে—অর্থাৎ ২০ মি. অঞ্চলের মধ্যে—এটাকে বলা হয় ব্যাটন নেবার অঞ্চল [Take Over zone]। অবশ্য ৪ × ১০০ মি. রিলে দৌড়ে যে প্রতিযোগী বা সভ্য রিলে ব্যাটন নেবে সে ২০ মি. অঞ্চলের বাইরে ১০ মি. দূর থেকে দৌড় আরম্ভ করতে পারে—এটাকে Free zone বা Acceleration zone বলে। **তবে ব্যাটন পরিবর্তন এই অঞ্চলে কখনই করা যাবে না।**

রিলে দৌড়ে যদি ভাল করতে চাও ও ভাল করে শিখতে চাও তাহলে অবশ্যই দুটি উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে—

১. ব্যাটনের নিরাপত্তা—মনে রাখতে হবে ব্যাটন নিয়েই দৌড়তে হবে আবার এই ব্যাটনই অপরের হাতে দৌড়ে দিতে হবে ও অন্যজনকে সেই ব্যাটন নিয়ে দৌড়তে হবে। অর্থাৎ রিলে দৌড়ের প্রতিটি ধাপে ব্যাটন হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যাটন কিভাবে ধরতে হবে—ধর কিভাবে দৌড় আরম্ভ করবে ও দৌড়ে কিভাবে অপরের কাছ থেকে নেবে সেগুলো সবার আগে ভাল করে শিখতে হবে। অর্থাৎ ব্যাটন নিরাপত্তার জন্য ভাল করে ব্যাটন ধরা শিখতে হবে।

ক. সাধারণভাবে ব্যাটন হাতে আড়াআড়িভাবে ধরা হয়। হাতের তালুর মধ্যে একটু গর্ত মত থাকবে, বুড়ো আঙ্গুল ও অন্য চারটে আঙ্গুলের মাঝে '/\' আকার হবে। চারটে আঙ্গুলই কিন্তু একই সঙ্গে রাখার চেষ্টা করবে। এই ভাবে আড়াআড়ি করে রিলে ব্যাটন ধরতে হবে।

খ. ব্যাটন কিভাবে ধরে দৌড় আরম্ভ করে মাঝের দুটো আঙ্গুলের সাহায্যে ব্যাটন

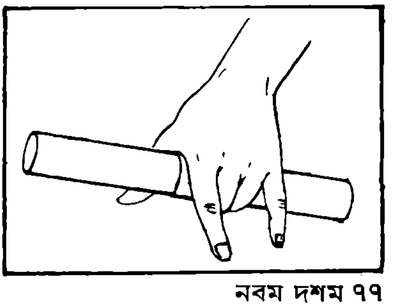

ধরবে ও বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে '/\' (ব্রীজের মত) আকার করে দেহের ওজনটাকে মাটিতে ধরে রাখবে—একে সাহায্য করবে কড়ে আঙ্গুল অর্থাৎ কড়ে আঙ্গুলও মাটিতে থাকবে।

২. ব্যাটনের গতিকে মোটামুটি একই ভাবে রাখা ঃ ব্যাটনের গতিকে যদি মোটামুটি একই ভাবে রাখা যায় তবেই রিলে দৌড়ে ভাল সময় হবে। এই ব্যাটনের গতি ঠিক রাখার জন্যই তোমাদের শিখতে হবে ব্যাটন বদলের কায়দা। তোমরা ত জেনেইছ যে ব্যাটন বদল করা হয় দুই ভাবে—দেখে ও না দেখে। এর মধ্যে না দেখে ব্যাটন বদল করলে, ব্যাটনের গতিটা মোটামুটি ঠিক থাকে।

না দেখে ব্যাটন বদল করার সময় [non-visual exchange] একজন অপরজনের হাতে ব্যাটন দুই ভাবে দিতে পারে ঃ i) নিচের দিক থেকে উপরের দিকে এনে ব্যাটন দেওয়া [underhand pass] ঃ এক্ষেত্রে যে ব্যাটন নেবে সে ব্যাটন বহনকারীর সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে হাতটা পিছন দিকে পুরোটা সোজাসুজি বাড়িয়ে দেবে। হাতের তালুটা যে ব্যাটন নিয়ে আসছে তার দিকে থাকবে, আঙ্গুলের ডগাগুলো নিচের দিকে থাকবে ও

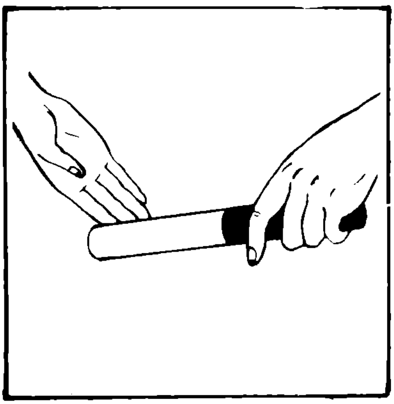

বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে অন্য চারটে আঙ্গুলে মাঝে '/\' আকার হবে। ব্যাটনটা '/\' এই আকারের মধ্যে যে নিয়ে আসছে সে দিয়ে দেবে। এইভাবে ব্যাটন দেওয়া নেওয়াতে অসুবিধে হলে যে ব্যাটন নেবে তাকে পরবর্তী প্রতিযোগীকে দেবার জন্য হাত বদল করে নিতে হবে—অর্থাৎ বাঁ হাতে নিলে ডান হাতে দৌড়তে দৌড়তে বদল করে নিতে হবে যাতে পরবর্তী প্রতিযোগী বা সভ্য সেটাকে ভাল করে ধরার সুযোগ পায়। ii) উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নিয়ে গিয়ে ব্যাটন দেওয়া [overhand pass]

এক্ষেত্রে ব্যাটন নেবার সময় হাতের তালু উপরের দিকে থাকবে। তালুর মধ্যে খানিকটা গর্ত থাকবে ও আঙ্গুলগুলো একে অপরের সঙ্গে লাগান থাকবে। ব্যাটনটা

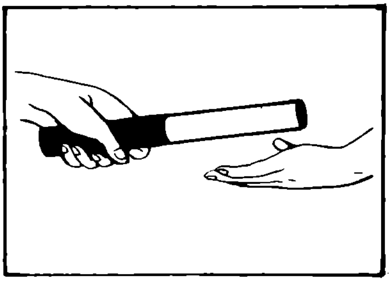

ওপরের দিক থেকে এনে দেওয়া হয়—ব্যাটনের হাত বদলের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

না দেখে ব্যাটনের বদলের ক্ষেত্রে চারজন সভ্যর মধ্যে—প্রথম ও দ্বিতীয় জন ডান হাতে ব্যাটন নিয়ে দৌড়বে, তৃতীয় ও চতুর্থ জন বাঁ হাতে ব্যাটন নিয়ে দৌড়বে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যাটন নেবে সে মুক্ত অঞ্চলে দৌড় আরম্ভ করার ভঙ্গি করে দাঁড়াবে। দাঁড়াবার আগে সে একটা চিহ্ন রাখবে মুক্ত অঞ্চলের বাইরে, যে চিহ্নে পা দিলেই (যে ব্যাটন নিয়ে আসছে) সে দৌড় আরম্ভ করবে।

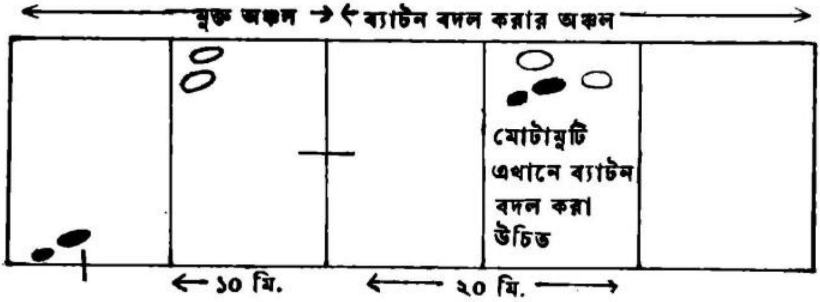

এই ভাবে দুজনেই দৌড়তে থাকবে নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে, অর্থাৎ গতি না কমিয়ে। ব্যাটন বদলের অঞ্চলে পৌঁছে ১০ থেকে ১৪ মিনিটের মাথায় ব্যাটন বদল হবে। যার হাতে ব্যাটন আছে সে সঙ্কেত দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাটন নেবে সে হাত তুলে ব্যাটন নেবার জন্য প্রস্তুত হবে ও ব্যাটন নেবে।

অমিয় সাহা

পুরাতন ভৃত্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের পুরোন চাকর বনমালীকে নিয়ে প্রায়ই রঙ্গ করতেন। বলতেন, 'আচ্ছা বনমালী, তুই কী জানিস আমি একজন খুব বড়লোক?' বনমালী বলত, 'হ্যাঁ বাবুমশায়, জানি।'

—'কিসে আমি বড়লোক বল তো? দ্বারকানাথের 'লাতি' বলে?' বনমালী হি হি করে আর হাত কচলায়। বলে, 'বলব? বলব?'—'বল না।'

বনমালী আরও হেসে দু'হাত কচলে বলে উঠল, 'আপনি নেকার জোরে বড়লোক।' তা শুনে হো হো করে হাসতেন রবীন্দ্রনাথ।

দুই বন্ধু

সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশবন্ধুর তখন চরম আর্থিক দুর্দশা। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র একদিন হেসে বললেন, 'ত্যাগ ও দুঃখবরণ ছাড়া যখন স্বরাজলাভ হবেই না, আর সবই যখন ত্যাগ করেছেন এবং দুঃখেরও চরম হয়েছে তখন একখানা পা কেটে ফেলুন। তাতে আপনার স্বরাজ নিশ্চই এগিয়ে আসবে।' এই বলে মোটা টাকার একটি চেক তিনি দেশবন্ধুকে এগিয়ে দিলেন।

উপহার

১৯২৮ সালে ইউরোপের দু'জন শ্রেষ্ঠ লেখক রোমা রোঁলা ও বার্নার্ড শ' বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁদের গ্রন্থ উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। রোঁলা তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর পাতায় লিখেছিলেন 'নূতন একটি পৃথিবীর আবিষ্কারককে এ গ্রন্থ উপহার দিলাম।' বার্নার্ড শ' তাঁর গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন এই বলে—'পৃথিবীর নিকৃষ্ট শারীরবৃত্তবিদের কাছ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শারীরবৃত্তবিদের কাছে।'

গণিত

গরমের ছুটি শেষ হয়ে স্কুল এতদিনে সকলের খুলে গেছে। আবার স্কুলের বন্ধুদের এবং মাস্টারমশাইদের সঙ্গে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, গত দুটি সংখ্যায় এ পর্যন্ত তোমারা যা শিখেছ তার পুনরনুশীলন করলে। এবার নতুন পড়া আবার শুরু করা যাক।

পাটিগণিত

আজ আমরা অনুপাত পর্যায়ের **'মিশ্রণ'** সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে **দর** বলতে কি বুঝায় তা জানা দরকার। দর হল কোন দ্রব্যের একক পরিমাণের মূল্য। আবার **পরিমাণ** বলতে ওজন, আয়তন বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, যে কোনটিকে বুঝায়। অতএব দর বলতে কোন দ্রব্যের একক ওজনের বা একক আয়তনের বা একক কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার মূল্যকে বুঝায়। যেমন—1 কিলোগ্রাম (ওজন) চালের মূল্য 3·50 টাকা, 1 লিটার (আয়তন) কেরোসিন তেলের মূল্য 1·80 টাকা বা 1 ডজন (একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা অর্থাৎ 12টি) পেন্সিলের মূল্য 12 টাকা হল যথাক্রমে চাল, কেরোসিন তেল এবং পেন্সিলের দর।

এবার মিশ্রণ ব্যাপারটার সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া দরকার। কিন্তু পরিচিত তোমরা হয়েই আছ। শুধু নামকরণটা হয়ত জাননা। দেখ, তোমরা বাজারে তরিতরকারি, চা, চাল ইত্যাদি কেনাকাটা কর। ভাল চায়ের দাম খুব বেশি। আবার খারাপ চা খেতে ভাল লাগে না। দোকানদারকে চা বিক্রি করতে হবে ; তোমাকে ফেরত পাঠালে চলবে না। আবার লাভও করতে হবে। ক্ষতি সে করবে না। সে তখন খারাপ চা আর ভাল চা মিশিয়ে দেবে। ধর 200 গ্রাম চা কিনলে যার মধ্যে 125 গ্রাম খারাপ চা আর 75 গ্রাম ভাল চা মিশিয়ে দেওয়া হল। তোমার কাছে দাম নেওয়ার সময় 125 গ্রাম খারাপ চা আর 75 গ্রাম ভাল চায়ের দাম যোগ করলে যা হয় তাই নেবে। তবে তার হিসাব আগেই কষা থাকে। সেই অনুসারে মেশান চায়ের প্রতি কিলোগ্রামের দাম তোমাকে বলে দেবে। মিশ্রিত চা-এর দরকে চা-এর **পড়তা** বলে। এই পড়তা দুরকম চায়ের গড় মূল্যের সমান।

দুরকম চা মেশানর সময় যে কোন অনুপাতে মেশালে ত দর ঠিক থাকে না। একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশালে দর নির্দিষ্ট করা যায়। এই যে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে দর নির্দিষ্ট করা যায়, একেই বলে মিশ্রণ পর্যায়ের অঙ্ক।

দেখ, শুনতে খারাপ লাগলেও প্রকৃতপক্ষে একে ভেজালের অঙ্ক বলা উচিত। 'মিশ্রণ' শব্দটা শ্রুতিমধুর এবং মার্জিত। আসলে আমরা ভেজালের অঙ্ক আলোচনা করব। খুব হাসি পাচ্ছে না ? দেখ খারাপ জিনিসকে খারাপ বলাই ভাল। এতে খারাপ হওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়। খারাপ জিনিসকে ভাল বললে খারাপ হওয়ার সুযোগটা বেশি থাকে। ভাল হতে হলে ভাল এবং খারাপ দুটোই জানা দরকার এবং দুটোর পার্থক্যও জানা দরকার। যাক, এখন ভেজাল বা মিশ্রণের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম সমস্যা ঃ একই পদার্থের দুরকম দরের দ্রব্য মেশান হল। মিশ্রিত দ্রব্যের দর বা পড়তাও জানিয়ে দেওয়া হল। বের করতে হবে দুরকম দ্রব্যের পরিমাণের অনুপাত যেমন—

I নম্বর প্রশ্ন ঃ প্রতি কিলোগ্রাম 20 টাকা দরের চায়ের সঙ্গে প্রতি কিলোগ্রাম 35 টাকা দরের চা কি অনুপাতে মেশালে মেশান চায়ের প্রতি কিলোগ্রামের মূল্য 25 টাকা হবে ?

পদ্ধতি ঃ দেখ, মিশ্রিত চায়ের 1 কিলোগ্রামের মূল্য দুরকম চায়ের প্রথমটি থেকে বেশি কিন্তু দ্বিতীয়টি থেকে কম। এই মূল্য প্রথমটি থেকে কতটা বেশি তা বিয়োগ করে বের কর। এই বিয়োগফল প্রথম প্রকার চায়ের প্রতি কিলোগ্রামে লাভের পরিমাণ নির্দেশ করে। আবার দ্বিতীয় প্রকার চায়ের প্রতি কিলোগ্রামের মূল্য থেকে মিশ্রিত চায়ের 1 কিলোগ্রামের মূল্য বিয়োগ করে দ্বিতীয় প্রকার চায়ে প্রতি কিলোগ্রামে কতটা ক্ষতি বের কর। এখন দুরকম চা এমন পরিমাণে মেশাতে হবে যাতে প্রথম প্রকার চায়ে মোট লাভ = দ্বিতীয় প্রকার চায়ে মোট ক্ষতি হয়। অর্থাৎ,

প্রথম প্রকার চায়ে 1 কিলোগ্রামে লাভ × প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)
= দ্বিতীয় প্রকার চায়ে 1 কিলোগ্রামে ক্ষতি × দ্বিতীয় প্রকার চায়ের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)

$$\frac{\text{প্রথম প্রকার চায়ের মোট পরিমাণ}}{\text{দ্বিতীয় প্রকার চায়ের মোট পরিমাণ}} = \frac{\text{দ্বিতীয় প্রকার চায়ে প্রতি কিলোগ্রামে ক্ষতি}}{\text{প্রথম প্রকার চায়ে প্রতি কিলোগ্রামে লাভ}}$$

লক্ষ্য কর, প্রথম প্রকার চায়ের কথা বাঁদিকে পূর্ব রাশিতে আছে, কিন্তু ডানদিকে উত্তর রাশিতে আছে। আবার দ্বিতীয় প্রকার চায়ের কথা বাঁদিকে উত্তর রাশিতে আছে, কিন্তু ডানদিকে পূর্ব রাশিতে আছে। অতএব দুরকম চায়ের পরিমাণের অনুপাত তাদের প্রতি কিলোগ্রামে লাভ বা ক্ষতির **ব্যস্তানুপাতী**।

সমাধান ঃ

প্রথম প্রকার চায়ের 1 kg-র মূল্য 20 টাকা
দ্বিতীয় 1 kg-র ” 35 টাকা
মিশ্রিত চায়ের 1 kg-র 25 টাকা

এখন, প্রথম প্রকার চা প্রতি কিলোগ্রাম 25 টাকা দরে বিক্রি করলে 1 কিলোগ্রামে লাভ

= (25 − 20) টাকা = 5 টাকা

আবার দ্বিতীয় প্রকার চা প্রতি কিলোগ্রাম 25 টাকা দরে বিক্রি করলে 1 কিলোগ্রামে ক্ষতি

= (35 − 25) টাকা = 10 টাকা

এখন দুরকম চা এমন পরিমাণে মেশাতে হবে যেন প্রথম প্রকার চায়ে মোট লাভ = দ্বিতীয় প্রকার চায়ে মোট ক্ষতি হয়।

এখন, প্রথম প্রকার 1 কিগ্রা. চায়ে লাভ × প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)
= দ্বিতীয় প্রকার 1 কিগ্রা. চায়ে ক্ষতি × দ্বিতীয় প্রকার চায়ের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)

5 × প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ = 10 × দ্বিতীয় প্রকার চায়ের পরিমাণ

$$\frac{\text{প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ}}{\text{দ্বিতীয় প্রকার চায়ের পরিমাণ}} = \frac{10}{5} = \frac{2}{1}$$ (বজ্রগুণন করে)

∴ নির্ণেয় অনুপাত 2 1

উত্তর ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের চা 2 : 1 অনুপাতে মেশাতে হবে।

অনুশীলনের জন্য ঃ প্রতি কিলোগ্রাম 3 টাকা ও 3 টাকা 90 পয়সা দরের চাল

কি অনুপাতে মেশালে মেশান চালের 1 কিলোগ্রামের মূল্য 3 টাকা 40 পয়সা হবে ?

[উত্তর 5 : 4]

[K. C. Nag—প্রশ্নমালা 6-এর 6 নম্বর অঙ্ক দেখ। K. P. Bose—প্রশ্নমালা 6-এর 1 নম্বর অঙ্ক দেখ।]

আলোচনা ঃ 1 নম্বর প্রশ্নে 4টি বিষয় আছে—

1. প্রথম প্রকার দ্রব্যের দর
2. দ্বিতীয় প্রকার দ্রব্যের দর
3. মেশান দ্রব্যের দর
4. মিশ্রণে দুটি দ্রব্যের অনুপাত

প্রথম তিনটি দেওয়া ছিল ; চতুর্থটি বের করতে হয়েছিল। এখন এই চারটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন তিনটি দেওয়া থাকলে অবশিষ্টটি বের করা যায়।

প্রথমে ধরা যাক (1), (2) ও (4) নম্বরের বিষয়গুলো দেওয়া আছে, (3) নম্বরের বিষয়টি বের করতে হবে। অর্থাৎ 1 নম্বরের প্রশ্নটি যদি এভাবে থাকত,—প্রতি কিলোগ্রাম 20 টাকা দরের চায়ের সঙ্গে প্রতি কিলোগ্রাম 35 টাকা দরের চা 2 : 1 অনুপাতে মেশালে মিশ্রিত চায়ের দর কত হবে ?

পদ্ধতি ঃ দুরকম চায়ের অনুপাতের সংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে তাদের পরিমাণ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ধর x দিয়ে গুণ করলে তাদের পরিমাণ (কিলোগ্রাম এককে) পাওয়া যাবে। 1 কি.গ্রা.-র মূল্যকে এই পরিমাণ দিয়ে গুণ করলে মোট মূল্য পাওয়া যাবে। এইভাবে দুরকম চায়ের মোট মূল্য বের করে তাদের যোগ কর। এই যোগফল মিশ্রিত চায়ের মোট মূল্য হবে। এবার মিশ্রিত চায়ের মোট ওজন বের কর এবং মিশ্রিত চায়ের মোট মূল্যকে মোট ওজন দিয়ে ভাগ করলে একক ওজনের অর্থাৎ 1 কিলোগ্রামের মূল্য পাওয়া যাবে।

সমাধান ঃ

প্রথম প্রকার চায়ের 1 কি.গ্রা.-র মূল্য 20 টাকা
দ্বিতীয় 1 কি.গ্রা.-র ,, 35 টাকা
মিশ্রিত চায়ের 1 কি.গ্রা -র 25 টাকা

মিশ্রণে দুরকম চায়ের পরিমাণের অনুপাত 2 : 1

মনে করি প্রথম প্রকার চা $2x$ কি.গ্রা. এবং দ্বিতীয় প্রকার চা x কি.গ্রা আছে।

মিশ্রিত চায়ের মোট ওজন $= (2x + x)$ কি.গ্রা. $= 3x$ কি.গ্রা.

এখন 1 কি.গ্রা. প্রথম প্রকার চায়ের মূল্য 20 টাকা

$2x$ কি.গ্রা. ,, $= 20 \times 2x$ টা. $= 40x$ টা.

আবার 1 কি.গ্রা. দ্বিতীয় $= 35$ টা.

x কি.গ্রা. $= 35x$ টা.

মিশ্রিত চায়ের মোট মূল্য $= (40x + 35x)$ টাকা $= 75x$ টাকা

$3x$ কি.গ্রা. মিশ্রিত চায়ের মূল্য $= 75x$ টাকা

1 কি.গ্রা. $= \frac{75x}{3x}$ টাকা $= 25$ টাকা

উত্তর ঃ 1 কি.গ্রা. মিশ্রিত চায়ের মূল্য 25 টাকা।

অনুশীলনের জন্য ঃ প্রতি কুইণ্টাল 150 টাকা ও 200 টাকা দরের দুরকম গম

2 : 3 অনুপাতে মেশালে প্রতি কুইন্টাল মিশ্রিত গমের মূল্য কত হবে ? [উঃ 180 টা.]

[K. C. Nag প্রশ্নমালা 6-এর 1 নম্বরের অঙ্কটি দেখ]

আলোচনা ঃ আগের আলোচনার সূত্র ধরে এগোন যাক। ধর 1 ও 2 নম্বরের যে কোন একটি বিষয় এবং 3 ও 4 নম্বরের বিষয়গুলো দেওয়া আছে। বের করতে হবে 1 ও 2 নম্বরের মধ্যে যে বিষয়টি দেওয়া নাই। অর্থাৎ 1 নম্বরের প্রশ্নটি যদি এভাবে থাকত— প্রতি কিলোগ্রাম 20 টাকা দরের চায়ের সঙ্গে প্রতি কিলোগ্রাম কত টাকার দরের চা 2 : 1 অনুপাতে মেশালে প্রতি কিলোগ্রাম মিশ্রিত চায়ের মূল্য 25 টাকা হবে ?

পদ্ধতি ঃ কতকগুলো রাশির অনুপাতের সংখ্যাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করে রাশিগুলো পাওয়া যায়। এখানে দুরকম চায়ের অনুপাতের সংখ্যাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা x দিয়ে গুণ করলে দুরকম চায়ের পরিমাণ পাওয়া যাবে ধরে নাও। এবার মিশ্রিত চায়ের 1 কি গ্রা.-র মূল্য থেকে প্রথম প্রকার চায়ের 1 কি.গ্রা.র মূল্য কত কম বিয়োগ করে দেখে নাও। এই বিয়োগফলই হবে প্রথম প্রকার চায়ের প্রতি কিলোগ্রামে লাভ। অতএব প্রথম প্রকার চায়ের মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম) দিয়ে 1 কিলোগ্রামের লাভ গুণ করলে প্রথম প্রকার চায়ে মোট লাভ পাওয়া যাবে। এখন দ্বিতীয় প্রকার চায়ে মোট ক্ষতি ঐ প্রথম প্রকার চায়ের মোট লাভের সমান হবে। এই মোট ক্ষতিকে দ্বিতীয় প্রকার চায়ের মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম) দিয়ে ভাগ করলে 1 কিলোগ্রামে ক্ষতির পরিমাণ পেয়ে যাবে। এবার মিশ্রিত চায়ের 1 কিলোগ্রামের মূল্যর সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকার চায়ের 1 কিলোগ্রামের ক্ষতি যোগ করলে দ্বিতীয় প্রকার চায়ের 1 কিলোগ্রামের মূল্য পাওয়া যাবে।

সমাধান ঃ

প্রথম প্রকার চায়ের 1 কিলোগ্রামের মূল্য = 20 টাকা

দ্বিতীয় 1 " = ?

মিশ্রিত 1 = 25 টাকা

এই দুরকম চা 2 : 1 অনুপাতে মেশান হয়েছে।

মনে করি প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ = $2x$ কি.গ্রা.

দ্বিতীয় = x কি.গ্রা.

এখন প্রথম প্রকার চা প্রতি কিলোগ্রাম 25 টাকা দরে বিক্রী করলে 1 কিলোগ্রামে লাভ $= (25 - 20)$ টাকা $= 5$ টাকা।

$2x$ কিলোগ্রাম প্রথম প্রকার চায়ে লাভ $= 5 \times 2x$ টা.

$= 10x$ টাকা

দ্বিতীয় প্রকার চায়ে মোট ক্ষতি $= 10x$ টাকা

অর্থাৎ x কি.গ্রা. দ্বিতীয় প্রকার চায়ের মোট ক্ষতি $= 10x$ টাকা

1 কি.গ্রা. $= \frac{10x}{x}$ টাকা

$= 10$ টাকা

দ্বিতীয় প্রকার চায়ের প্রতি কিলোগ্রামের মূল্য $= (25 + 10)$ টাকা $= 35$ টাকা।

উত্তর ঃ প্রতি কিলোগ্রাম দ্বিতীয় প্রকার চায়ের মূল্য 35 টাকা।

অনুশীলনের জন্য ঃ প্রতি কিলোগ্রাম 3·20 টাকা দরের চিনির সঙ্গে প্রতি

কিলোগ্রাম কত টাকা দরের চিনি 3 : 2 অনুপাতে মেশালে প্রতি কিলোগ্রাম মিশ্রিত চিনির মূল্য 4 টাকা হবে ? [উত্তর : 5 টা. 20 পয়সা]

[K. C. Nag প্রশ্নমালা 6-এর 4 ও 5 নম্বর অঙ্ক দেখ]

জটিলতা বৃদ্ধি : এখন ধর 1 নম্বর প্রশ্নে যেমন দুরকম চায়ের দর দেওয়া আছে সেসব দেওয়া থাকল, কিন্তু মিশ্রিত চায়ের দর না দিয়ে বিক্রয়মূল্য এবং শতকরা লাভ দেওয়া থাকল। বের করতে হবে মিশ্রণে দুরকম চায়ের অনুপাত। অর্থাৎ 1 নম্বর প্রশ্নটি যদি এভাবে থাকত - প্রতি কিলোগ্রাম 20 টাকা দরের চায়ের সঙ্গে প্রতি কিলোগ্রাম 35 টাকা দরের চা কি অনুপাতে মিশিয়ে মিশ্রিত চা প্রতি কিলোগ্রাম 31 টাকা দরে বিক্রি করলে 24% লাভ হবে ?

পদ্ধতি ব্যাখ্যা : প্রথম সমস্যা থেকে এই প্রশ্নের সমস্যার পার্থক্য হল—এক্ষেত্রে মিশ্রিত দ্রব্যের দর বা পড়তা দেওয়া নেই। দেওয়া আছে বিক্রয়মূল্য। এছাড়া দেওয়া আছে শতকরা লাভ। এই লাভ কোন মূল্যের ওপর শতকরা হিসাব করা হয়েছে সেটা বুঝতে পারলেই অঙ্ক সহজ হবে। এই লাভ মিশ্রিত দ্রব্যের দর বা পড়তার ওপর শতকরা হিসাব অনুসারে কষা আছে। কাজেই ঐকিক নিয়মে মিশ্রিত দ্রব্যের দর বা পড়তা বের করা যাবে। যেই মিশ্রিত দ্রব্যের দর বা পড়তা পেয়ে গেলে অমনি অঙ্কটি 1 নম্বর প্রশ্নের মত দাঁড়াল। অর্থাৎ এরপর প্রথম সমস্যাটি যেভাবে সমাধান করা হয়েছে সেইভাবেই সমাধান করতে হবে।

সমাধান : মিশ্রিত চা প্রতি কিলোগ্রাম 31 টাকায় বিক্রি করলে 24% লাভ হয়।

এখন $(100+24)$ টাকা $= 124$ টাকা

124 টাকা বিক্রয় মূল্য হলে পড়তা $= 100$ টাকা হবে

1 $= \frac{100}{124}$ টাকা

31 $= \frac{100}{124} \times 31$ টাকা হবে $\left(= \frac{25}{4} \times 4\right)$

$= 25$ টাকা হবে।

1 কিলোগ্রাম মিশ্রিত চায়ের পড়তা দর $= 25$ টাকা

এখন প্রথম প্রকার চা প্রতি কিলোগ্রাম 25 টাকায় বিক্রি করলে 1 কি.গ্রামে লাভ হবে $(25-20)$ টা. $= 5$ টাকা। আবার দ্বিতীয় প্রকার চা প্রতি কিলোগ্রাম 25 টাকায় বিক্রি করলে 1 কি.গ্রামে ক্ষতি হবে $(35-25)$ টা. $= 10$ টাকা। এবার দুরকম চা এমনভাবে মেশাতে হবে যেন—

প্রথম প্রকার চায়ে মোট লাভ = দ্বিতীয় প্রকার চায়ে মোট ক্ষতি হয়।

অর্থাৎ 1 কি.গ্রা. প্রথম প্রকার চায়ে লাভ × এই প্রকার চায়ের মোট পরিমাণ (কি.গ্রামে)

= 1 কি.গ্রা. দ্বিতীয় প্রকার চায়ে ক্ষতি × এই প্রকার চায়ের মোট পরিমাণ (কি.গ্রামে)

or, 5 × প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ = 10 × দ্বিতীয় প্রকার চায়ের পরিমাণ

$$\frac{\text{প্রথম প্রকার চায়ের পরিমাণ}}{\text{দ্বিতীয় প্রকার চায়ের পরিমাণ}} = \frac{10}{5} = \frac{2}{1}$$

নির্ণেয় অনুপাত 2 : 1

উত্তর ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের চা 2 : 1 অনুপাতে মেশাতে হবে।

বীজগণিত

বীজগণিতে আজ আমরা সরল সমীকরণের সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমে জানা দরকার সমীকরণ কি, কখন সেটি সরল হবে এবং তার সমাধানই বা কি?

ধর $x^2 - 6x$ এবং $2x + 20$ এই দুটি বীজগাণিতিক রাশির মান সমান। এই দুটি রাশির একটিতে বা দুটিতেই একটি অজ্ঞাত রাশি আছে। সেটি হল x. এখন এই দুটি রাশিকে সমান চিহ্নের দু পাশে লিখলে একটি সমীকরণ হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমীকরণটি হল, $x^2 - 6x = 2x + 20$.

একইভাবে $2x + 2 = 11 - x$-ও একটি সমীকরণ। সমীকরণ সমাধানের অর্থ হল অজ্ঞাত রাশি x-এর মান নির্ণয় করা। তোমরা যদি কলেজে অঙ্ক নিয়ে পড়, তখন জানতে পারবে যে এই ধরনের সমীকরণে x-এর বৃহত্তম ঘাত বা power যত ততগুলো x এর মান পাওয়া যায়। এখন ওপরের দুটি উদাহরণে প্রথমটিতে x-এর বৃহত্তম ঘাত 2 (কারণ x^2 আছে)। অতএব x-এর দুটি মান পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় উদাহরণে x-এর বৃহত্তম ঘাত 1, অতএব x-এর একটিমাত্র মান পাওয়া যাবে। **যে সমীকরণে x-এর বৃহত্তম ঘাত 1, অর্থাৎ x-এর একটি মান পাওয়া যাবে, সেই ধরনের সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে।**

সরল সমীকরণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ তথ্য

দুটি সমান রাশির উভয়কে একই সংখ্যা বা একই রাশি দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাও সমান হয়। অতএব সমীকরণে সমান চিহ্নের উভয়পক্ষকে একই সংখ্যা বা রাশি দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করা যায়।

সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি

1. প্রথম কাজ হল = চিহ্নের উভয়পক্ষের রাশিকে সরল করা।

2. দ্বিতীয় কাজ হল পক্ষান্তর করা। এক বা একাধিক পদ নিয়ে বীজগণিতে একটি রাশি সৃষ্টি হয়। যেমন x^2 এবং $2x$ এই দুটি পদ নিয়ে $x^2 + 2x$ একটি রাশি তৈরি হল। = চিহ্নের বাঁদিকের পদগুলোকে বামপক্ষের পদ এবং ডানদিকের পদগুলোকে ডানপক্ষের পদ বলে। যে কোন পদকে এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে নেওয়া যায়। এই পক্ষান্তরের সময় যে পদটি পক্ষান্তর করা হয় তার চিহ্ন পাল্টাতে হয়। অর্থাৎ + থাকলে − আবার − থাকলে + করতে হয়।

কিন্তু নিয়ম বললেই কি মেনে নেওয়া যায়! নিয়মের স্বপক্ষে যুক্তি থাকা চাই। প্রথম কাজটি স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মেনে নেওয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সমীকরণ সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য থেকেই এর স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করান যায়। আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণটির কথাই ধরা যাক।

$$2x + 2 = 11 - x$$

ডানপক্ষের $-x$ কে বামপক্ষে আনতে হলে নিয়ম অনুসারে $+x$ লিখতে হবে। আবার বামপক্ষের $+2$ কে ডানপক্ষে নিতে হলে -2 লিখতে হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } 2x+x=11-2\cdots\cdots(1)$$

সাধারণ তথ্য থেকেই আমরা জানি যে উভয়পক্ষে একই সংখ্যা বা রাশি যোগ বা বিয়োগ করা যায়। এখন $2x+2=11-x$-এর উভয়পক্ষে x যোগ করলে

$$2x+x+2=11-x+x=11 \text{ হয়}$$

আবার উভয়পক্ষে 2 বিয়োগ করলে

$$2x+x+\not{2}-\not{2}=11-2$$

$$\text{or, } 2x+x=11-2\cdots\cdots(2) \text{ হল}$$

এবার (1) নম্বর ও (2) নম্বর সমীকরণ মিলিয়ে দেখ। একই ব্যাপার হল। কাজেই পক্ষান্তরের কাজটি আমরা করতে পারি। কিন্তু কোন একটি পদ একই চিহ্নসহ দু পক্ষেই থাকে তবে পক্ষান্তর না করেই তাদের কেটে দেওয়া যায়। কারণ পক্ষান্তর করলে ত একই পদ দুবার বিপরীত চিহ্নসহ থাকবে। অর্থাৎ কাটাকাটি যাবে। যেমন

$$x^2+2x-3=x^2+5$$

x^2 দুদিকে একই চিহ্নসহ আছে। অতএব এটি কেটে যাবে!

$$\not{x^2}+2x-3=\not{x^2}+5$$

$$\text{or, } 2x-3=5\cdots\cdots(3)$$

দেখ ডানদিকের x^2 কে বাঁদিকে পক্ষান্তর করলে—

$$x^2+2x-3-x^2=5$$

$$\text{or, } 2x-3=5\cdots\cdots(4)$$

(3) ও (4) মিলিয়ে দেখ। একই ব্যাপার হল। তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক। অর্থাৎ দুদিকে একই চিহ্নসহ একই পদ থাকলে সেগুলো কাটা যায়। না কেটে পরের Step-এ বাদ দেওয়াই ভাল। এখন প্রশ্ন হল—কোন পদগুলো কোনদিকে পক্ষান্তর করব এবং কোন পদগুলো পক্ষান্তর করব না!

a. x যুক্ত পদগুলোকে ডানপক্ষ থেকে বামপক্ষে আনতে হবে এবং x ছাড়া অন্যান্য পদগুলোকে বামপক্ষ থেকে ডানপক্ষে আনতে হবে।

b. যে সব x যুক্ত পদ বামপক্ষেই আছে সেগুলোকে পক্ষান্তর করতে হবে না। আবার x ছাড়া অন্যান্য যে সব পদগুলো ডানপক্ষেই আছে সেগুলোও পক্ষান্তর করতে হবে না।

3. তৃতীয় কাজ হল পক্ষান্তরের পর দুদিকের রাশিকে আবার সরল করা।

4. চতুর্থ কাজ হল ডানপক্ষের সরল করা সংখ্যাটিকে x-এর সহগ দিয়ে ভাগ করা। ঐ ভাগফলই হবে x-এর মান। নিয়মগুলো বার বার পড়।

1 নম্বরে অর্থাৎ প্রথম কাজে আমরা আলোচনা করেছি যে বাম ও ডান উভয় পক্ষে রাশিগুলোর আকার অনুসারে উভয় পক্ষকে সরল করতে হবে। এখন আমরা এই আকারের বিভিন্নতায় এক এক ধরনের যে সরল সমীকরণ হবে সেগুলো আমরা আলোচনা করব এবং সমাধান করব। সমাধানের সাধারণ পদ্ধতি ত জানাই রইল।

1. রাশিগুলো উৎপাদক আকারে এবং এছাড়া কিছু পদ যোগ বা বিয়োগ করা থাকতে পারে। যেমন, $(x-2)(x+3)+(x-3)(x-5)+4x=2x^2+3$

পদ্ধতি ঃ উৎপাদকগুলোকে ভাঙ্গিয়ে দাও। অর্থাৎ গুণ করে ফেল। এবার + বা চিহ্নসহ যে পদগুলো থাকল সেগুলোকে প্রয়োজনমত যোগ, বিয়োগের প্রক্রিয়া দ্বারা সরল কর। এরপর সমাধানের সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ কর।

সমাধান ঃ

$(x-2)(x+3)+(x-3)(x-5)+4x=2x^2+3$

or, $x^2+3x-2x-6+x^2-5x-3x+15+4x=2x^2+3$

[উৎপাদকগুলো গুণ করা হল]

or, $2x^2+7x-10x+9=2x^2+3$ [যোগ-বিয়োগ করা হল]

or, $7x-10x+9=3$

[দু'পক্ষ থেকে $2x^2$ বাদ গেল, ফলে বোঝা গেল এটি সরল সমীকরণ]

or, $-3x+9=3$ [আরও সরল করা হল]

or, $-3x=3-9$ [পক্ষান্তর করা হল]

or, $-3x=-6$ [$3-9=-6$ হল]

or, $3x=6$ [দুদিক থেকে − বাদ গেল]

$x=\frac{6}{3}=2$ [ডানপক্ষের সাংখ্যমান 6-কে x-এর সহগ দিয়ে ভাগ করা হল]

উত্তর ঃ $x=2$

আলোচনা ঃ তৃতীয় ব্র্যাকেটের অংশগুলো বোঝার জন্য। এগুলো লিখবে না।

2. রাশিগুলো বীজগাণিতিক সূত্রের আকারে থাকল ; এ ছাড়া কিছু পদ যোগ বা বিয়োগ করা থাকতে পারে। আবার কিছু পদ উৎপাদক আকারেও থাকতে পারে। বীজগাণিতিক সূত্র বলতে এগুলোকে বোঝায়—

1. $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
2. $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

......ইত্যাদি

উদাহরণ ঃ $(x+3)^2-(x+2)(x-4)-7x=15-x$

পদ্ধতি ঃ যেখানে সূত্র প্রয়োগ করা যায় সেখানে সূত্র প্রয়োগ করবে। উৎপাদক আকারের রাশিগুলো গুণ করবে। তারপর যোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়া দ্বারা সরল করবে। এরপর সমাধানের সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ কর।

সমাধান ঃ

$(x+3)^2-(x+2)(x-4)--7x=15-x$

or, $x^2+2.x.3+3^2-(x^2-4x+2x-8)-7x=15-x$

[প্রথম পদটিকে $(a+b)^2$-এর ফরমূলায় ফেলা হল। উৎপাদক অংশটি গুণ করা হল]

or, $x^2+6x+9-(x^2-2x-8)-7x=15-x$

or, $x^2+6x+9-x^2+2x+8-7x=15-x$

[ব্র্যাকেট তুলে নেওয়া হল। ব্র্যাকেটের আগে − চিহ্ন থাকায় প্রত্যেকটির চিহ্ন পাল্টে গেল]

or, $8x-7x+17=15-x$ [যোগ প্রক্রিয়া করা হল]

or, $x+17=15-x$ [আরও সরল করা হল]

or, $x+x=15-17$ [পক্ষান্তর করা হল]

or, $2x=-2$ [সরল করা হল]

$x=\frac{-2}{2}=-1$

[ডানপক্ষের সাংখ্যমানকে x-এর সহগ দিয়ে ভাগ করা হল]

উত্তর ঃ $x=-1$

আলোচনা ঃ দ্বিতীয় লাইনে উৎপাদক অংশটির আগে – চিহ্ন আছে বলে ব্র্যাকেটের মধ্যে গুণ করা হল। এ না করলে চিহ্নের গণ্ডগোল হতে পারে।

3. উভয় পক্ষের রাশিগুলো ভগ্নাংশ আকারে আছে। এর মধ্যে লবগুলো সব ক্ষেত্রে x-যুক্ত পদ এবং হরগুলো সাংখ্যমান যুক্ত পদ। এ ছাড়া কোন সাংখ্যপদ বা x-যুক্তপদ + বা চিহ্নসহ থাকতে পারে।

উদাহরণ ঃ $\frac{2x}{3}-\frac{x}{21}+\frac{x}{14}-2=\frac{x}{7}+3x-1$

পদ্ধতি ঃ উভয় পক্ষের হরগুলোর ল. সা. গু. নির্ণয় কর। এই ল. সা. গু. দিয়ে সব কটি পদকে গুণ কর। ভগ্নাংশগুলোর হর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কেটে যাবে। এর পর সমাধানের সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ কর।

সমাধান ঃ

$\frac{2x}{3}-\frac{x}{21}+\frac{x}{14}-2=\frac{x}{7}+3x-1$

এখানে হরগুলোর ল. সা. গু. $=42$;

উভয় পক্ষকে 42 দিয়ে গুণ করে পাই

$$\begin{array}{r|l} 3 & 3,\ 21,\ 14,\ 7 \\ \hline 7 & 1,\ 7,\ 14,\ 7 \\ \hline & 1,\ 1,\ 2,\ 1 \end{array}$$

$3\times7\times2=42$

$$\frac{2x}{\cancel{3}}\times\overset{14}{\cancel{42}}-\frac{x}{\cancel{21}}\times\overset{2}{\cancel{42}}+\frac{x}{\cancel{14}}\times\overset{3}{\cancel{42}}-2\times42=\frac{x}{\cancel{7}}\times\overset{6}{\cancel{42}}+3x.42-1.42$$

or, $28x-2x+3x-84=6x+126x-42$

[কাটাকাটির পর গুণ করা হল]

or, $31x-2x-84=132x-42$ [সরল করা হল]

or, $29x-84=132x-42$ [আরও সরল করা হল]

or, $29x-132x=-42+84$ [পক্ষান্তর করা হল]

or, $-103x=42$ [সরল করা হল]

$x=-\frac{42}{103}=-\frac{42}{103}$

[ডানদিকের সাংখ্যমান 42-কে x-এর সহগ -103 দিয়ে ভাগ করা হল]

উত্তর ঃ $x=-\frac{42}{103}$

4. উভয় পক্ষের রাশিগুলো ভগ্নাংশ আকারের ; কিন্তু লবগুলো আগের মত শুধু

x না হয়ে x-যুক্ত বীজগাণিতিক রাশি হবে, যেমন, $-x-4, 2x+3$ ইত্যাদি। অবশ্য হরগুলো আগের মত সাংখ্যমান যুক্তই থাকবে। এ ছাড়া কোন পদ + বা − চিহ্নসহ থাকতে পারে।

উদাহরণ : $\frac{2+x}{4}-\frac{x-3}{2}-\frac{x-2}{3}+2=\frac{x+1}{6}+1$

পদ্ধতি : (3) নম্বরের মত পদ্ধতি হবে।

সমাধান :

$$\frac{2+x}{4}-\frac{x-3}{2}-\frac{x-2}{3}+2=\frac{x+1}{6}+1$$

হরগুলোর ল. সা. গু. 12 ; 12 দিয়ে উভয় পক্ষকে গুণ করে পাই,

$$\overset{3}{\cancel{12}}\times\left(\frac{2+x}{\cancel{4}}\right)-\overset{6}{\cancel{12}}\times\left(\frac{x-3}{\cancel{2}}\right)-\overset{4}{\cancel{12}}\times\left(\frac{x-2}{\cancel{3}}\right)+12\times2$$

$$=\overset{2}{\cancel{12}}\times\left(\frac{x+1}{\cancel{6}}\right)+12\times1$$

or, $3(2+x)-6(x-3)-4(x-2)+24=2(x+1)+12$

or, $6+3x-6x+18-4x+8+24=2x+2+12$

[ব্র্যাকেটের অংশগুলো গুণ করে ভাঙান হল]

or, $56+3x-10x=2x+14$ [সরল করা হল]

or, $56-7x=2x+14$ [আরও সরল করা হল]

or, $-7x-2x=14-56$ [পক্ষান্তর করা হল]

or, $-9x=-42$

or, $9x=42$ [উভয় দিক থেকে − বাদ গেল]

$$x=\frac{\overset{14}{\cancel{42}}}{\underset{3}{\cancel{9}}}=\frac{14}{3}=4\frac{2}{3}$$

[ডানদিকের সাংখ্যমানকে x-এর সহগ দিয়ে ভাগ করা হল]

উত্তর : $x=4\frac{2}{3}$

5. উভয় পক্ষে একটি মাত্র ভগ্নাংশ আকারের রাশি আছে।

উদাহরণ : $\frac{x-5}{2x-3}=\frac{x+4}{2x-4}$

পদ্ধতি : প্রথমে বজ্রগুণন করতে হবে। এর পর উভয় দিকের রাশি যে ধরনের আকারে পরিণত হবে সেই অনুসারে (1) বা (2) নম্বরের পদ্ধতি অনুসারে সরল করে সমাধান করতে হবে।

এবার বজ্রগুণন ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা যাক। ধর $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

এখানে উভয়পক্ষ ভগ্নাংশ আকারের। হরগুলির ল.সা.গু. bd দিয়ে উভয়পক্ষকে গুণ করলে পাওয়া যায়,

$$\cancel{b}d.\frac{a}{\cancel{b}} = b\cancel{d}.\frac{c}{\cancel{d}}$$

$$\text{or} \quad ad = bc$$

এখন বামপক্ষের লব a এবং হর b এবং ডানপক্ষের লব c এবং হর d। তাহলে $ad = bc$-র অর্থ হল বামপক্ষের লব $\times$ ডানপক্ষের হর $=$ ডানপক্ষের লব $\times$ বামপক্ষের হর।

এটিকে সূত্র হিসাবে ধরে, এটিকে প্রয়োগ করাকে বজ্রগুণন করা বলা হয়। একে ইংরাজিতে বলে cross multiplication.

দেখ

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$$

তীর চিহ্নের দিকে হরগুলোর পক্ষান্তর হচ্ছে। এই দুটি তীর মাঝখানে ছেদ করছে অর্থাৎ cross করছে। এই বজ্রগুণনে $ad = bc$ না লিখে $bc = ad$-ও লেখা যায়।

সমাধান ঃ $\frac{x-5}{2x-3} = \frac{x+4}{2x-4}$

or, $(2x-4)(x-5) = (2x-3)(x+4)$

[বজ্রগুণন করা হল]

or, $2x^2 - 10x - 4x + 20 = 2x^2 + 8x - 3x - 12$

[গুণ করা হল]

or, $2x^2 - 14x + 20 = 2x^2 + 5x - 12$

[সরল করা হল]

or, $-14x + 20 = 5x - 12$

[$2x^2$ উভয়পক্ষ থেকে বাদ গেল]

or, $-14x - 5x = -12 - 20$

[পক্ষান্তর করা হল]

or, $-19x = -32$

[সরল করা হল]

or, $19x = 32$

[উভয়পক্ষ থেকে $-$ বাদ গেল]

$$x = \frac{32}{19} = 1\frac{13}{19}$$

[ডান দিকের সাংখ্যমান 32 কে x-এর সহগ 19 দিয়ে ভাগ করা হল]

উত্তর ঃ $x = 1\frac{13}{19}$

6. উভয়পক্ষে একটি করে ভগ্নাংশ ছাড়া $+$ বা $-$ চিহ্নসহ সাংখ্যমান থাকতে পারে।

উদাহরণ ঃ $\frac{2x+4}{x-1} = 2 - \frac{2}{x-3}$

পদ্ধতি ঃ এ ক্ষেত্রে তোমরা নিচের ক্লাসে পাটীগণিতে ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ যেভাবে করেছ সেইভাবে সরল করে নিয়ে 5 নম্বরের পদ্ধতি অনুসরণ কর।

সমাধান ঃ $\frac{2x+4}{x-1}=2-\frac{2}{x-3}$

or, $\frac{2x+4}{x-1}=\frac{2(x-3)-2}{x-3}$

[ডানপক্ষে পাটিগণিতের নিয়মে সরল করা হল]

or, $\frac{2x+4}{x-1}=\frac{2x-6-2}{x-3}$

[ডান দিকের লব সরল করা হল]

or, $\frac{2x+4}{x-1}=\frac{2x-8}{x-3}$

[ডান দিকের লব আরও সরল করা হল]

or, $(2x+4)(x-3)=(2x-8)(x-1)$

[বজ্রগুণন করা হল]

or, $2x^2-6x+4x-12=2x^2-2x-8x+8$

[উৎপাদকগুলো ভাঙান হল]

or, $2x^2-2x-12=2x^2-10x+8$

[উভয়পক্ষ সরল করা হল]

or, $-2x-12=-10x+8$

[উভয়পক্ষ থেকে $2x^2$ বাদ গেল]

or, $-2x+10x=8+12$

[পক্ষান্তর করা হল]

or, $8x=20$

[সরল করা হল]

$x=\frac{20}{8}=\frac{5}{2}=2\frac{1}{2}$

[ডানপক্ষের সাংখ্যমান 20 কে x-এর সহগ 8 দ্বারা ভাগ করা হল]

উত্তর ঃ $x=2\frac{1}{2}$

7. x ছাড়া সাংখ্যমানের অংশগুলো দশমিক ভগ্নাংশ আকারে থাকলে।

উদাহরণ ঃ $\cdot5x+\frac{\cdot02x+\cdot07}{\cdot03}=9\cdot5+\frac{x+2}{9}$

পদ্ধতি ঃ দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত কর। এর পর ওপরের 1 থেকে 6 নম্বর পর্যন্ত যে পদ্ধতিটি খাটবে সেটি প্রয়োগ করবে।

সমাধান ঃ $\cdot5x+\frac{\cdot02x+\cdot07}{\cdot03}=9\cdot5+\frac{x+2}{9}$

$$\text{or, } \frac{5}{10}x + \frac{\frac{2}{100}x + \frac{7}{100}}{\frac{3}{100}} = \frac{95}{10} + \frac{x+2}{9}$$

[দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করা হল]

$$\text{or, } \frac{1}{2}x + \frac{\frac{2x+7}{100}}{\frac{3}{100}} = \frac{19}{2} + \frac{x+2}{9}$$

[বামপক্ষের দ্বিতীয় পদের লবকে সরল করা হল]

$$\text{or, } \frac{x}{2} + \frac{2x+7}{100} \div \frac{3}{100} = \frac{19}{2} + \frac{x+2}{9}$$

[বামপক্ষের দ্বিতীয় পদকে সরল করা হচ্ছে]

$$\text{or, } \frac{x}{2} + \frac{(2x+7)}{100} \times \frac{100}{3} = \frac{19}{2} + \frac{(x+2)}{9}$$

[বামপক্ষের দ্বিতীয় পদকে সরল করা হচ্ছে]

$$\text{or, } \frac{x}{2} + \frac{2x+7}{3} = \frac{19}{2} + \frac{x+2}{9}$$

হরগুলোর ল.সা.গু. = 18 ; 18 দিয়ে উভয়পক্ষকে গুণ করে পাই,

$$18 \times \frac{x}{2} + 18 \times \frac{2x+7}{3} = 18 \times \frac{19}{2} + 18 \times \frac{x+2}{9}$$

$$\text{or, } 9x + 6(2x+7) = 171 + 2(x+2)$$

$$\text{or, } 9x + 12x + 42 = 171 + 2x + 4$$

[ব্র্যাকেট ওঠান হল]

$$\text{or, } 21x + 42 = 2x + 175$$

[সরল করা হল]

$$\text{or, } 21x - 2x = 175 - 42$$

[পক্ষান্তর করা হল]

$$\text{or, } 19x = 133$$

[সরল করা হল]

$$x = \frac{133}{19} = 13$$

[ডানপক্ষের সাংখ্যমান 133 কে x-এর সহগ 19 দিয়ে ভাগ করা হল ।]

উত্তর ঃ $x = 13$

অনুশীলনের জন্য ঃ

1. $(x+4)(x-5)+(x-3)(x+7)=2(x+1)(x+3)-4x$ [উঃ $x=-47$]
2. $(x-2)^2+(x-3)^2-3x=(x+2)(x+5)+x^2+7$ [উঃ $x=1$]

3. $\frac{2x}{3}+\frac{5x}{12}-\frac{3x}{4}+2=\frac{x}{6}+3$ [উঃ $x=6$]

4. $\frac{x-2}{3}+\frac{x+3}{6}-2=\frac{x-4}{2}-x$ [উঃ $x=\frac{1}{6}$]

5. $\frac{3x-2}{2x-3}=\frac{6x+1}{4x+3}$ [উঃ $x=\frac{3}{17}$]

6. $\frac{3x+4}{x+2}=5-\frac{2x-3}{x-3}$ [উঃ $x=-12$]

7· $\cdot02x+x+1\cdot32x=1\cdot17$ [উঃ $x=\cdot5$]

* এছাড়া যে কোন পাঠ্য বই-এর অঙ্কগুলো কষবে।

জ্যামিতি

আমরা যে দুটি শর্তে সামান্তরিক সমূহের ক্ষেত্রফল সমান হয় সেগুলো দুটি উপপাদ্যের মাধ্যমে আলোচনা করে জ্যামিতি পুনরালোচনা করেছি আজ আবার দুটি উপপাদ্য আলোচনা করব। এই দুটি উপপাদ্যে ত্রিভুজ সমূহের ক্ষেত্রফল সমান হওয়ার শর্ত পাওয়া যাবে। মনে রেখ, লেখার জন্য অংশটি তোমাদের খাতায় লিখবে, কিন্তু আলোচনার জন্য অংশটি লিখবে না; শুধু বুঝবে।

প্রথম উপপাদ্য

লেখার জন্য ঃ

সূত্র ঃ যে সব ত্রিভুজ একই ভূমির ওপর এবং একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত তাদের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান। **আলোচনার জন্য** সূত্রটিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এর অর্থ পরিষ্কার করার চেষ্টা কর। দেখ, সূত্রটি এভাবে ভাঙ্গা যায়।

1. কতকগুলো ত্রিভুজ আছে। এক্ষেত্রে আমরা দুটি ত্রিভুজের কথাই ধরব।

2. ত্রিভুজ দুটি একই ভূমির ওপর অবস্থিত।

3. দুটি ত্রিভুজ দুটি সমান্তরাল সরল-রেখার মধ্যে অবস্থিত। এই দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে অবশ্যই একটি এদের সাধারণ ভূমি হবে।

4. ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

এবার এই 4টি বিষয় অনুসারে ছবি এঁকে বুঝে নেওয়া যাক।

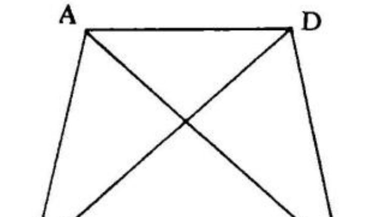

আলোচনার জন্য ঃ ঐ 4টি বিষয় ভাল করে মিলিয়ে নেওয়া যাক।

1. ABC ও DBC দুটি ত্রিভুজ।

2. দুটি ত্রিভুজই $\overline{BC}$ ভূমির ওপর অবস্থিত।

3. দুটি ত্রিভুজই $\overline{BC}$ ও $\overleftrightarrow{AD}$ এই

দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে অবস্থিত।

4. ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

এখন, সূত্রটি আবার পড়ে নিয়ে বিষয়গুলোকে দু ভাগে ভাগ কর।এক ভাগে থাকবে যে সব তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এক ভাগে থাকবে যে তথ্যটি প্রমাণ করতে হবে। এবার 4টি বিষয় থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথম তিনটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছ প্রথম তিনটি বিষয় **স্বীকার** এই হেডিং দিয়ে লিখবে এবং চতুর্থ বিষয়টি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করবে।

স্বীকার ঃ

লেখার জন্য ঃ ABC ও DBC ত্রিভুজ দুটি একই ভূমি $\overline{BC}$-র ওপর অবস্থিত এবং একই সমান্তরাল সরলরেখা দ্বয় $\overline{BC}$ ও $\overleftrightarrow{AD}$-র মধ্যে অবস্থিত।

প্রমাণ করতে হবে যে ABC ও DBC ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

আলোচনার জন্য ঃ এখানে জ্যামিতিক তথ্যটি প্রমাণ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত অঙ্কনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে B বিন্দু থেকে $\overline{CA}$-র সমান্তরাল করে $\overrightarrow{BE}$ রেখা টানা হল। এই রেখা $\overline{DA}$-র বর্ধিত অংশের সঙ্গে E বিন্দুতে মিলিত হল। ঠিক একইভাবে C বিন্দু থেকে $\overline{BD}$-র সমান্তরাল করে $\overrightarrow{CF}$ রেখা টানা হল। এই রেখা $\overline{AD}$-র বর্ধিত অংশের সঙ্গে F বিন্দুতে মিলিত হল। ফলে জ্যামিতিক চিত্রের চেহারাটা দাঁড়াল এইরকম—

[তোমাদের খাতায় যে চিত্রটি আগেই এঁকেছ সেখানেই এই অতিরিক্ত অঙ্কনটুকু করবে এবং যা আঁকলে তা **অঙ্কন** এই হেডিং দিয়ে লিখবে।

লেখার জন্য ঃ

অঙ্কন ঃ B বিন্দু থেকে $\overline{CA}$-র সমান্তরাল করে $\overrightarrow{BE}$ সরলরেখা টানা হল। এই রেখা $\overline{DA}$-র বর্ধিত অংশের সঙ্গে E বিন্দুতে মিলিত হল। আবার C বিন্দু থেকে $\overline{BD}$-র সমান্তরাল করে $\overrightarrow{CF}$ সরলরেখা টানা হল। এই রেখা $\overline{AD}$-র বর্ধিত অংশের সঙ্গে F বিন্দুতে মিলিত হল।

আলোচনার জন্য ঃ এবার **প্রমাণ** এই হেডিং দিয়ে ABC ও DBC ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান প্রমাণ করতে হবে।

প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ মূল তথ্যটি প্রমাণ করার জন্য কতকগুলো তথ্যের প্রয়োজন হবে। সেগুলো হল—

1. চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক হবে।

2. একই ভূমি এবং একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত সামান্তরিকগুলোর ক্ষেত্রফল সমান।

3. কর্ণ সামান্তরিককে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

লেখার জন্য ঃ

প্রমাণ ঃ $\overline{BC} \| \overline{EA}$ এবং $\overline{BE} \| \overline{CA}$

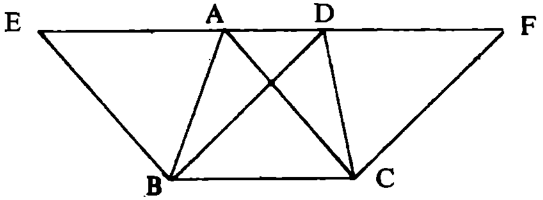

AEBC একটি সামান্তরিক।

আবার $\overline{BC} \parallel \overline{DF}$ এবং $\overline{BD} \parallel \overline{CF}$

DBCF একটি সামান্তরিক।

আলোচনার জন্য ঃ 1 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য ঃ AEBC এবং DBCF সামান্তরিক দুটি একই ভূমি $\overline{BC}$-র ওপর অবস্থিত এবং একই সমান্তরাল যুগল $\overline{BC}$ ও $\overline{EF}$-এর ওপর অবস্থিত।

AEBC সামান্তরিক = DBCF সামান্তরিক।

আলোচনার জন্য ঃ 2 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য ঃ AEBC সামান্তরিকের $\overline{AB}$ একটি কর্ণ।

$\triangle ABC = \triangle ABE$

অর্থাৎ $\triangle ABC$ = AEBC সামান্তরিকের অর্ধেক।

আলোচনার জন্য ঃ 3 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য ঃ আবার DBCF সামান্তরিকের $\overline{CD}$ একটি কর্ণ।

$\triangle DBC = \triangle CDF$

অর্থাৎ $\triangle DBC$ = DBCF সামান্তরিকের অর্ধেক।

আলোচনার জন্য ঃ 3 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য ঃ $\triangle ABC$-র ক্ষেত্রফল = $\triangle DBC$-র ক্ষেত্রফল।

আলোচনার জন্য ঃ দেখ, $\triangle ABC = \frac{1}{2}$AEBC এবং $\triangle DBC = \frac{1}{2}$DBCF

কিন্তু আগেই প্রমাণ করা হয়েছে AEBC = DBCF। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রের ডানপক্ষ সমান। অতএব দুটি ক্ষেত্রের বামপক্ষও সমান হবে। অর্থাৎ $\triangle ABC = \triangle DBC$ হবে।

আলোচনার জন্য ঃ এবার ত্রিভুজ সমূহের ক্ষেত্রফল সমান হওয়ার দ্বিতীয় উপপাদ্যটি আমরা আলোচনা করব।

লেখার জন্য ঃ

সূত্র ঃ যে সব ত্রিভুজ সমান সমান ভূমির ওপর এবং একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত তাদের ক্ষেত্রফল সমান।

আলোচনার জন্য ঃ সূত্রটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে মানে বোঝার চেষ্টা করা যাক। দেখ সূত্রটি এভাবে ভাঙ্গা যায়।

1. কতকগুলো ত্রিভুজ আছে। আমরা দুটি ত্রিভুজের কথাই ধরব।
2. এই ত্রিভুজ দুটির ভূমির দৈর্ঘ্য সমান।
3. দুটি পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখা আছে।
4. ত্রিভুজ দুটি এই দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে অবস্থিত।
5. ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

এবার এই পাঁচটি বিষয় অনুসারে ছবি এঁকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যাক।

অঙ্কনের জন্য ঃ

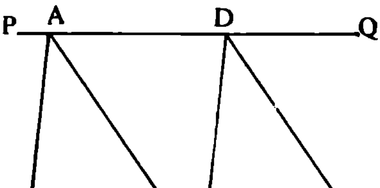

আলোচনার জন্য ঃ চিত্র থেকে পাঁচটি বিষয় মিলিয়ে দেখা যাক।

1. ABC ও DEF দুটি ত্রিভুজ।
2. ত্রিভুজ দুটির ভূমির দৈর্ঘ্য সমান। অর্থাৎ $\overline{BC} = \overline{EF}$
3. $\overline{BF}$ ও $\overleftrightarrow{PQ}$ পরস্পর সমান্তরাল।
4. ত্রিভুজ দুটি $\overline{BF}$ ও $\overleftrightarrow{PQ}$-এর মধ্যে অবস্থিত।

5. ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান।

এখন সূত্রটি আবার পড়ে নিয়ে বিষয়-গুলোকে দু ভাগে ভাগ কর। একটি ভাগে থাকবে যে সব তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এক ভাগে থাকবে যে তথ্যটি প্রমাণ করতে হবে। এবার 5টি বিষয় থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে প্রথম চারটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চম বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে। যে সব তথ্যগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো **স্বীকার** এই হেডিং দিয়ে লিখবে। অর্থাৎ প্রথম 4টি বিষয় স্বীকারে থাকবে এবং পঞ্চম বিষয়টি যুক্তি সহকারে প্রমাণ করতে হবে।

লেখার জন্য ঃ

স্বীকার ঃ ABC ও DBC এই দুটি ত্রিভুজ $\overline{BC}$ ও $\overline{EF}$ এই দুটি সমান সমান ভূমির ওপর অবস্থিত এবং $\overline{BF}$ ও $\overleftrightarrow{PQ}$ এই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত।

প্রমাণ করতে হবে যে ABC ও DEF ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান।

আলোচনার জন্য ঃ এখানে জ্যামিতিক তথ্যটি প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত অঙ্কনের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে C বিন্দু দিয়ে $\overline{BA}$-র সমান্তরাল করে $\overrightarrow{CG}$ এবং F বিন্দু দিয়ে $\overline{ED}$-র সমান্তরাল করে $\overrightarrow{FH}$ সরলরেখা আঁকা হল। এই দুটি সরলরেখা $\overleftrightarrow{PQ}$-এর সঙ্গে যথাক্রমে G ও H বিন্দুতে মিলিত হল। ফলে জ্যামিতিক চিত্রের চেহারাটা দাঁড়াল এইরকম—

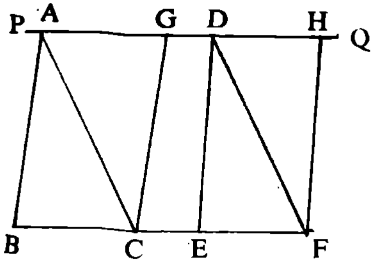

[তোমাদের খাতায় যে চিত্রটি আগেই এঁকেছ তার মধ্যে এই অতিরিক্ত অঙ্কনটুকু করবে। আলাদা করে ছবি আঁকবে না। যা অতিরিক্ত আঁকলে তা **অঙ্কন** এই হেডিং দিয়ে লিখবে]

লেখার জন্য ঃ

অঙ্কন ঃ C বিন্দু দিয়ে $\overline{BA}$-র সমান্তরাল $\overrightarrow{CG}$ এবং F বিন্দু দিয়ে $\overline{ED}$-র সমান্তরাল $\overrightarrow{FH}$ সরলরেখা আঁকা হল। এই দুটি সরলরেখা $\overleftrightarrow{PQ}$ কে যথাক্রমে G ও H বিন্দুতে ছেদ করল।

আলোচনার জন্য ঃ

প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ

1. চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল হলে মোট একটি সামান্তরিক হবে।

2 যে সব সামান্তরিক সমান সমান ভূমির ওপর এবং একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত তাদের ক্ষেত্রফল সমান।

3. সামান্তরিকের কর্ণ সামান্তরিক-টিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

লেখার জন্য ঃ

প্রমাণ ঃ ABCG চতুর্ভুজের $\overline{AG} \parallel \overline{BC}$ এবং $\overline{AB} \parallel \overline{GC}$

ABCG একটি সামান্তরিক।

আলোচনার জন্য : 1 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : পুনরায়, DEFH চতুর্ভুজের $\overline{EF} \parallel \overline{DH}$ এবং $\overline{DE} \parallel \overline{HF}$

DEFH একটি সামান্তরিক।

আলোচনার জন্য : 1 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : $\therefore$ ABCG ও DEFH সামান্তরিক দুটি সমান সমান ভূমি যথাক্রমে $\overline{BC}$ ও $\overline{EF}$-এর ওপর অবস্থিত এবং একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগল $\overleftrightarrow{BF}$ ও PQ-এর মধ্যে অবস্থিত।

সামান্তরিক ABCG = সামান্তরিক DEFH

আলোচনার জন্য : 2 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : এখন ABCG সামান্তরিকের $\overline{AC}$ একটি কর্ণ।

$\triangle$ ABC = $\frac{1}{2}$ × সামান্তরিক ABCG

আলোচনার জন্য : 3 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : আবার DEFH সামান্তরিকের $\overline{DF}$ একটি কর্ণ।

$\triangle$DEF = $\frac{1}{2}$ × সামান্তরিক DEFH

আলোচনার জন্য : 3 নম্বর প্রয়োজনীয় তথ্য কাজে লাগান হল।

লেখার জন্য : $\triangle$ABC-র ক্ষেত্রফল = $\triangle$DEF-এর ক্ষেত্রফল।

দীপক সেনশর্মা

কথার কথা

1 2 3 4 এগুলো যে সংখ্যা তা সকলেই জান—এবং এও জান এগুলো ইংরাজি সংখ্যা। অবশ্য কথাটা কেবল আংশিকভাবে ঠিক, কারণ আসলে এই অক্ষরগুলো ইংরাজিতে ব্যবহার হলেও এর আসল উৎপত্তি কিন্তু আরব দেশে। পুরোন আমলে আরব দেশ গণিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। তারাই সৃষ্টি করেছিল এই সংখ্যার প্রতীক চিহ্নগুলো। আর একটা অসাধারণ চিহ্ন উদ্ভাবন করা হয়েছিল, সেটা হল শূন্য, লেখা হয় 0। এই শূন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল ভারতবর্ষেই। রোমানরাও সংখ্যা লেখার উপায় বার করেছিল, তাতে ছোটখাটো সংখ্যা লেখা তেমন কঠিন না হলেও বড় বড় সংখ্যা লিখতে বেশ বেগ পেতে হত। আমরা জানি এক দুই তিন চার লিখতে রোমান কায়দায় লেখা হত I II III IV পঞ্চাশ লেখা হত L, এবং একশো C, কিন্তু দুশো নয় লিখতে গেলে লিখতে হত CCIX, ১৯১৪ লেখা হত MCMXIV, এখানে M কথাটি হল হাজার, CM মানে হল হাজার থেকে একশো কম, অর্থাৎ ৯০০ এবং XIV হল ১৪। এত সব সংখ্যা লেখার ঝামেলার হাত থেকে আরবরা বাঁচিয়ে দিয়েছে সকলকে! কেবল তাই নয়—এর ফলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হতে পেরেছে অনেক দ্রুততালে।

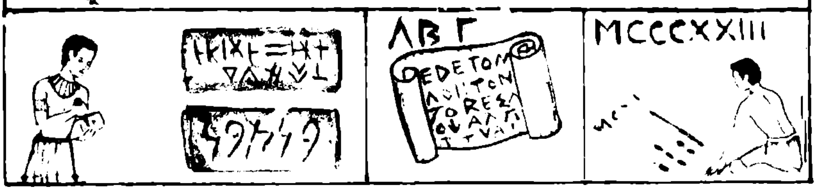

ভৌতবিজ্ঞান

পদার্থ বিদ্যা

গতবারের দ্বাদশ সংখ্যায় আমরা তাপ-শক্তির আলোচনা শেষ করেছি। এই সংখ্যায় আমরা আলোকশক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করব।

অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাঁচ হাত দূরেও নজর চলে না। তুমি টর্চ জ্বাললে। অমনি রাস্তার ঐ গর্তটা, অদূরে আশশ্যাওড়ার ঐ ঝোপটা, ঝোপের ওপাশে ভাঙা পাঁচিলটা তোমার চোখে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। এখানে ঘটনাটা কী ঘটল ? টর্চের আলো ঐ গর্ত, ঝোপ এবং পাঁচিলের ওপর পড়ে ওগুলোকে আলোকিত করল। এবার ওদের আলো-কিত গাত্র থেকে আলো এসে তোমার চোখে প্রবেশ করল, তুমি ওগুলোকে দেখতে পেলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি **আলোক হচ্ছে এমন এক প্রকার শক্তি যা আমাদের চোখে প্রবেশ করে আমাদের মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগায়।**

বস্তু থেকে আলোক এসে আমাদের চোখে লাগলে তবেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই নচেৎ নয়। অনেক বস্তু আছে, যাদের নিজস্ব আলো আছে—এদের দেখবার জন্য অন্যের আলোর প্রয়োজন হয় না। এরা নিজের আলোতেই নিজেরা দৃশ্যমান। এদের বলা হয় **স্বপ্রভ** বস্তু (luminous body)। সূর্য, নক্ষত্র, প্রদীপ শিখা হল এই ধরনের স্বপ্রভ বস্তু। স্বপ্রভ বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণত তাপশক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এরকম স্বপ্রভ বস্তুকে বলা হয় **ভাস্বর** বস্তু (Incandescent body)। ভাস্বর বস্তুর উষ্ণতা সাধারণত 800°C এবং তদূর্ধ্বে হয়। আবার স্বপ্রভ বস্তু শীতলও হতে পারে। টিউব লাইটের আলো, জোনাকির আলো, কেঁচো, ঈল মাছ (Eel) প্রভৃতির গা থেকে যে আলো বের হয়, ফসফরাস, বেরিয়াম সালফাইড (ঘড়ির dial-এ ব্যবহার হয়ে থাকে) প্রভৃতি থেকে যে ঈষৎ সবুজাভ আলো বার হয় তা এই শ্রেণীর শীতল আলো।

পৃথিবীতে বেশিরভাগ বস্তুরই কিন্তু নিজস্ব কোনও আলোক নেই। এদের বলা হয় **অপ্রভ** বস্তু (Non-luminous body)। এরা নিজেরা দৃশ্যমান নয়। অন্যের আলোকে আলোকিত হলে তবেই এরা দৃশ্যমান হয়। তোমার ঘরের টেবিল, চেয়ার, বই, খাতা প্রভৃতি সবকিছুই হল এই রকম অপ্রভ বস্তু।

এখানে একটা কথা বলে দেওয়া দরকার। আলোক বস্তুকে দৃশ্যমান করে বটে, আলোক নিজে কিন্তু অদৃশ্য। বিজলিবাতির আলো বই-এর পাতায় এসে পড়ছে। তুমি বই-এর লেখা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু বাতি থেকে যে আলো আসছে তাকে দেখতে পাচ্ছ কি ? না। তুমি হয়ত বলবে 'বন্ধ দরজা জানলার ফুটো দিয়ে সকালের আলো যখন ঘরে ঢোকে তখন ত আমরা সেই আলোকে দেখতে পাই।' কিন্তু না, তখনও তুমি আলোককে দেখ না, যা দেখ তা হল সূর্যালোকে আলোকিত বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা গুলোকে।

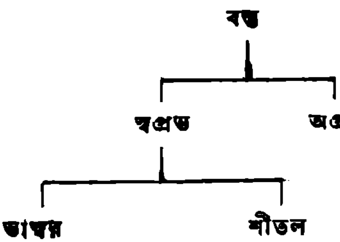

প্রশ্ন

1. আলোক কাকে বলে ?
2. স্বপ্রভ বস্তু ও অপ্রভ বস্তু বলতে কী বোঝ ? নিচের বস্তুগুলোর মধ্যে কোনটি স্বপ্রভ ও কোনটি অপ্রভ বল।
   i. চন্দ্র, ii. ধ্রুবতারা, iii. বুধগ্রহ, iv. জোনাকী, v. হীরক, vi. প্রদীপশিখা, vii. রাঙতা, viii. জ্বলন্ত কয়লা।
3. দুটি বস্তুর নাম কর যারা ভাস্বর অর্থাৎ যারা স্বপ্রভ কিন্তু উষ্ণ নয়।
4. 'আমরা আলোককে দেখতে পাই না, দেখি আলোকিত বস্তুকে'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

যার থেকে আলো বের হয় তাকেই বলা হয় আলোকের উৎস বা আলোক প্রভব (Source of light)। আলোকের উৎস স্বপ্রভও হতে পারে আবার অপ্রভও হতে পারে। সূর্য, প্রদীপশিখা প্রভৃতি হল আলোকের স্বপ্রভ উৎস। চাঁদ, চকচকে বাসনপত্র হল আলোকের অপ্রভ উৎস।

আবার আকার অনুযায়ী আলোকের উৎস দু রকমের হতে পারে।

1. **বিন্দু উৎস** বা বিন্দু প্রভব (Point source of light)।

2. **বিস্তৃত উৎস** বা বিস্তৃত প্রভব (Extended source of light)।

জ্যামিতিতে তোমরা বিন্দু সম্বন্ধে পড়েছ যে বিন্দুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা বেধ কিছুই নেই আছে কেবলমাত্র অবস্থান। বিন্দুকে আমরা কল্পনা করতে পারি কিন্তু বিন্দু আমরা এ'কে দেখাতে পারি না। পেন্সিল যত ছু'চলো করে নিয়েই বিন্দু আঁকি না কেন তার কিছু না কিছু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকেই যায়। বিন্দু প্রভবের বেলাতেও ঐ একই কথা। আলোকের উৎসের আকার যতই ছোট হোক না কেন তার কিছু না কিছু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকবেই। সুতরাং যদি কোনও আলোক প্রভবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এতই সূক্ষ্ম হয় যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয় তাকেই আমরা বিন্দু প্রভব বলে ধরে নেব। যেমন একটা কার্ড বোর্ডে (Card board) যথা সম্ভব

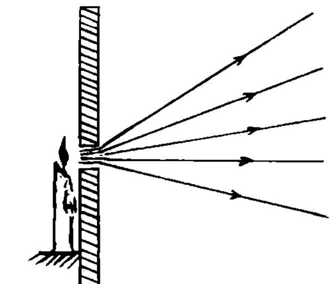

আলোকের বিন্দু-উৎস

সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র করে তার পিছনে একটি প্রদীপশিখা বা আলো রাখলে ঐ আলোকিত ছিদ্রটিকে আমরা বিন্দু উৎস বলে ধরে নিতে পারি।

পক্ষান্তরে, যে আলোক প্রভবের পরিমাপযোগ্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, তাকে বলা হয় বিস্তৃত প্রভব। কোনও বিস্তৃত আলোক প্রভবকে আমরা অসংখ্য বিন্দু প্রভবের সমাবেশ বলে মনে করতে পারি।

প্রশ্ন

1. আলোকের উৎস বলতে আমরা কী বুঝি ? আলোকের স্বপ্রভ উৎস এবং আলোকের অপ্রভ উৎসের দুটি করে দৃষ্টান্ত দাও।
2. আলোকের বিন্দু উৎস ও বিস্তৃত উৎস বলতে কী বোঝ ? প্রকৃত বিন্দু উৎস বাস্তবে সম্ভব নয় কেন ? কাজ চালানো বিন্দু উৎস কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে ?

আলোক যার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে তাকেই বলা হয় আলোকের মাধ্যম (Medium)।

মহাশূন্যে কোনও বাস্তব বা জড় মাধ্যম নেই কিন্তু আলোক সেই শূন্যস্থান দিয়েও চলাচল করতে পারে। বরং বলা উচিত শূন্যস্থান দিয়েই আলোক সব থেকে সহজে চলাচল করতে পারে। তাই একে বলা হয় **শূন্য মাধ্যম** (Vacuum)।

কিছু কিছু জড় পদার্থ আছে যারা আলোককে প্রায় একটুও শোষণ না করে প্রায় সবটুকু আলোককে তাদের মধ্য দিয়ে চলে যেতে দেয়। এদেরকে বলা হয় আলোকের **স্বচ্ছ মাধ্যম** (Transparent medium)। যেমনঃ কাঁচ, বায়ু, জল ইত্যাদি।

কিছু কিছু পদার্থ আছে যাদের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে আলোকের বেশ কিছু অংশ শোধিত হয়ে যায়। এদেরকে বলা হয় **ঈষদচ্ছ মাধ্যম** (transluscent medium)। যেমনঃ তেলা কাগজ, ঘষা কাঁচ প্রভৃতি।

কিছু কিছু পদার্থ আছে যাদের মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে সবটুকু আলোই শোষিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এদের মধ্যে দিয়ে আলোক আদৌ যাতায়াত করতে পারে না। এদেরকে বলা হয় **অস্বচ্ছ বা অনচ্ছ** পদার্থ (opaque medium)। কাঠ, লোহা, পাথর প্রভৃতি হল এইরকম অনচ্ছ বা অস্বচ্ছ পদার্থ।

আলোকের মাধ্যম

- **শূন্য মাধ্যম**
- **বাস্তব মাধ্যম**
  - **স্বচ্ছ**
  - **ঈষদচ্ছ**
  - **অনচ্ছ**

যে সব বাস্তব- মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলোক চলাচল করতে পারে তাদেরকে অর্থাৎ আলোকের স্বচ্ছ ও ঈষদচ্ছ মাধ্যম-গুলোকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

1. **সমসত্ত্ব মাধ্যম**
2. **অসমসত্ত্ব মাধ্যম**

যে মাধ্যমের সমগ্র অংশেই তার ভৌত ধর্ম সমূহ হুবহু একই রকম তাকে **বলা হয়** সমসত্ত্ব মাধ্যম। যেমন কিছু পরিমাণ পরিষ্কার জল, উৎকৃষ্ট কাঁচ ইত্যার্দি।

যে মাধ্যমের এক এক অংশে তার ভৌত ধর্ম সমূহ এক একরকম তাকে বলা হয় অসমসত্ত্ব মাধ্যম। যেমন গনগনে উনুনের ঠিক উপরকার বায়ুস্তর। উনুনের একেবারে কাছের বায়ু খুব উষ্ণ, ফলে তার ঘনত্ব কম। কিঞ্চিৎ দূরের বায়ু অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ, ফলে তার ঘনত্ব কিছু বেশি।

প্রশ্ন

1. আলোকের শূন্য মাধ্যম বলতে কী বোঝ ?
2. স্বচ্ছ পদার্থ, ঈষদচ্ছ পদার্থ ও অনচ্ছ পদার্থ বলতে কী বোঝ ? প্রত্যেক প্রকার পদার্থের দুটি করে দৃষ্টান্ত দাও।
3. আলোকের সমসত্ত্ব মাধ্যম ও অসমসত্ত্ব মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য কী ?

মনে কর S আলোকের একটি বিন্দু উৎস। উৎসটি সমসত্ত্ব মাধ্যমে অবস্থিত। S থেকে নির্গত হয়ে অসংখ্য আলোক রেখা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে। মাধ্যমটি যেহেতু সমসত্ত্ব অর্থাৎ যেহেতু তার ভৌত ধর্ম সমূহ সর্বত্র হুবহু একই রকম সেজন্য কোনও একটি আলোকরেখা কোনও একটি নির্দিষ্ট দিক ধরে যেতে যেতে হঠাৎ তার গতির দিক পরিবর্তন করে অন্যদিকে বেঁকে যাবে এরকম ঘটবার কোনও কারণ নেই। অর্থাৎ আলোকরেখাটি সরল পথ বা ঋজু পথ ধরেই অগ্রসর হতে থাকবে। সমসত্ত্ব মাধ্যম দিয়ে ঋজু পথ ধরে গমনকারী এই যে আলোকরেখা একে বলা হয় **আলোকরশ্মি** (ray of light)। স্বভাবতই কোনও আলোকরশ্মির গতিপথ নির্দেশ করবার জন্য সরলরেখা ব্যবহার করা হয় এবং রশ্মিটি কোনদিক থেকে কোনদিকে যাচ্ছে দেখাবার জন্য রেখাটিতে তীর চিহ্ন দেওয়া হয়।

এখন দেখা যাক S বিন্দু উৎস থেকে এই যে অসংখ্য আলোকরশ্মি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এদের মধ্যে থেকে আমরা কোনও একটি রশ্মিকে পৃথক করে নিতে পারি কিনা। ধরা যাক আমরা একটি কার্ডবোর্ড AB নিলাম। কার্ডবোর্ডটিতে H একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করলাম। S থেকে যে সব আলোকরশ্মি AB-এর ওপর এসে পড়বে তারা ঐ অস্বচ্ছ কার্ডবোর্ডে বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যে রশ্মিটি H বিন্দুতে এসে উপস্থিত হবে কেবলমাত্র সেটিই ছিদ্রপথে বোর্ডটিকে অতিক্রম করে বিপরীত দিকে গিয়ে পৌঁছবে। এইভাবে আমরা একটি মাত্র আলোকরশ্মিকে পৃথক করে নিতে পারতাম। কিন্তু মুস্কিল হল H সূচী-ছিদ্রটিকে আমরা যতই সূক্ষ্ম করি না কেন তার কিছু দৈর্ঘ্য প্রস্থ থাকবেই এবং তার ভেতর দিয়ে শুধু একটিমাত্র নয় বেশ কতকগুলো আলোকরশ্মি পার হয়ে যাবে। ফলে কার্যত আমরা যা পাব তা একটিমাত্র রশ্মি নয়, কতকগুলো রশ্মির একটি গুচ্ছ বিশেষ। **কতকগুলো পাশাপাশি আলোকরশ্মির এই গুচ্ছকে বলা হয় রশ্মিগুচ্ছ** (Beam of light).

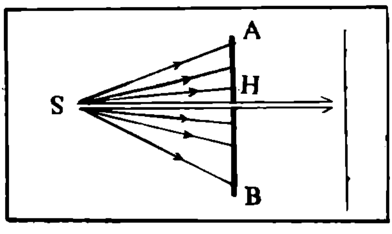

অবস্থা ভেদে রশ্মিগুচ্ছ তিন ধরনের হতে পারে।

1. **সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ** (Paralel beam)

2. **অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ** (Convergent beam)

3. **অপসারী রশ্মিগুচ্ছ** (Divergent beam)

যদি দেখা যায় কোন রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলো পরস্পরের সমান্তরাল তাহলে ঐ রশ্মিগুচ্ছকে বলা হয় সমান্তরাল রশ্মি-গুচ্ছ।

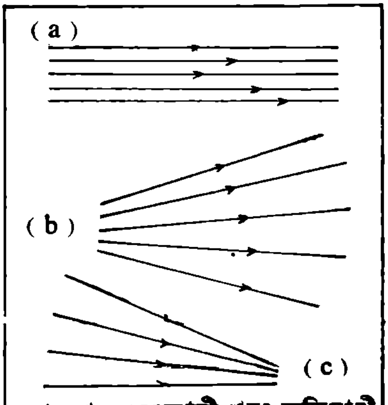

সমান্তরাল, অপসারী এবং অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ

যদি দেখা যায় কোনও রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলো ক্রমশ একে অন্যের কাছে আসতে আসতে একটি সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হবার পথে এগিয়ে চলেছে তাহলে ঐ রশ্মিগুচ্ছকে বলা হয় অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ। যদি দেখা যায় কোনও রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলো ক্রমশ একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরতে সরতে এগিয়ে চলেছে তাহলে ঐ রশ্মিগুচ্ছকে বলা হয় অপসারী রশ্মিগুচ্ছ।

নিচে পাশাপাশি চিত্র তিনটি দেখ।

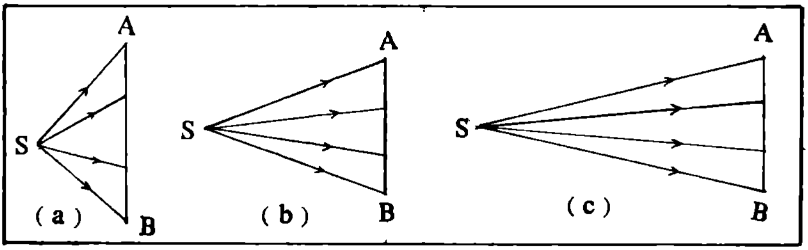

S হচ্ছে আলোকের বিন্দু উৎস। S থেকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ এসে আপতিত হচ্ছে AB পর্দাটির উপর। লক্ষ্য কর উৎস S এবং পর্দা AB-এর মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হচ্ছে AB-এর ওপর আপতিত রশ্মিগুচ্ছ ততই কম অপসারী হচ্ছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি উৎস ও পর্দার মধ্যে ব্যবধান যদি খুব বেশি হয় তাহলে পর্দার ওপর আপতিত রশ্মিগুচ্ছ প্রায় সমান্তরালই হবে। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছকে তাই সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলে ধরে নিতে পারা যায়।

মনে কর XY সীমারেখার একপাশে A একটি সমসত্ত্ব মাধ্যম এবং অপরপাশে B অন্য একটি সমসত্ত্ব মাধ্যম। আরও মনে কর $\overrightarrow{PQ}$ আলোকরশ্মিটি A মাধ্যম দিয়ে ঋজুরৈখিক পথে চলে মাধ্যম দুটির বিভেদ তল অর্থাৎ XY-এর ওপর Q বিন্দুতে আপতিত হল। Q বিন্দুতে পৌঁছে তিন রকমের ঘটনা ঘটবে।

1. আলোকরশ্মির কিছু অংশ XY বিভেদ তলে প্রতিহত হয়ে পুনরায় A মাধ্যমে ফিরে আসবে। এই ঘটনার নাম আলোকের **প্রতিফলন**।

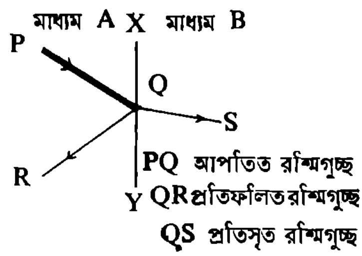

আলোকের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ

2. আলোকরশ্মির কিছু অংশ সামান্য বাঁক নিয়ে B মাধ্যমে প্রবেশ করবে এবং ঐ

প্রশ্ন

1. আলোকরশ্মির সংজ্ঞা দাও। বাস্তবক্ষেত্রে একটিমাত্র আলোক রশ্মিকে পৃথক করা সম্ভব নয় কেন?
2. রশ্মিগুচ্ছ কাকে বলে? তিন ধরনের রশ্মিগুচ্ছ কী কী? তাদের সংজ্ঞা দাও।
3. হ্যারিকেন লণ্ঠন থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ এবং চন্দ্র থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছ এ দুটির মধ্যে কোন্ রশ্মিগুচ্ছটি সমান্তরাল? কেন?

মাধ্যম দিয়ে ঋজুরৈখিক পথে চলতে থাকবে। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের **প্রতিসরণ।**

3. আলোকরশ্মির কিছু অংশ XY বিভেদ তলে শোষিত হয়ে যায়। আলোক শক্তি হিসাবে এই অংশটির আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না, এটি রূপান্তরিত হয়ে যায় অন্যান্য শক্তিতে। এবার আমরা ঘটনা তিনটি নিয়ে একে একে আলোচনা করব।

প্রথমে প্রতিফলন। প্রতিফলনের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি যে **আলোকরশ্মি কোনও একটি সমসত্ত্ব মাধ্যম দিয়ে সরল রৈখিক পথে যেতে যেতে যদি দ্বিতীয় কোনও এক মাধ্যমে বিভেদ তলে আপতিত হয় তাহলে ঐ রশ্মির কিছু অংশ পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের প্রতিফলন এবং পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসা রশ্মিকে বলা হয় প্রতিফলিত রশ্মি।**

আলোকরশ্মি যখন কোনও মসৃণ দর্পণের অর্থাৎ আয়নার ওপর এসে আপতিত হয় তখন তার বেশির ভাগ অংশেরই প্রতিফলন ঘটে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে আয়নার পিছন পিঠে একটি লাল প্রলেপ দেওয়া থাকে। ইংরাজীতে একে Silvering বলা হয়। কিন্তু Silver অর্থাৎ রূপার সঙ্গে এই লাল প্রলেপের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি আসলে পারদঘটিত একটি পদার্থের প্রলেপ। দর্পণে আলোকের যে প্রতিফলন ঘটে, তা ঘটে এই প্রলেপযুক্ত পিছন পিঠ থেকেই। সামনের পিঠ থেকেও কিছু প্রতিফলন ঘটে বটে, কিন্তু তা খুবই সামান্য।

নিচের চিত্রে MM′ একটি সমতল দর্পণের পিছন পিঠ। $\overrightarrow{PQ}$ একটি আলোকরশ্মি যেটি কোন সমসত্ত্ব মাধ্যম দিয়ে সরলরেখা ধরে যেতে যেতে MM′ এর Q বিন্দুতে তির্যকভাবে অর্থাৎ টেরচা-ভাবে আপতিত হয়েছে। এবং যেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে $\overrightarrow{QR}$ পথে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে এসেছে। Q বিন্দুতে MM′-এর ওপর লম্ব QN কল্পনা কর।

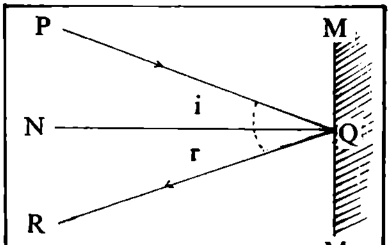

আলোকের প্রতিফলন

এক্ষেত্রে MM′ হল **প্রতিফলক তল,** $\overrightarrow{PQ}$ **হল আপতিত রশ্মি,** $\overrightarrow{QR}$ **প্রতি-ফলিত রশ্মি।** Q কে বলা হয় **আপতন বিন্দু** এবং QN কে বলা হয় **আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের ওপর কল্পিত অভিলম্ব।** ∠PQNকে বলা হয় **আপতন কোণ** এবং ∠RQNকে **প্রতিফলন কোণ।**

পরীক্ষা করে দেখা গেছে আলোকের প্রতিফলন সর্বদাই দুটি সূত্র (Law) মেনে চলে। সূত্র দুটি হল—

1. **আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতি-ফলকের ওপর কল্পিত অভিলম্ব সর্বদা একই সমতলে অবস্থান করে।**

2. **আপতন কোণ সর্বদাই প্রতি-ফলন কোণের সমান হয়।**

অর্থাৎ যদি মনে করা যায় যে আমাদের চিত্রে $\overrightarrow{PQ}$ আপতিত রশ্মিটি আমাদের টেবিলের তল ঘেঁষে গিয়ে টেবিলের তলে

অবস্থিত Q বিন্দুতে পৌঁছে দর্পণের দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে—

প্রথম সূত্রটি অনুসারে প্রতিফলিত রশ্মি $\overrightarrow{QR}$ এবং Q বিন্দুতে দর্পণের ওপর কল্পিত অভিলম্ব QNও টেবিলের তলেই অবস্থান করবে। টেবিল ছেড়ে ওপরের দিকে উঠে আসবে না বা নিচের দিকে নেমে যাবে না।

এবং দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী $\angle PQN \cong \angle RQN$ হার্টল-এর চাকতি (Hartle's disc) নামক যন্ত্রটির সাহায্যে সূত্র দুটির সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা যায়।

যন্ত্রটিতে ধাতুনির্মিত একটি সাদা রঙের চাকতি থাকে যার পরিধি (D) চারটি সমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগে 0° থেকে 90° পর্যন্ত অংশাঙ্কন করা থাকে। চাকতি (D)-টি একটি দণ্ড (R)-এর সঙ্গে খাড়াভাবে যুক্ত। (H) হাতলের চাকতিটিকে চাকার মত ঘোরান যায়। চাকতিটির একদিকে পরিধি বরাবর একটি অর্ধবৃত্তাকার বেড়া (AB) আছে। বেড়াটির এক জায়গায় একটি সূচীছিদ্র (S) আছে।

পরীক্ষা করার জন্য চাকতিটির কেন্দ্র-

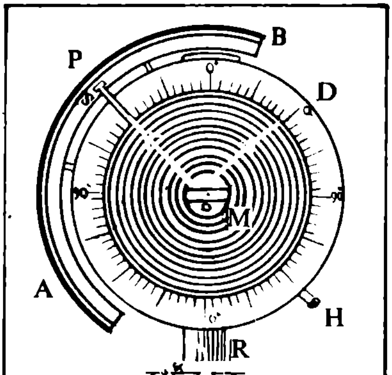

হার্টল চক্র

স্থলে চাকতিটি 90°—90° রেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে একটি ছোট দর্পণ স্থাপন করা হয়। এই অবস্থায় O—0° রেখাটি দর্পণের ওপর O বিন্দুতে অভিলম্ব হবে। এবার কোনও দূরবর্তী উৎস থেকে আগত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে সূচীছিদ্র S-এর মধ্য দিয়ে চাকতিটির গা ঘেঁষে এসে M দর্পণটির O বিন্দুতে আপতিত হতে দেওয়া হয়। আলোকিত $\overrightarrow{SO}$ রেখাটি আপতিত রশ্মির গতিপথ এবং আলোকিত $\overrightarrow{OQ}$ রেখাটি প্রতিফলিত রশ্মির গতিপথ নির্দেশ করে।

প্রশ্ন

1. আলোকরশ্মি যখন এক সমসত্ত্ব মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে অন্য এক সমসত্ত্ব তলে এসে আপতিত হয় তখন কী কী তিন রকম ঘটনা ঘটতে পারে ?
2. আলোকের প্রতিফলনের সংজ্ঞা দাও।
3. আলোকের প্রতিফলনের একটি নক্সা এঁকে তাতে i. আপতিত রশ্মি, ii. প্রতিফলিত রশ্মি, iii. প্রতিফলক তল, iv. আপতন বিন্দু v. আপতন বিন্দুতে প্রতিফলক তলের ওপর কল্পিত অভিলম্ব, vi. আপতন কোণ এবং vii. প্রতিফলন কোণ নির্দেশ কর।
4. আলোকের প্রতিফলনের সূত্র **দুটি** লেখ।
5. হার্টল-এর চাকতি (Hartle's disc) নামক যন্ত্রটির গঠন বর্ণনা কর। যন্ত্রটির সাহায্যে কীভাবে প্রতিফলনের সূত্র দুটি প্রমাণ করা যায় ?

যেহেতু $\overrightarrow{SO}$, $\overrightarrow{OQ}$ এবং OO° তিনটি রেখাই D চাকতিটির তলের উপর অবস্থিত সেহেতু প্রমাণিত হল যে আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে কল্পিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। (প্রতিফলনের ১ম সূত্র)

আবার D চাকতি থেকে ডিগ্রির অংশাংকনা গণনা করে দেখা যায় যে ∠SOO° ≅ ∠QOO° অর্থাৎ আপতন কোণ ≅ প্রতিফলন কোণ। (প্রতিফলনের ২য় সূত্র)

H হাতলটির সাহায্যে চাকতিটিকে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে আপতন কোণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে বার বার পরীক্ষা করে ঐ একই ফল পাওয়া যায়।

প্রতিফলক তলের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিফলন আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে।

1. **নিয়মিত প্রতিফলন** (regular reflection)

2. **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** (diffused reflection)

প্রতিফলক তলটি যদি মসৃণ হয় তাহলে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে আর যদি প্রতিফলক তলটি অমসৃণ হয় তা হলে ঘটে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন।

নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতিত রশ্মিগুচ্ছ যে প্রকৃতির হয় প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও হয় সেই প্রকৃতির। অর্থাৎ

আপতিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হলে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও হয় সমান্তরাল।

আপতিত রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী হলে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও হয় অভিসারী এবং আপতিত রশ্মিগুচ্ছ অপসারী হলে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও হয় অপসারী

কিন্তু বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত মিল থাকে না। প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ বিশৃংখল ভাবে দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রেও এককভাবে প্রতিটি আপতিত রশ্মিই প্রতিফলনের সূত্র মেনেই প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু প্রতিফলক তলটি এবড়ো খেবড়ো সেজন্য এক একটি রশ্মি এক এক দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

দর্পণ (আয়না) পালিশ করা ধাতব পাত, স্থির জল প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে। পক্ষান্তরে ঘরের দেওয়াল, ঘষা কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি অমসৃণ তলের ক্ষেত্রে ঘটে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন।

নিচে, নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের পার্থক্যগুলো দেওয়া হল।

1. নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলক তলকে (যেমন দর্পণকে) ঘুরিয়ে

মসৃণ তলে নিয়মিত প্রতিফলন

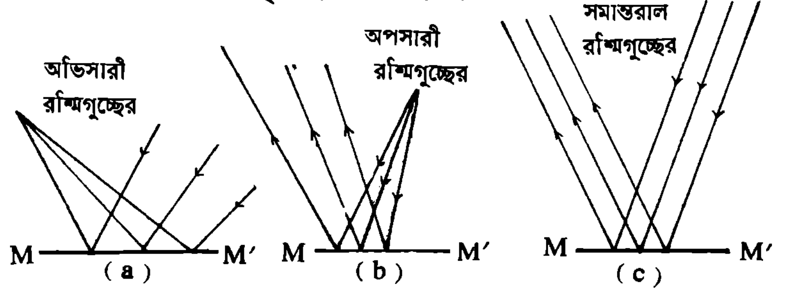

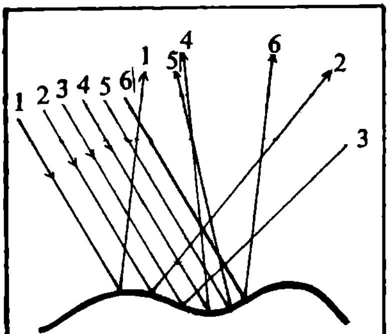

অমসৃণ তলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছকে কোনও একটি বিশেষ দিকে পরিচালিত করা যায়। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলক তলকে (যেমন কাগজ খণ্ডকে) ঘুরিয়ে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছকে কোনও একটি বিশেষ দিকে পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

2. নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যেহেতু রশ্মিগুচ্ছ একটি বিশেষ দিকে প্রতিফলিত হয় সেইহেতু কেবল মাত্র সেই দিক থেকে তাকালেই আলোক রশ্মি আমাদের চোখে পড়ে। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং যেদিক থেকেই তাকান যাক না কেন কিছু না কিছু আলোক রশ্মি চোখে পড়বেই।

3. নিয়মিত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি তা হল আলোকের উৎসটির একটি প্রতিবিম্ব। পক্ষান্তরে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখতে পাই তা হল প্রতিফলকটির আলোকিত তল। যেমন একটি জ্বলন্ত মোমবাতিকে একটি সমতল দর্পণের (আয়নার) সামনে ধরলে দর্পণের মধ্যে আমরা মোমবাতিটির একটি প্রতিবিম্ব (অর্থাৎ ছবির মত) দেখতে পাব কিন্তু একটি দেওয়ালের সামনে মোমবাতিটিকে ধরলে আমরা মোমবাতিটির কোনও প্রতিবিম্ব (অর্থাৎ ছবির মত) দেখতে পাব না, দেখতে পাব আলোকিত দেওয়ালটিকে।

প্রশ্ন

1. দু ধরনের প্রতিফলনের নাম কী? কী ধরনের প্রতিফলক তল থেকে কোন ধরনের প্রতিফলন ঘটে?
2. নিয়মিত প্রতিফলন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের মধ্যে মূল পার্থক্যটি কোথায়? বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কি প্রতিফলনের সূত্র অনুসারেই ঘটে থাকে?
3. নিয়মিত প্রতিফলন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা কর।

রসায়ন বিদ্যা

দ্রবণ বলতে আমরা সাধারণত কোনও তরলের মধ্যে দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের কথাই বুঝি। বিজ্ঞানে কিন্তু দ্রবণ শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। নবম সংখ্যায় মিশ্র পদার্থ বা মিশ্রণের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে মিশ্রণ দু রকমের হতে পারে—সমসত্ত্ব মিশ্রণ এবং অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। সমসত্ত্ব মিশ্রণের সব অংশে বিভিন্ন পদার্থগুলো একই অনুপাতে মিশ্রিত থাকে এবং মিশ্রণটির গুণ ও ধর্ম সর্বত্র একই রকম হয়। বলা যেতে পারে সমসত্ত্ব মিশ্রণেরই আর এক নাম দ্রবণ। অর্থাৎ—

একাধিক বিভিন্ন পদার্থ একে অন্যের সঙ্গে সমসত্ত্বভাবে মিশে গিয়ে যে মিশ্রণ উৎপন্ন করে তাকে দ্রবণ বলা হয়।

এখন, মিশ্রণ মোট ছয় রকমের হতে পারে—

i. কঠিন পদার্থের সঙ্গে কঠিন পদার্থ মিশে
ii. তরল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থ
iii. গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থ মিশে
iv. তরল পদার্থের সঙ্গে কঠিন পদার্থ মিশে
v. তরল পদার্থের সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থ মিশে
vi. কঠিন পদার্থের সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থ মিশে

সুতরাং দ্রবণও উক্ত ছয় প্রকারের হতে পারে।

কোনও দ্রবণের মধ্যে যে পদার্থটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে অর্থাৎ যে পদার্থটির মধ্যে অন্য পদার্থগুলো সমসত্ত্বভাবে মিশে আছে বলে মনে করা যায় সেটিকে বলা হয় দ্রাবক (Solvent)। দ্রাবকের মধ্যে যে এক বা একাধিক পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে থাকে অর্থাৎ সমসত্ত্বভাবে মিশে থাকে তাকে বা তাদের বলা হয় দ্রাব (Solute)। দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব দ্রবীভূত হয়ে যা উৎপন্ন হয় তাই হল দ্রবণ (Solution)। অর্থাৎ—

দ্রাবক	+	দ্রাব	=	দ্রবণ
(Solvent)		(Solute)		(Solution)

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

i. এক গ্লাস জলে কিছু পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত করা হল

এক্ষেত্রে—জল হল দ্রাবক

চিনি হল দ্রাব

এবং চিনি মিশ্রিত জল হবে দ্রবণ

(তরলে কঠিনে দ্রবণ)

ii. 85% লোহার সঙ্গে 15% ক্রোমিয়াম ধাতু সমসত্ত্বভাবে মিশিয়ে স্টেনলেস স্টীল (Stainless Steel) বা মরিচাহীন ইস্পাত প্রস্তুত করা হল।

এক্ষেত্রে—লোহা বা ইস্পাত হল দ্রাবক

ক্রোমিয়াম (Chromium) এবং হল দ্রাব

এবং স্টেনলেস স্টীল হল দ্রবণ

(কঠিনে কঠিনে দ্রবণ)

iii. 1 আয়তন জলে প্রায় 400 আয়তন অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) দ্রবীভূত করে লিকার অ্যামোনিয়া (Liquor Ammonia) তৈরি করা হল। এক্ষেত্রে ওজনগতভাবে জলের পরিমাণই বেশি এবং জলের মধ্যেই অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয়েছে অ্যামোনিয়ার মধ্যে জল নয়। তাই—

জলই হল দ্রাবক

অ্যামোনিয়া গ্যাস হল দ্রাব

এবং লিকার অ্যামোনিয়া হল দ্রবণ

(তরলে গ্যাসে দ্রবণ)

নিচে বিভিন্ন প্রকার দ্রবণের আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেখ—

i. কঠিনে কঠিনে দ্রবণ—
   a. পিতল (কমবেশি 70% তামা বা Cu + 30% দস্তা বা Zn)।
   b. কাঁসা (কমবেশি 80% তামা বা Cu + 20% টিন, Sn)।
ii. তরলে তরলে দ্রবণ—
   a. মেথিলেটেড স্পিরিট (ইথাইল অ্যালকোহল, C_2H_5OH + মিথাইল অ্যালকোহল, CH_3OH)।
   b. অম্লরাজ বা Aqua Regia (3 আয়তন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HEl + 1 আয়তন নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3)।
iii. গ্যাসে গ্যাসে দ্রবণ—
   a. বায়ু (4 আয়তন নাইট্রোজেন, N_2 + 1 আয়তন অক্সিজেন,

O_2 + সামান্য পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস)।

iv. তরলে কঠিনে দ্রবণ—

a. সরবৎ (জল + চিনি)

b. ভার্নিস Varnish, (ইথাইল অ্যালকোহল + গালা)।

v. তরলে গ্যাসে দ্রবণ—

a. সোডা ওয়াটার (Soda water) বা বাতান্বিত জল (জল + অধিক চাপে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস, Co_2)।

b. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid, Hcl) (জল + হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস)।

vi. কঠিনে গ্যাসে দ্রবণ—প্যালেডিয়াম (Palladium) প্রমুখ কয়েকটি ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) কে শোষণ করে সমসত্ত্ব মিশ্রণ গঠন করে।

ধাতুর দ্বারা গ্যাস শোষণ করে মিশ্রণ প্রস্তুতের এইরকম ঘটনার নাম অন্তর্ধৃতি (Occlusion)।

প্রশ্ন

1. দ্রবণের সংজ্ঞা দাও। দ্রবণের মধ্যে কোনটিকে দ্রাবক এবং কোনটিকে দ্রাব বলা হয় ?
2. দ্রবণ কী কী ছয় ধরনের হতে পারে ? প্রত্যেক ধরনের একটি করে দৃষ্টান্ত দেখাও।
3. অন্তর্ধৃতি কাকে বলে ? কোন্ ধাতুর অন্তর্ধৃতি ক্ষমতা সর্বাধিক ?
4. নিম্নলিখিত দ্রবণগুলো কোন কোন পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত ?

i. মরিচাহীন ইস্পাত, ii. সোডা ওয়াটার, iii. লিকার অ্যামোনিয়া, iv. অম্লরাজ, v. কাঁসা, vi. পিতল

কঠিনে কঠিনে, তরলে তরলে এবং গ্যাসে গ্যাসে দ্রবণের ক্ষেত্রে দ্রাবক এবং দ্রাবের আপেক্ষিক পরিমাণ ইচ্ছামত ভাবে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। যেমন—তামা ও দস্তার দ্রবণ। কমবেশি 70% তামার সঙ্গে কমবেশি 30% দস্তা সমসত্ত্বভাবে মিশ্রিত করে পিতল তৈরি করা হয়। কিন্তু ইচ্ছা করলে তামা এবং দস্তাকে অন্য যে কোনও অনুপাতে মেশান যেতে পারে। তেমনি স্পিরিট এবং জলকে যে কোনও অনুপাতে মেশান সম্ভব।

কিন্তু তরলে কঠিনে, তরলে গ্যাসে এবং কঠিনে গ্যাসে দ্রবণের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। এইসব ক্ষেত্রেও দ্রাবক ও দ্রাবের অনুপাতে হেরফের করা যায় বটে কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে পারে না।

একটি বীকারে (Beaker)-এ কিছুটা জল নাও। জলের মধ্যে কিছু পরিমাণ নাইটার (পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3) ঢেলে কাঁচ দণ্ড দিয়ে নাড়। KNO_3টুকু জলে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। জলে আরও কিছুটা KNO_3 যোগ করে কাঁচাদণ্ড দিয়ে নাড়। KNO_3 জলের মধ্যে অদৃশ্য হবে।

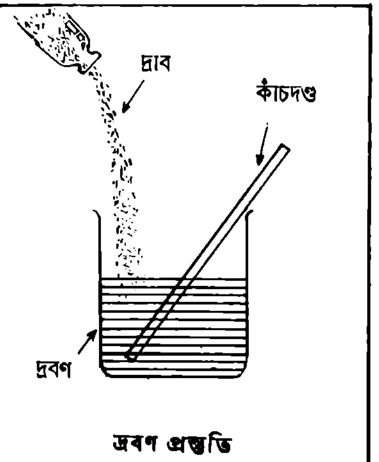

দ্রবণ প্রস্তুতি

এইভাবে অল্প অল্প করে KNO_3 যোগ করতে থাক ও দ্রবীভূত করাতে থাক। অবশেষে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন ঐ জল আর একটুও KNO_3 দ্রবীভূত করতে পারবে না। অদ্রবীভূত KNO_3 বীকারের তলদেশে পড়ে থাকবে। অর্থাৎ জলে KNO_3-এর অনুপাত আর বেশি করা যাবে না।

এবার বীকারটিতে তাপ প্রয়োগ করে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি কর। দেখবে বীকারের তলদেশে পড়ে থাকা অদ্রবীভূত KNO_3-টুকু দ্রবীভূত হয়ে গেল। এইভাবে উষ্ণতা যত বৃদ্ধি করা হবে জলের KNO_3-কে দ্রবীভূত করার ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

KNO_3-এর পরিবর্তে অন্য কোনও দ্রাব নিয়ে পরীক্ষা করলেও একই রকম ব্যাপার পরিলক্ষিত হবে।

কোনও দ্রাবকে কী পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত করা যাবে তার একটা নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা আছে। এবং এই ঊর্ধ্বসীমা দ্রাবকের উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে।

সাধারণত দ্রাবকের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দ্রাব দ্রবীভূত করবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই বৃদ্ধির হার সব দ্রাবের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। যেমন KNO_3-এর ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার খুব বেশি, কিন্তু NaCl-এর ক্ষেত্রে খুবই সামান্য।

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত করে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় তাকে ঐ উষ্ণতায় ঐ দ্রাবের সংপৃক্ত দ্রবণ (saturated solution) বলা হয়। যেমন 60 C উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে 110 গ্রামের বেশি KNO_3 দ্রবীভূত হতে পারে না। সুতরাং 60°C উষ্ণতার 100 গ্রাম জলে 110 গ্রাম KNO_3 দ্রবীভূত করলে দ্রবণটি সংপৃক্ত হবে।

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হলে দ্রবণটি সংপৃক্ত হয়, দ্রাবকে যদি তার চেয়ে কম পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকে, তাহলে ঐ দ্রবণটিকে অসংপৃক্ত দ্রবণ (unsaturated solution) বলা হয়। যেমন আগের দৃষ্টান্তটিতে যদি 60°C উষ্ণতা বিশিষ্ট 100 গ্রাম জলে 110 গ্রাম অপেক্ষা কম পরিমাণ KNO_3 দ্রবীভূত করা হয় তাহলে দ্রবণটি অসংপৃক্ত হবে।

এবারে একটা প্রশ্ন। তোমাকে লবণের একটি জলীয় দ্রবণ দেওয়া হল। তুমি কী করে জানবে দ্রবণটি সংপৃক্ত না অসংপৃক্ত? জানা খুবই সহজ। দ্রবণটির মধ্যে সামান্য একটু লবণ ফেলে দিয়ে কাঁচ দণ্ড দিয়ে বেশ ভাল করে নেড়ে দেখ লবণটুকু দ্রবীভূত হয় কিনা। যদি দ্রবীভূত হয়, বুঝতে হবে দ্রবণটি অসংপৃক্ত ছিল। যদি একটুও লবণ দ্রবীভূত না হয়, বুঝবে দ্রবণটি সংপৃক্ত।

প্রশ্ন

1. কোন কোন ধরনের দ্রবণের বেলায় দ্রাবক ও দ্রাবের অনুপাত ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা যায়?
2. কোন কোন ধরনের ক্ষেত্রে দ্রাবক ও দ্রাবের অনুপাত একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই পরিবর্তন করা যায়?
3. দ্রাবকের দ্রাব দ্রবীভূত করার ক্ষমতা উষ্ণতার সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়? এই পরিবর্তনের হার, যে সব দ্রাবের ক্ষেত্রে একই রকম নয়, তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাও।
4. সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণের সংজ্ঞা দাও।
5. একটি দ্রবণ সংপৃক্ত না অসংপৃক্ত তা তুমি কী করে বুঝবে?

আমরা দেখেছি উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবকের দ্রাব দ্রবীভূত করবার ক্ষমতাও সাধারণত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এখন মনে কর উচ্চ উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ দ্রাবক নিয়ে তাতে ঐ উষ্ণতার সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত করে সংপৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হল। এবার যদি ঐ উষ্ণ সংপৃক্ত দ্রবণটিকে শীতল হতে দেওয়া হয়, ঐ শীতল দ্রাবক তখন আর তার মধ্যে সবটুকু দ্রাবকে ধরে রাখতে পারবে না। অতিরিক্ত দ্রাবটুকু দ্রাবক থেকে পৃথক হয়ে দ্রবণের তলায় এসে জমতে থাকবে।

কিন্তু দেখা গেছে উষ্ণ সংপৃক্ত দ্রবণটিকে যদি খুব সাবধানে কোনও রকম নাড়াচাড়া না করে অতি ধীরে ধীরে শীতল হতে দেওয়া হয়, তাহলে যে বাড়তি দ্রাবটুকু দ্রাবক থেকে পৃথক হয়ে যাবার কথা, তা দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। এই রকম দ্রবণকে অতিপৃক্ত দ্রবণ বলে। অর্থাৎ

কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতার কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবককে সংপৃক্ত করতে যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকা প্রয়োজন দ্রাবকটিতে যদি তার থেকেও বেশি পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকে, তাহলে ঐ দ্রবণকে অতিপৃক্ত দ্রবণ (Super saturated solution) বলা হয়।

এই ধরনের অতিপৃক্ত দ্রবণ কিন্তু খুব স্থায়ী হয় না। অতিপৃক্ত দ্রবণে যদি দ্রাবের একটি ছোট কণা ফেলে দেওয়া হয় দ্রবণের বাড়তি দ্রাবটুকু ঐ কণাটুকুকে অবলম্বন করে, কেলাসের আকারে দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে।

চিনির অতিপৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করে তার থেকে এই ভাবেই মিছরি তৈরি করা হয়। চিনির অতিপৃক্ত দ্রবণের মধ্যে মিছরির ছোট ছোট কণা সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঐ কণাগুলোকে অবলম্বন করে মিছরির বড় বড় কেলাস তৈরি হয়। সেই জন্যেই অনেক সময়ে মিছরির মধ্যে সরু সরু সুতো দেখতে পাওয়া যায়।

কোনও অসংপৃক্ত দ্রবণে যদি দ্রাবের পরিমাণ খুবই কম থাকে—তাহলে তাকে লঘু দ্রবণ (dilute solution) বলা হয়। পক্ষান্তরে কোনও অসংপৃক্ত দ্রবণে যদি দ্রাবের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হয়, তাহলে ঐ দ্রবণকে বলা হয় গাঢ় দ্রবণ (Concentrated Solution)। অধিক পরিমাণ জলে অল্প পরিমাণ অ্যাসিডের দ্রবণকে বলা হয় লঘু অ্যাসিড। পক্ষান্তরে অল্প পরিমাণ জলে অধিক পরিমাণ অ্যাসিডের দ্রবণকে বলা হয় গাঢ় অ্যাসিড।

প্রশ্ন

1. অতিপৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে?
2. অতিপৃক্ত দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করা হয়? অতিপৃক্ত দ্রবণ স্থায়ী না অস্থায়ী?
3. মিছরি কীভাবে তৈরি করা হয়?
4. লঘু দ্রবণ ও গাঢ় দ্রবণ বলতে কী বোঝ?

লবণ (NaCl)—পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) এবং চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$) তিনটি পদার্থই জলে দ্রাব্য অর্থাৎ জলে দ্রবীভূত হতে পারে। কিন্তু জলের মধ্যে চিনির দ্রবীভূত হবার ক্ষমতা যতখানি, KNO_3র ততখানি নয়, আবার KNO_3র যতখানি লবণের ততখানিও নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় জলে চিনির দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা সব থেকে বেশি, KNO_3-এর দ্রাব্যতা তার থেকে কম এবং লবণের দ্রাব্যতা সব থেকে কম। দ্রাবকে কোনও দ্রাবের দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতার পরিমাপই হল তার দ্রাব্যতা।

কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 100 গ্রাম পরিমাণ কোনও দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত হলে দ্রবণটি ঐ উষ্ণতায় সংপৃক্ত হয়, দ্রাবের পরিমাণ নির্দেশক গ্রামের সেই সংখ্যাটিকে ঐ উষ্ণতায় ঐ দ্রাবের দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা (Solubility) বলা হয়। দ্রাব্যতার কোনও একক নেই, এটি একটি সংখ্যা মাত্র।

যেমন '20°C উষ্ণতায় জলে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)-এর দ্রাব্যতা 36।' এই উক্তির অর্থ হল 20°C উষ্ণতা বিশিষ্ট 100 গ্রাম পরিমাণ জলে 36 গ্রাম পরিমাণ খাদ্য লবণ দ্রবীভূত হয়ে সংপৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে।

সাধারণত দ্রাবকের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবের দ্রাব্যতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই বৃদ্ধির হার এক এক দ্রাবের বেলায় এক এক রকম। যেমন জলে KNO_3-এর দ্রাব্যতা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে তুলনায় উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য লবণের দ্রাব্যতার কোনও বৃদ্ধি প্রায় হয় না বললেই চলে! এর আবার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4)-এর বেলায় দেখা যায়, তার দ্রাব্যতা 26°C পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশ দ্রুত হারেই বাড়তে থাকে কিন্তু 26°C এর পর হঠাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে শুরু করে দেয়।

নিচের তালিকায় দেখ, জলে কয়েকটি পদার্থের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

তরল দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রাবের ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে থাকে। সাধারণ উষ্ণতায় জলে বেশ কিছু পরিমাণ বায়ু দ্রবীভূত থাকে। জলের উষ্ণতা বাড়ালে ঐ দ্রবীভূত বায়ু জল থেকে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে যেতে থাকে। পক্ষান্তরে চাপ বৃদ্ধি করলে তরল দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রাবের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগে বেশি পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস (CO_2)-কে জলে দ্রবীভূত করে সোডা ওয়াটার প্রস্তুত করা হয়। সোডা ওয়াটারের বোতলের ছিপি খুললেই চাপ মুক্ত হওয়ার ফলে বাড়তি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঐ সোডা ওয়াটার থেকে বুদবুদ আকারে নির্গত হতে থাকে।

কঠিত দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রাবের দ্রাব্যতাও উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। প্যালেডিয়ামের উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে থাকলে প্যালেডিয়ামে অন্তর্ধৃত হাইড্রোজেন ক্রমশ বেরিয়ে আসতে থাকে।

উষ্ণতা °C	খাদ্য লবণ (NaCl)-এর দ্রাব্যতা	সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা	চিনির দ্রাব্যতা	পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা
0	35·7	5·0	179·2	12·0
20	36·0	19·4	204·0	30·0
40	36·6	48·8	238·1	62·5
60	37·3	45·3	287·3	110·0
80	38·4	43·7	362·2	—
100	39·8	42·5	487·2	—

প্রশ্ন

1. দ্রাব্যতা বা দ্রবণীয়তা বলতে কী বোঝ ?
2. '50°C উষ্ণতায় জলে পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা 39·1'—এই উক্তিটির অর্থ কী ?
3. তরল দ্রাবকে কঠিন দ্রাবের দ্রাব্যতার ওপর উষ্ণতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।
4. তরল ও কঠিন দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রাবের দ্রাব্যতা উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয় ?
5. কারণ বল—
   i. জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে থাকলে জল থেকে বুদবুদ বার হতে থাকে।
   ii. সোডা ওয়াটারের বোতলের ছিপি খুললেই ফেনা (effervescence) হয়।
6. 30°C উষ্ণতায় 40 গ্রাম জলে 18 গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত হয়ে সংপৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে। 30°C উষ্ণতায় জলে ঐ দ্রাবের দ্রাব্যতা কত ?
   [উত্তর ঃ 45]
7. 40°C উষ্ণতায় জলে একটি দ্রাবের দ্রাব্যতা 49। 40°C উষ্ণতায় 540 গ্রাম জলে কী পরিমাণ দ্রাব মেশালে দ্রবণটি সংপৃক্ত হবে ?
   [উত্তর ঃ 254·6 গ্রাম]
8. উপরে প্রদত্ত সারণিটি থেকে হিসেব করে বল 20°C উষ্ণতায় 40 গ্রাম জলে কী পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত করলে দ্রবণটি সংপৃক্ত হবে ?
   [উত্তর ঃ 81·6 গ্রাম]

অমৃতসূ দাস

পালসার

বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় মহাকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় 'পালসার' শব্দটা তোমরা নিশ্চয় পেয়েছ। পালসার শব্দটি এসেছে ঝলক বা Pulse থেকে। পালসার হল ঝলকে ঝলকে বেতার তরঙ্গ বিকিরণকারী দূর মহাকাশের এক প্রকার নক্ষত্র। এদের খুব শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও প্রায়ই ধরা যায় না। কিন্তু এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসান RADIO TELESCOPE বা বেতার দূরবীন দিয়ে। বেতার দূরবীন এই তারাদের থেকে আলোর সমান গতিতে ছুটে আসা বেতার তরঙ্গের শক্তি অনুভব করে এবং যন্ত্রের সাহায্যে বলে দেয় তাদের অবস্থান, আকার ও গতিপ্রকৃতি।

ফর্সা-কালো

ফর্সা রঙের দিকে মানুষের ঝোঁক চিরদিনের। কিন্তু এর জন্য দায়ী শুধু একটি রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ। এর নাম মেলানিন। যাদের চামড়ায় মেলানিন বেশি, যেমন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লোকেদের, তাদের রঙ কালো। আর চামড়ায় মেলানিন অপেক্ষাকৃত কম আছে যাদের, যেমন, শীতের দেশের লোকেদের—তাদের রঙ ফর্সা। আবার এই মেলানিন খুব কমে গেলে তা সব জায়গায় সমানভাবে থাকে না। ছোপ ছোপ হয়ে থাকে। তখন আমরা বলি শ্বেতী হয়েছে।

জীবন-বিজ্ঞান

আগের দিন আমরা পুনরনুশীলনের মাঝপথে এসে থেমেছিলাম। আজ বাকিটা শেষ করব। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া বাকি আছে, সেগুলো নিজেরা নিশ্চয়ই তৈরি করে ফেলেছ। ছোট উত্তরগুলো শেষ করে আজ কিছু বড় প্রশ্ন আর তোমাদের পাঠান চিঠিপত্রের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা করব।

পুষ্টি বিপাক ও পরিপাকের অবশিষ্ট উত্তর ঃ

১৭. ক্লোরোসিস রোগের কারণ উদ্ভিদ-দেহে লৌহের অভাব।

১৮. ভিটামিন B_1-এর অপর নাম থায়ামিন (Thiamine)।

১৯. ১৬ এপ্রিলের সংখ্যাতে ১১২ পাতায় দেওয়া সুষম খাদ্যের সংজ্ঞাটি লিখবে।

২০. ক. **পরজীবী ও পরাশ্রয়ীর পার্থক্য**

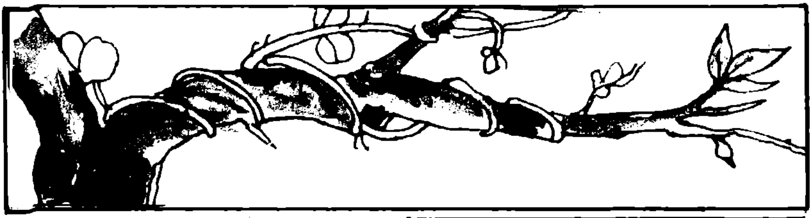

পরজীবী	পরাশ্রয়ী
১. এই ধরনের উদ্ভিদ অপর একটি উদ্ভিদের দেহের ওপর বসবাস করে এবং ঐ পোষক উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরে প্রস্তুত খাদ্য শোষণ করে তার মাধ্যমে পুষ্টি লাভ করে।	১. এই ধরনের উদ্ভিদ অপর একটি উদ্ভিদের দেহের উপর বসবাস করে। কিন্তু খাদ্যের জন্য ঐ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে না; নিজেরাই সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে।
২. পরজীবী উদ্ভিদ আংশিক বা পূর্ণ পরজীবী হতে পারে। পূর্ণ পরজীবীরা সালোকসংশ্লেষ করে না।	২. পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করে।
৩. এদের মূলে খাদ্য শোষণের জন্য হস্টোরিয়া (haustoria) নামক চোষক মূল থাকে।	৩. এদের মূলকে বলে ভেলামেন (velamen)। এই মূলের সাহায্যে এরা পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

(একটু বেশি নম্বর থাকলে এই দুই ধরনের উদ্ভিদের একটি বা দুটি করে উদাহরণ দিয়ে দেওয়া ভাল।)

খ. মাইক্রো-এলিমেন্টস ও ম্যাক্রো-এলিমেন্টস-এর পার্থক্য ঃ

মাইক্রো-এলিমেন্টস	ম্যাক্রো-এলিমেন্টস
১. এই মৌল পদার্থগুলো খুব সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদের দেহে প্রয়োজন হয়।	১. এই মৌল পদার্থগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয়।
২. এই মৌলগুলোর অভাবজনিত রোগের প্রকাশ ঘটে অনেক দেরিতে।	২. এই মৌলগুলোর অভাবে উদ্ভিদ দ্রুত রোগগ্রস্ত হয়।
৩. এই অভাবজনিত রোগগুলোর নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। সাধারণত এর ফলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হ্রাস ঘটে।	৩. এই অভাবজনিত রোগগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে। যেমন, লোহের অভাবে ক্লোরোসিস রোগে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
৪. মাইক্রো-এলিমেণ্টস-এর উদাহরণ—বোরোন, জিংক, মলিবডেনাম ইত্যাদি।	৪. ম্যাক্রো-এলিমেণ্টস-এর উদাহরণ—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্যাল-সিয়াম, লোহ, নাইট্রোজেন ইত্যাদি।

গ. অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের পার্থক্য ঃ

অন্তঃকোষীয় পরিপাক	বহিঃকোষীয় পরিপাক
১. এই পরিপাক কোষের অভ্যন্তরে ঘটে।	১. এই পরিপাক কোষের বাইরে ঘটে।
২. এই পরিপাক সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জীবগুলোর মধ্যে দেখা যায়। যেমন—অ্যামিবা।	২. এই পরিপাক অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রাণীদের দেখা যায়।
৩. এই পরিপাকের সময় খাদ্য সাধারণত খাদ্য গহ্বর (Food-vacuole)-এর মধ্যে থাকে। উৎসেচক খাদ্য গহ্বরে ক্ষরিত হয়।	৩. এই পরিপাকের সময় খাদ্য পৌষ্টিক নালীর মধ্যে থাকে। উৎসেচক পৌষ্টিক নালীতে ক্ষরিত হয়।

২১. বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার সময় জীবদেহে নানান রাসায়নিক বিক্রিয়ার কিছু জলের উৎপত্তি ঘটে। একে বিপাকীয় জল বলে। যেমন—গ্লুকোজের শ্বসনের ফলে উৎপন্ন জল।

২২. ঘটপত্রী উদ্ভিদ ও সূর্যশিশির উদ্ভিদ, যারা সরাসরি প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করে। (যে কোনও পতঙ্গভুক উদ্ভিদই পতঙ্গের দেহ থেকে সরাসরি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে।)

২৩. সুষম খাদ্যের একটি উদাহরণ দুধ। (একটি বিশেষ খাদ্য দিয়ে কখনই সুষম খাদ্যের সব কটি পয়েণ্ট মেলান সম্ভব নয়। তাই কোনও একটি খাদ্য কখনও সুষম খাদ্য হতে পারে না। তবে দুধ সুষম খাদ্যের খুবই

কাছাকাছি। তাই এই প্রশ্নের উত্তরে 'দুধ' লেখা ছাড়া উপায় নেই।)

২৪. ভিটামিন 'K' কয়েকটি ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে সংশ্লেষিত হতে পারে। (৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।)

২৫. মানবদেহে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অপরিসীম গুরুত্বের কারণ নিম্নরূপ—

ক. দেহকোষের তথা মানবদেহের বেশির ভাগ অংশই প্রোটিন দ্বারা নির্মিত।

খ. আমাদের দেহে যাবতীয় উৎসেচক, কয়েকটি হরমোন এবং অ্যান্টিবডি প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

গ. প্রয়োজনে, প্রোটিন শক্তিপ্রদানকারী খাদ্য হিসেবেও কাজ করতে পারে। প্রতি গ্রাম প্রোটিন থেকে 4 কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

ঘ. প্রোটিনের অভাবে হাত পা ফোলা অসুখ, কোয়াশিয়র্কর প্রভৃতি রোগ হয়।

২৬. একটি জৈব অনুঘটকের নাম পেপসিন (Pepsin)। এটি পাকস্থলীতে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সাহায্য করে।

২৭. দুটি প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের নাম পেপসিন (Pepsin) ও ট্রিপসিন (Trypsin)।

২৮. এই প্রক্রিয়াটির নাম আত্তীকরণ।

২৯. কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন—এই তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত।

৩০. স্নেহপদার্থে।

৩১. বোরোন মাইক্রো-এলিমেণ্ট।

৩২. অ্যামিবার আন্তঃকোষীয় পরিপাক হয়।

৩৩. উৎসেচকের দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—

ক. একেকটি উৎসেচক জীবদেহের মধ্যে ঘটতে থাকা একেকটি বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে, কিন্তু নিজে বিক্রিয়া শেষে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে অপরিবর্তিত থেকে যায়।

খ. প্রতিটি উৎসেচক একেকটি বিশেষ PH এবং বিশেষ তাপমাত্রার সীমার মধ্যে কাজ করে।

(১৬ এপ্রিলের ১০৯ পাতাটি অবশ্যই দেখবে। সেখানে ৬নং পয়েণ্টটাও খুব দরকারী।)

৩৪. মুখের লালায় টায়ালিন নামে একটি অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক থাকে।

৩৫. আয়োডিনের অভাবে থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরিত হয় না।

৩৬. সবুজ গাছের দ্বারা সংগৃহীত নাইট্রোজেনের উৎস মাটির নাইট্রোজেন ঘটিত বিভিন্ন লবণ (নাইট্রেট ও নাইট্রাইট)।

৩৭. জীব জগতের যে সভ্যেরা আলোক এবং পরিবেশের বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে, তাদের স্বভোজী বলে। যেমন—সবুজ উদ্ভিদ।

৩৮. দুধের মধ্যে প্রোটিন, শর্করা, স্নেহ-পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও জল—এই ছয় প্রকার খাদ্যই দেহের প্রয়োজনের উপযুক্ত পরিমাণে আছে। এইজন্য এটিকে আদর্শ খাদ্য বলে।

৩৯. দুটি পরজীবী উদ্ভিদের নাম স্বর্ণলতা (পূর্ণ পরজীবী) এবং বেনেবৌ (আংশিক পরজীবী)।

৪০. ভিটামিন 'এ'র অপর নাম রেটিনল। (ভিটামিন 'এ'র দুটি রাসায়নিক রূপ আছে। তাদের নাম যথাক্রমে 'রেটিনল' ও 'রেটিনাল'। রেটিনলকে

অ্যাজেরফথল বলেও ডাকা হয়। শেষোক্ত নামটির কারণ, ভিটামিন 'এ'র উপস্থিতিতে জেরফথ্যালমিয়া রোগটি হয় না।)

৪১. আলু থেকে আমরা শর্করা জাতীয় খাদ্য (শ্বেতসার) পাই।

৪২. ১৬ এপ্রিলের ১১৬ পৃষ্ঠায় BMR-এর সংজ্ঞাটি দেখ।

৪৩. খাদ্যে নিয়াসিনঅ্যামাইডের অভাবে পেলাগ্রা রোগ হয়। (Nicotinic) অ্যাসিড, নিয়াসিন এবং নিয়াসিন অ্যামাইড একই ভিটামিন। দেহের ভিতরে এদের একটির থেকে অন্যটিতে পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে।)

৪৪. একাধিক উদ্ভিদ একে অপরকে সাহায্য করে পরস্পরের কাছ থেকে উপকার গ্রহণের ভিত্তিতে বেঁচে থাকলে তাদের সহবাসী উদ্ভিদ বলে। যেমন, লাইকেন। লাইকেন উদ্ভিদটি একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাকের সহবাসের ফলে সৃষ্ট হয়। (১ এপ্রিলের পড়াতে ১১২ পাতায় 'মিথোজীবী উদ্ভিদ' বলতে 'সহবাসী উদ্ভিদ' বোঝান হয়েছে। প্রশ্নপত্রে 'সহবাসী উদ্ভিদ' কথাটি না থাকলে তোমরা 'মিথোজীবী উদ্ভিদ' শব্দটাই ব্যবহার করবে।

৪৫. এ দুটি স্নেহপদার্থে দ্রাব্য ভিটামিন।

৪৬. ভিটামিন 'ডি'র রাসায়নিক নাম কোলেক্যালসিফেরল (cholecalciferol)।

৪৭. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড জলে দ্রাব্য এবং ফাইলোকুইনোন স্নেহপদার্থে দ্রাব্য ভিটামিন।

রক্ত ও সংবহনের উত্তর

১. রক্ত একটি তরল যোগ কলা। (মনে আছে ত, প্রাণীদেহে একমাত্র তরল কলা এই রক্ত।)

২. ক. জাইলেম ও ফ্লোয়েমের পার্থক্য ঃ

জাইলেম	ফ্লোয়েম
১. জাইলেম একটি মৃত কলা।	১. ফ্লোয়েম একটি জীবিত কলা।
২. জাইলেমের সাহায্যে মূল দ্বারা শোষিত রস পাতায় পৌঁছায়।	২. ফ্লোয়েমের সাহায্যে পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।
৩. জাইলেমের মাধ্যমে সংবাহিত বস্তু ঊর্ধ্বদিকে যায়।	৩. ফ্লোয়েমের সাহায্যে সংবাহিত বস্তু সাধারণত নিম্নদিকে যায়।
৪. জাইলেম কলা জাইলেম বাহিকা, ট্র্যাকিড ইত্যাদির সাহায্যে গঠিত।	৪. ফ্লোয়েম কলা সীভ নল ও সঙ্গী কোষের দ্বারা গঠিত।

(এখানে মনে করিয়ে দিই, সময়বিশেষে জাইলেমের মধ্য দিয়ে শুধু শোষিত রস নয়, উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্যও সংবাহিত হয়। আবার ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে খাদ্য শুধু নিম্নদিকে নয়, ঊর্ধ্বদিকেও যেতে পারে; এবং একই সময়ে একই সীভ নলের মধ্য দিয়ে খাদ্য নিচ থেকে ওপরে আর ওপর থেকে নিচে সঞ্চালিত হতে পারে।)

খ. হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের পার্থক্য ঃ

হিমোগ্লোবিন	হিমোসায়ানিন
১. হিমোগ্লোবিন একটি লৌহঘটিত প্রোটিন।	১. হিমোসায়ানিন একটি তাম্রঘটিত প্রোটিন।
২. হিমোগ্লোবিনের রং লাল।	২. হিমোসায়ানিনের রং নীল।
৩. হিমোগ্লোবিন অঙ্গুরীমাল ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তে শ্বাসকণারূপে কাজ করে।	৩. হিমোসায়ানিন সন্ধিপদ ও কম্বোজ প্রাণীদের রক্তে শ্বাসকণারূপে কাজ করে।

গ. আস্রবণ ও ব্যাপনের পার্থক্য ঃ

আস্রবণ	ব্যাপন
১ একটি আভেদ্য (Semipermeable) পর্দার মধ্য দিয়ে লঘু ঘনত্বের থেকে উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণ বা মিশ্রণের দিকে জলের গতিকে আস্রবণ বলে।	১ একটি মাধ্যমে প্রলম্বিত কোনও পদার্থের কণাগুলো পদার্থের উচ্চ ঘনত্ব অঞ্চল থেকে নিম্ন ঘনত্ব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে সেই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।
২. একটি আভেদ্য পর্দা অবশ্যই থাকে, যার মধ্য দিয়ে আস্রবণ ঘটে।	২. কোনও পর্দা থাকে না যদি থাকে, সেটি ভেদ্য পর্দা হয়।
৩. আভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে জলের অণুগুলো চলাচল করে প্রলম্বিত পদার্থের অণুগুলো করতে পারে না।	৩. প্রলম্বিত পদার্থের অণুগুলোই চলাচল করে।

(বুঝতেই পারছ, আস্রবণ আর অভিস্রবণ একই কথা, ইংরাজীতে যার নাম Osmosis. আর খেয়াল করবে, প্রথম পয়েন্টে দুটি প্রক্রিয়ারই সংজ্ঞা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।)

৩. জাইলেম কলার ভেতর দিয়ে মূল থেকে পাতায় জল যায়।

৪. স্তন্যপায়ীর রক্তের অপর যে কোনও দুইটি উপাদানের নাম শ্বেতরক্তকণিকা ও লোহিতরক্তকণিকা। (প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র রক্তকে দুভাগে ভাগ করা হয়, (ক) প্লাজমা বা রক্তরস, (খ) কোষ। কোষের মধ্যে আছে শ্বেতকণিকা লোহিতকণিকা ও অণুচক্রিকা। সুতরাং প্লাজমা ব্যতীত রক্তের অন্য উপাদান একটিই, সেটি হল 'বিভিন্ন ধরনের কোষ'। কিন্তু এখানে প্রশ্নের ধারা অনুযায়ী উত্তর অন্যভাবে দিতে হয়েছে।

৫. এই কলার নাম ফ্লোয়েম। (এখানে 'translocation'-এর বাঙলা সংবহন করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে 'সঞ্চালন' শব্দটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। সংবহন শব্দটি জাইলেমের মাধ্যমে রসের ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ, 'সংবহন' ব্যবহৃত হয় 'conduction'-এর বাঙলা হিসেবে।)

৬. থ্রম্বোসাইটের কাজ প্রথমে সাময়িকভাবে রক্ত পড়া বন্ধ করা এবং তারপর রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করা।

৭. রক্তের তঞ্চনের সময় রক্তের কোষসমূহ এবং রক্তের তঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয়

হরিদ্রাভ অংশটি অবশিষ্ট থাকে, তাকে সিরাম বলে। প্রোটিনগুলো (যেমন, ফাইব্রিনোজেন) ব্যবহৃত হয়ে গেলে রক্তরসের যে

রক্ত

(রক্তরস + WBC + RBC + অণুচক্রিকা)

রক্তের তঞ্চিত অংশ	সিরাম
(WBC + RBC + অণুচক্রিকা + ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চনকার্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কয়েকটি প্রোটিন)	(রক্তরস—ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চনকার্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কয়েকটি প্রোটিন)

(তীরচিহ্ন ইত্যাদির সাহায্যে আঁকা চার্টটা তোমার বোঝার সুবিধার জন্য দেওয়া হল, এটা লেখার দরকার নেই।)

৮. মানুষের তরল কলার নাম রক্ত।

৯. (মানুষের) রক্তে শতকরা 14·5 ভাগ হিমোগ্লোবিন থাকে। (রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অবশ্য নির্দিষ্টভাবে 14·5% নয়। এর থেকে সামান্য কম বা বেশিকেও স্বাভাবিক সীমা বলেই ধরা হয়।)

১০. ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করা।

১১. নিউক্লিয়াসবিহীন একটি প্রাণী-কোষের নাম মানুষের পরিণত লোহিতরক্তকণিকা। (মানুষের লোহিতরক্তকণিকা তৈরি হওয়ার সময় প্রথম দিকে নিউক্লিয়াস যুক্ত থাকে। পরে এই নিউক্লিয়াস অদৃশ্য হয়। এই জন্য 'পরিণত' কথাটি বলা প্রয়োজন।)

১২. ১৬ মে সংখ্যার ১০৭ এবং ১০৯ পাতা দেখে নাও।

১৩. ফাইব্রিন এক ধরনের জালকের মত প্রায় কঠিন পদার্থ। এটি এক জটিল প্রক্রিয়ায় ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন থেকে তৈরি হবার ফলে রক্তের তঞ্চন ঘটে।

১৪. রক্তরস ও রক্তকণিকার পার্থক্য ঃ

রক্তরস	রক্তকণিকা
১. রক্তরস প্রধানত জল (প্রায় 90%) এবং তার সঙ্গে কিছু কঠিন পদার্থ (10%) সহযোগে গঠিত।	১. রক্তকণিকা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ধরনের কোষ। এই কোষ সাধারণত তিন রকম থাকে।
২. রক্তরসে রক্তকণিকা প্রলম্বিত থাকে।	২. রক্তকণিকা রক্তরসের সান্দ্রতা (viscosity) বৃদ্ধি করে।
৩. রক্তরসের প্রধান কাজ রক্তকণিকা ও অন্যান্য পদার্থের সংবহন।	৩. রক্তকণিকাদের প্রধান কাজগুলো হল, শ্বেতকণিকা—জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা। লোহিতকণিকা—অক্সিজেন সংবহন। অণুচক্রিকা—রক্তের তঞ্চন ঘটান।

১৫. উদ্ভিদের মূল দ্বারা শোষিত রস অভিকর্ষের বিরুদ্ধে মূল থেকে পাতায় পৌঁছানর প্রক্রিয়াটিকে রসের উৎস্রোত বলে।

১৬. প্লাজমার কাজ—ক. রক্তকণিকাগুলোকে নিজের মধ্যে প্রলম্বিত রেখে দেহের বিভিন্ন স্থানে সংবাহিত করা, খ. CO_2, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, হরমোন, রেচন পদার্থ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সংবাহিত করা, গ. দেহের তাপ ও অম্লতার ভারসাম্য রক্ষা করা, ঘ. দেহকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করা, ঙ. রক্তের তঞ্চনে সাহায্য করা। (১৬ মে-র ১১২ পৃষ্ঠাতে 'রক্তের বিভিন্ন কাজ' একবার দেখে নিলেই আরও বিস্তৃতভাবে প্লাজমার কাজগুলো সম্বন্ধে মনে পড়বে।)

১৭. অণুচক্রিকা এক প্রকার রক্তকণিকা, যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। (১ নম্বরের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট।)

১৮. হেপারিন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা রক্তে থাকে। এর ফলে সংবহনের সময় সাধারণ অবস্থায় রক্ত জমাট বেঁধে যায় না।

১৯. স্তন্যপায়ীর (পরিণত) লোহিত-রক্তকণিকাতে নিউক্লিয়াস থাকে না। এই বৈশিষ্ট্য দেখে স্তন্যপায়ীর লোহিতরক্তকণিকা চেনা যায়। (এর একটি ব্যতিক্রম আছে। উট স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু এর RBC-তে নিউক্লিয়াস আছে।)

২০. আমাদের দেহে লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর

১. ক. হ্যাঁ। (তিমি স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ীরা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।)
খ. না। (অর্কিড এক ধরনের এপিফাইট।)
গ. হ্যাঁ।

২. ক. কিছুই না।
খ. ত্বকের সাহায্যে।
[এই ধরনের প্রশ্নে তোমার সমস্ত প্রশ্নটা লিখে ঠিক উত্তরটার ওপর '√' বসিয়ে দিতে হবে।]

৩. মানবদেহের একটি কঠিন কলা অস্থি এবং একটি তরল কলা রক্ত।

৪. জীবের জীবনীশক্তি প্রোটোপ্লাজমে সঞ্চিত থাকে।

৫. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens)।

বড় প্রশ্ন

আগেই বলেছি, তোমাদের বড় প্রশ্নগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসলে কয়েকটি ছোট প্রশ্নের সমষ্টি। এর ব্যতিক্রম অল্প। যাই হোক, এখানে কয়েকটা বড় প্রশ্নের নমুনা দিলাম, যেগুলো পরীক্ষায় বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। এদের উত্তরগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে তৈরি করে নেবে।

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য

১. সবাত শ্বসন ও দহনের মধ্যে পার্থক্য কী? বিভিন্ন প্রাণীর দেহে বায়ু থেকে অক্সিজেন সংবহন ব্যবস্থা উল্লেখ কর। উদ্ভিদের কোন সুনির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গ আছে কি?

৩ + ১০ + ১ = ১৪

২. শ্বসনের সংজ্ঞা কী? কোহল সন্ধানের সঙ্গে অবাত শ্বসনের পার্থক্য কী? শ্বসনের তাৎপর্য কী? যে কোন চারটি শ্বাস অঙ্গের নাম কর, যা প্রাণীদেহে অবস্থিত।

৩ + ৩ + ৪ + ৪ = ১৪

৩. সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে? এই প্রক্রিয়ায় কী কী উপাদান প্রয়োজন? এই প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণটি লেখ। প্রক্রিয়াটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কার্বন আত্তীকরণ বলতে কী বোঝ?

২ + ২ + ১ + ৭ + ২ = ১৪

৪. সালোকসংশ্লেষের সঙ্গে শ্বসনের পার্থক্য কী? সালোকসংশ্লেষের ফলে জীব-জগৎ কিভাবে উপকৃত হয়? অবাত শ্বসনের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লেখ। শ্বসন ও শ্বাসকার্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪ + ৭ + ১ + ২ = ১৪

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক

১. ভিটামিন কী? তোমার পরিচিত ভিটামিনগুলোর নাম লেখ। ভিটামিন-গুলোর উৎস এবং মানবদেহে তাদের অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলো উল্লেখ কর। মানবদেহে কোন ভিটামিনের সংশ্লেষ সম্ভব?

১ + ৩ + ৩ + ৬ + ১ = ১৪

২. পুষ্টি কাকে বলে? প্রাণীর পুষ্টির বিভিন্ন পর্যায়গুলো কী কী? বিভিন্ন পর্যায়গুলোর সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির নাম লেখ। ১ + ২ + ৪ = ৭

(এই প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় অংশটি লেখার সময় প্রতিটি পর্যায় সম্বন্ধে এক থেকে ২ লাইন লিখবে, ঠিক যেটুকু না লিখলে নয়। কিন্তু যদি নম্বর থাকে ২ + ২ + ১০ = ১৪, তাহলে কিছুটা বিস্তৃতভাবে লিখতে হবে।)

৩. মৌলিক উপাদান ও স্বল্পমৌলিক উপাদান (**Essential elements and trace elements**)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? যেকোন চারটি অধাতব মৌলিক উপাদানের নাম কর ও তাদের কার্যকারিতা উল্লেখ কর। ৩ + ৪ = ৭

৪. মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ-গুলোর নাম লেখ। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পরিপাক ও শোষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৩ + ১১ = ১৪

রক্ত ও সংবহন

১. রক্ত কী? রক্তের উপাদানগুলো কী কী? বিভিন্ন রক্তকণিকার কাজ উল্লেখ কর। ১ + ২ + ৪ = ৭

২. সংবহন কাকে বলে? উদ্ভিদদেহে কী কী পদার্থ সংবাহিত হয়? কোন কোন কলায় উদ্ভিদের সংবহন ঘটে? উদ্ভিদের সংবহন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

২ + ২ + ২ + (৪ + ৪) = ১৪

(ব্র্যাকেটে দুটো '৪' মানে জাইলেমের সংবহনের জন্য '৪' এবং ফ্লোয়েমের সংবহনের জন্য '৪'।)

বড় প্রশ্নের উত্তর

তোমাদের পড়ানর সময় প্রত্যেকটা অংশ এমনভাবে বলে দেওয়া আছে, যে ভাষার সামান্য অদলবদল করে নিলেই সেগুলোকে বড় প্রশ্নের উত্তরে দাঁড় করান যাবে। একটি প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়ার জন্য অনেকেই চিঠি দিয়েছ; তাই সেই উত্তরটা দিলাম, পরীক্ষায় ঠিক যেভাবে লিখতে হবে, সেইভাবে।

প্রশ্ন: সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ধরে নেওয়া হচ্ছে, এই প্রশ্নটির আগের অংশে সালোকসংশ্লেষের সংজ্ঞাটি, উপাদানগুলোর নাম ও সমীকরণ লেখা হয়ে গেছে।)

উত্তর: সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গে, প্রধানত পাতায় ঘটে।

পাতায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্লোরোফিল

থাকে। পাতার স্টোমার মধ্য দিয়ে বায়ু থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করে, এবং কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড শ্বসনের উপজাত-রূপে পাওয়া যায়। মূল থেকে শোষিত রস জাইলেমের মাধ্যমে পাতায় এসে পৌঁছায়। পাতার ওপর পতিত সূর্যালোক সাধারণত সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় আলোকের কাজ করে।

সূর্যালোকের দ্বারা বাহিত ফোটন কণা পাতার ওপর পড়ে আলোকশক্তির সাহায্যে পাতার ক্লোরোফিলকে উদ্দীপ্ত করে। উদ্দীপ্ত ক্লোরোফিল জলকে বিশ্লিষ্ট করে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রক্সিল আয়নে ভেঙে ফেলে।

$$H_2O \xrightleftharpoons{\text{উদ্দীপ্ত ক্লোরোফিল}} H^+ + OH$$

এই বিক্রিয়াকে বলে সালোকবিশ্লেষণ (**Photolysis**) আলোকের সাহায্য ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার এই ধাপটি হয় না বলে এই পর্যন্ত বিক্রিয়াকে আলোক বিক্রিয়া (**Light reaction**) বলে।

এরপর এক জটিল প্রক্রিয়ায় হাইড্রক্সিল আয়ন থেকে অক্সিজেন মুক্ত হয় এবং জলের হাইড্রোজেন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শর্করা (গ্লুকোজ) প্রস্তুত করে। উপজাত অক্সিজেনের কিছু অংশ শ্বসনের কাজে ব্যবহৃত হয়, বাকি অংশটি পরিবেশে মুক্ত হয়। আলোক প্রয়োজন হয় না বলে আলোক বিক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলোকে একসঙ্গে অন্ধকার বিক্রিয়া (**Dark reaction**) বলে।

[আগে সমীকরণ লেখা না থাকলে এখানে সমীকরণটা দিতে হবে।] সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে।

[যে দুটি বাক্যে 'আলোক বিক্রিয়া' আর 'অন্ধকার বিক্রিয়া'র কথা লেখা আছে, সে বাক্য দুটি তোমাদের ইচ্ছে হলে লিখতে পার ; না লিখলেও ক্ষতি নেই।]

তোমাদের চিঠিপত্রের উত্তর

যাদের চিঠি পেয়েছি, তাদের সকলকেই প্রথমে বলব ১ জুলাই সংখ্যাতে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে যা লেখা আছে, সেটা একবার দেখে নিতে। সেটা দেখলে বুঝতে পারবে, যেসব প্রশ্ন নিয়ে তোমরা ভয় পাচ্ছ, তাদের বেশিরভাগই সিলেবাসের বাইরে। যেসব প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার প্রয়োজনে তোমাদের জানার একেবারেই প্রয়োজন নেই, সেগুলো বাদ দিলাম। যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় দরকারী, আর যেগুলো পরীক্ষায় না এলেও জেনে রাখা ভাল এরকম কিছু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। খেয়াল রেখ, পরীক্ষার খাতায় ঠিক যেমন ভাষায় লিখতে হবে, এখানে তেমন ভাষা ব্যবহার করছি না। তথ্যগুলো জানানই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

১. **কল্যাণী থেকে জবা সেন** জানতে চেয়েছ, ক্লোরোফিল যে গোলাকার চাকতির মত বস্তুর মধ্যে থাকে, তাকে থাইলাকয়েড বলে কিনা। উত্তর হল, হ্যাঁ। কয়েকটি থাইলাকয়েড (**Thyllacoid**) মিলে একেকটি গ্র্যানা (**grana**) অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। তবে মাধ্যমিক স্তরে ক্লোরোপ্লাস্ট স্ট্রোমা আর গ্র্যানা দিয়ে গঠিত জানাই যথেষ্ঠ।

২. **নবদ্বীপ থেকে কল্লোল সাঁই** জানতে চেয়েছ, ক্লোরোফিলের পরিমাণ উদ্ভিদদেহে যেখানে যত বেশি, সেখানে সালোকসংশ্লেষ তত বেশি হয় কিনা। কারণ, তুমি একটি বইতে পড়েছ, ক্লোরোফিলের পরিমাণের সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হারের কোন সম্পর্ক নেই।

এর উত্তরে বলি, কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গে সালোকসংশ্লেষ পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকলে

সেখানে অতিরিক্ত ক্লোরোফিলের উপস্থিতি সালোকসংশ্লেষের হারের বৃদ্ধি ঘটাবে না। সুতরাং, গাণিতিকভাবে, ক্লোরোফিলের পরিমাণের সঙ্গে সালোকসংশ্লেষের হারের আনুপাতিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু উদ্ভিদ-দেহের যে সকল অংশে সালোকসংশ্লেষের অন্যান্য উপকরণগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত, সেখানে ক্লোরোফিলের অভাবে যাতে সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত না হতে পারে, ঐ স্থানগুলোতে (যেমন, পাতায়) ক্লোরো-ফিল বেশি পরিমাণে মজুত রাখা হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। এই কারণেই মূলে ক্লোরোফিল থাকে না এবং বিষমপৃষ্ঠ পাতার উপরিপৃষ্ঠে নিচের পিঠের চেয়ে বেশি ক্লোরোফিল থাকে। সুতরাং, ক্লোরো-ফিলের আধিক্য দেখে বোঝা যায় যে সেখানে সালোকসংশ্লেষের হার বেশি।

৩. **দুর্গাপুর থেকে সুস্মিতা ঘোষ** জানতে চেয়েছ, বৃদ্ধ মানুষের পুষ্টি ঘটে কিনা। আমরা তাহলে দেখে নিই ১৬ মার্চের সংখ্যায় ৯৭ পৃষ্ঠাতে পুষ্টির সংজ্ঞা হিসেবে কী বলা হয়েছে। লেখা আছে 'পুষ্টি কয়েকটি পদ্ধতির সমষ্টিগত ফল, যার মাধ্যমে জীবদেহ জীবন ধারণের শক্তি সংগ্রহ করে, দেহের ক্ষয়পূরণ করে ও ক্ষেত্র-বিশেষে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।' একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে শক্তিসংগ্রহ করেন, এতে ত কোন সন্দেহই নেই। ঐ খাদ্য দেহের ক্ষয়পূরণেও সাহায্য করে, কিন্তু বয়স যত বাড়তে থাকে, ঐ ক্ষয়পূরণের পরিমাণ ততই একটু একটু করে কমতে থাকে। ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কমজোরী হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু দেহের বৃদ্ধি তখন আর ঘটে না। বৃদ্ধদের কথা মনে রেখেই সংজ্ঞাতে 'ক্ষেত্রবিশেষে' কথাটি 'দেহের বৃদ্ধি'র আগে যোগ করা হয়েছে। তাহলে মোট কথা দাঁড়াল, শক্তি সংগ্রহ এবং আংশিক ক্ষয়পুরণের মাধ্যমে বৃদ্ধ মানুষের দেহে পুষ্টি ঘটে।

৪. **বাঁকুড়ার সানাবাঁধ থেকে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** এবং বাঁকুড়ার শালবনী থেকে তনিমা গরাই, শেফালী মণ্ডল ও সুনীল ঘোষের প্রশ্ন— সুষম খাদ্য ও আদর্শ খাদ্য একই কিনা। এবং, দুধ সুষম খাদ্য, না, আদর্শ খাদ্য।

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাকের ১৯, ২৩ আর ৩৮ নম্বর প্রশ্ন তিনটির উত্তর দেখে নিলেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। সেইসঙ্গে বলি, সুষম খাদ্য প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নপ্রকার সুনির্বাচিত খাদ্যের একটি মিশ্রণ, যা দেহকে সুষম পুষ্টি দিতে পারে। কিন্তু আদর্শ খাদ্য হল একটি বিশেষ খাদ্য বা রান্না করা বস্তু, যা একাই মোটামুটি সুষম খাদ্যের কাজ চালাতে পারে। তাই দুধ আদর্শ খাদ্য। আদর্শ খাদ্যের আরেকটি উদাহরণ খিচুড়ি।

৫. **গরচা থেকে অভীক সাহা** যে প্রশ্নটি পাঠিয়েছ, সেটি সত্যিই একটি ভাল প্রশ্ন। বইতে সালোকসংশ্লেষের যে বিবরণ দেওয়া থাকে, তা বিশ্লেষণ করে তুমি দেখিয়েছ, সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন O_2-এর উৎস শুধু জল নয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইডও। কিন্তু সব জায়গাতেই লেখা আছে, এই বিক্রিয়ায় O_2-এর উৎস জল। কোনটি ঠিক ?

সালোকসংশ্লেষের পুনরনুশীলনের ৪২ নম্বর প্রশ্নটি দেখলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। বৈজ্ঞানিক Hill প্রথমে পরীক্ষার সাহায্যে এবং পরে সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে এখানে O_2-এর উৎস শুধুই জল। সালোকসংশ্লেষের মধ্যে কয়েকটি Hill Reaction বা হিল-বিক্রিয়া ঘটতে থাকার ফলে এটি সম্ভব হয়। কিন্তু এই বিক্রিয়াটি তোমাদের বোঝার পক্ষে খুবই কঠিন। তাই তোমাদের পুরোন মতটিই এখনকার মত পড়ান হয়ে থাকে।

১ জানুয়ারির পড়ায় ১০৯ পাতাতে সালোকসংশ্লেষের বিবরণটি দেখে নিলে বুঝতে পারবে লেখা এবং ছবির মাধ্যমে কিভাবে ঠিক বিক্রিয়াটি সহজভাবে বোঝান যায়।

৬. **হাওড়া থেকে শমিত চৌধুরী** জানতে চেয়েছ—

ক. EMP কী ?

খ. এক অণু গ্লুকোজের সবাতজারণে কয়টি ক্রেবস চক্র প্রয়োজন ?

গ. কয়েকটি হিল বিক্রিয়কের নাম কর।

উত্তর—

ক. EMP মানে Embden Meyerhof Pathway. এটি গ্লাইকোলিসিসের অপর নাম।

খ. দুটি ক্রেবস চক্র প্রয়োজন।

গ. কয়েকটি হিল বিক্রিয়কের নাম— অক্সালেট, ফেরিসায়ানাইড এবং ক্রোমেটের বিভিন্ন লবণ এবং বিভিন্ন কুইনোন। (এ প্রশ্নটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু শমিতের একান্ত অনুরোধে এর উত্তর দেওয়া হল।)

৭. **নন্দীগ্রাম থেকে মুক্তার আহমেদ খাঁ** প্রশ্ন করেছ—সালোকসংশ্লেষের জন্য যে আলো ও CO_2 প্রয়োজন হয়, তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ কর।

৮. **বসিরহাট থেকে পার্থপ্রতিম ব্যানার্জী** জিজ্ঞাসা করেছ—

ক. কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক নালী অঙ্কন,

খ. একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্র অঙ্কন,

গ. একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ অঙ্কন—

মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা এই প্রশ্নগুলো সিলেবাস বহির্ভূত কিনা ? এরকম প্রশ্নের উত্তরে কী লিখতে হবে ?

মুক্তার আর পার্থপ্রতিম দুজনকেই বলছি, এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হবে ক্লাস নাইনের শেষ দিকে ; কারণ এগুলো শেষ অধ্যায়ে আছে। পার্থর ব্যক্তিগত প্রশ্নটির উত্তরে জানাই, তোমার বন্ধু সালোকসংশ্লেষের উত্তরে যা লিখেছে, তাতে তার এতটুকুও আশঙ্কার কিছু নেই। এ ব্যাপারে ১ জুনের পৃ: ১০০ একবার দেখে নিও।

৯. **মহেশতলা থেকে শেখ ফারুক হোসেন** জানতে চেয়েছ—শ্বসনকে ভৌত রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে কেন ?

উত্তর : শ্বসন বিক্রিয়াটি অসংখ্য উৎসেচক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই বিক্রিয়ার বেশিরভাগ ধাপগুলোই উভমুখী বিক্রিয়া। এই উভমুখী বিক্রিয়াগুলোর গতি বিভিন্ন শর্তের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। এগুলোকে বলে ভৌত রাসায়নিক বিক্রিয়া। তাই সামগ্রিকভাবে শ্বসনকে ভৌত রাসায়নিক বিক্রিয়া বলা যায়। (বুঝতেই পারছ, এ ব্যাপারে মাধ্যমিক স্তরে তোমাদের জানার দরকার নেই।

১০. **নৈহাটি থেকে সুকন্যা রায়চৌধুরী**—আমাদের পঠিত অংশের থেকে যে কয়টি প্রশ্ন করেছ, তাদের উত্তর দিলাম—

ক. সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন O_2 উদ্ভিদ নিজেই দিবারাত্র শ্বসনের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে। তা সত্ত্বেও, 'সালোকসংশ্লেষের ফলে O_2-র সমতা বজায় থাকে' —এ কথা বলা হয় কেন ?

উত্তর : এর কারণ উদ্ভিদ শুধু দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষের ফলে যে অক্সিজেন উৎপন্ন করে, তার পরিমাণ উদ্ভিদের সমগ্র দিনের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের চেয়েও বেশি।

খ. আমরা হাই তুলি কেন ?

উত্তর : দেহের রক্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশি হয়ে দাঁড়ালে

দেহ সেই অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে দেহ থেকে বার করে দিতে চেষ্টা করে। এইজন্য হাই ওঠে।

গ. রজনীগন্ধার স্টিক জলে ডুবিয়ে রাখলে কিছুদিন সতেজ থাকে কেন ?

উত্তর: এর কারণ দুটি—

ক. এর ফলে স্টিকটি শুকিয়ে মরে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

খ. আহৃত জলের সাহায্যে এরা অনুকূল পরিবেশে সালোকসংশ্লেষও করতে পারে।

ঘ. রক্ত নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো থেকে কী গ্রহণ করে ও কী বর্জন করে ?

i. ফুসফুস ii. বৃক্ক iii. ক্ষুদ্রান্ত্র iv. চর্ম।

অঙ্গ	গ্রহণ করে	বর্জন করে
i. ফুসফুস	অক্সিজেন	১. কার্বন-ডাই-অক্সাইড ২. জলীয় বাষ্প ৩. অ্যাসিটোন (কয়েকটি অসুখে)
ii. বৃক্ক	১. রেনিন ২. এরিথ্রো-পোইয়েটিন (দুটি হরমোন)	১. জল ২. নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ, যেমন—ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড
iii. ক্ষুদ্রান্ত্র	১. গ্লুকোজ ও অন্যান্য সরল শর্করা ২. অ্যামাইনো অ্যাসিড ৩. গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ৪. ভিটামিন ৫. লবণ ৬. জল	
iv. চর্ম	ভিটামিন 'ডি'	১. জল ২. লবণ

১১. **দুর্গাপুর থেকে তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়** জানতে চেয়েছ, উদ্ভিদের মিথোজীবীত্বের উদাহরণ হিসাবে লাইকেনের চেয়ে মটর গাছ ও রাইজোবিয়ামের মিথোজীবীত্ব বেশি ভাল কিনা।

উত্তর: তোমার বলা উদাহরণটি বহুল প্রচলিত। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, রাইজোবিয়াম এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া। তাই আমি একটি ছত্রাক ও একটি শৈবালের মিথোজীবীত্বের উদাহরণ হিসেবে লাইকেনের নাম করেছি।

১২. **কলকাতার রামধন মিত্র লেন থেকে সঞ্জীবকুমার সাহা** জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে—

ক. সালোকসংশ্লেষ করতে পারে এরকম কয়েকটি প্রাণীর নাম।

খ. সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ বেশি হলে কী হয় ? এর প্রতিকার কী ?

গ. B_1-B_{12} প্রত্যেকটি ভিটামিনের রাসায়নিক নাম ও অভাবজনিত রোগ।

ঘ. একটি কোষবিহীন জীবের নাম।

উত্তর:

ক. ইউগ্লেনা ও ভলভক্স।

খ. সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন শর্করার (গ্লুকোজের) পরিমাণ বেশি হলে পাতার ভিতরে যে রস থাকে, তার ঘনত্ব বেড়ে যায়। তখন স্টোমা বন্ধ হয়ে যায়, সেইসঙ্গে সালোকসংশ্লেষও বন্ধ থাকে।

কিন্তু এই সমস্যার একটা সমাধান আছে। আর, সেটি না থাকলে সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে না হতেই সব উদ্ভিদের দেহে সালোকসংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যেত।

সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন শর্করা, তৈরি হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই, পাতার অভ্যন্তরে উৎসেচকের সহায়তায় শ্বেতসারে পরিণত হয়। এই শ্বেতসার জলে অদ্রাব্য হওয়ায় পাতার রসের ঘনত্ব প্রায় কিছুই বৃদ্ধি পায় না। ফলে, সালোকসংশ্লেষ চলতে থাকে।

গ. এই প্রশ্নটি নানানভাবে আরও অনেকে জিজ্ঞাসা করেছ। আসলে, ভিটামিন যখন প্রথম আবিষ্কার হতে শুরু করে, তখন এদের নাম বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর ও সংখ্যা দিয়ে দেওয়া হত। এখন, B_1, B_2, B_6 আর B_{12} ছাড়া কোনটির বেলাতেই এই অক্ষরের ব্যবহার নেই। এখন ভিটামিনগুলোকে সাধারণত রাসায়নিক নামেই ডাকা হয়। আর একটা কথা। তোমাদের যে কয়টি ভিটামিন পড়ান হয়েছে, তার বাইরে আর কিছু সামনের চার বছরের মধ্যে জানার প্রয়োজন নেই।

ঘ. একটি কোষবিহীন জীবের নাম—ভাইরাস।

১৩. **দুর্গাপুর থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুরেশ চট্টোপাধ্যায়** জানতে চেয়েছে 'স্তন্যপায়ীদের RBC-তে নিউ-ক্লিয়াস থাকে না। কিন্তু উটের RBC-তে থাকে।' এ কথা ঠিক কিনা।

উত্তর: রক্ত ও সংবহনের ১৯ নম্বর উত্তরে নিশ্চয়ই এর সমাধান পেয়ে গেছ।

১৪. **সোনারপুর থেকে অভিজিৎ দাশগুপ্ত** যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছ, তার কয়েকটি দেওয়া হল—

ক. আমার পাঠান সালোকসংশ্লেষের বর্ণনাটি পরীক্ষায় লিখলে হবে কিনা। না হলে আদর্শ উত্তরটি জানিয়ে দেবেন।

খ. এক অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে কটা ATP উৎপন্ন করে।

গ. ভাইটাল ক্যাপাসিটি ও আবহাওয়া সহিষ্ণুতা কাকে বলে?

উত্তর:

ক. একটু আগে দেওয়া সালোক-সংশ্লেষের বর্ণনাটি বোর্ডের পরীক্ষায় লেখা ভাল।

খ. 38টি ATP।

গ এই প্রশ্নটি শ্বাসকার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তবে পাঠ্যক্রমের বাইরে।

ভাইটাল ক্যাপাসিটি—একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ যতদূর সম্ভব প্রশ্বাস গ্রহণ করে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ বায়ু নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ত্যাগ করতে পারে, তাকেই তার ভাইটাল ক্যাপাসিটি (Vital Capacity) বলে। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ গড়ে 4·8 লিটার। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে একটু কম, গড়ে 4·2 লিটার।

আবহাওয়াসহিষ্ণুতা— যে শারীরবৃত্তীয় পরি-বর্তনের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, তাকে আবহাওয়া সহিষ্ণুতা (acclimatisation) বলে। এ ব্যাপারে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে।

এবারের মত পুনরনুশীলন এখানেই শেষ। 'Revision' শেষ হয়ে পরের দিন থেকে আবার 'Vision' শুরু।

দেবাশিস বিশ্বাস

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি

অমিত সান্যাল

১৮৮৫-র শেষভাগ। তরতর করে অতলান্তিকে ভেসে চলেছে ফ্রান্সের এক তরণী। পেটের মধ্যে তার সুবিশাল, উচ্চ এক মূর্তি—কিন্তু খণ্ডবিখণ্ড। তখনও তার উচ্চতা-আকার বা মহিমা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। STATUE OF LIBERTY বা MISS LIBERTY—বা কুমারী স্বাধীনতার মূর্তি চলেছে জাহাজে শুয়ে শুয়ে—ফরাসী জনগণের উষ্ণ আন্তরিকতা ও অভিনন্দন গায়ে মেখে আমেরিকার বেড্‌লো দ্বীপে প্রোথিত হবেন বলে।

১৮৮৬-তে মূর্তি নামল নিউইয়র্কের তীরে। কাজে লাগল লোকজন। '৮৬ র মাঝামাঝি মূর্তি খাড়া হয়ে গেল বেড্‌লো দ্বীপে উড দুর্গের পাঁচিলের মধ্যে। লোকের চোখ বিস্ময়ে হতবাক হল সেই বিশালতা দেখে। ২২৫ টনের তামার পাতের তৈরি কুমারী স্বাধীনতা দাঁড়িয়ে আছেন, দেড়শ ফুট উঁচু দুই স্তম্ভের ওপর। মূর্তির নিজস্ব উচ্চতাও আবার প্রায় ১৫২ ফুট। মাটি থেকে মাথা অবধি হিসেব করলে প্রায় দুটো শহীদ-মিনারের সমান। বিশাল এই মূর্তির মাথায় তারকাখচিত মুকুট। উত্তোলিত ডান-হাতে একটি মশাল আর বাঁ-হাতে একটি ফলক যাতে খোদিত একটি তারিখ—৪ জুলাই, ১৭৭৬। কিন্তু কেন এই তারিখ?

এজন্য একটু ইতিহাসটা ঘেঁটে দেখা উচিত। হাজার হাজার বছর ধরে বিশাল আমেরিকা মহাদেশ ছিল নিস্তব্ধ—ছিল মায়া, আজটেক্, ইনকা সভ্যতার চারণভূমি। সভ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অবস্থায় তারা নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে হয়ত সুখেই ছিল। কিন্তু কলম্বাসের আমেরিকা

আবিষ্কারের পর থেকেই দলে দলে ইউরোপীয়দের হানায়, অত্যাচারে জর্জরিত হতে থাকে এখানকার আদি-বাসিন্দারা। প্রতিবাদ করলেই মিলেছে বন্দুকের গুলি। ক্রমে ক্রমে এইসব উপজাতি ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মিশে যায়। বেরিয়ে আসে এক মিশ্রজাতি—যাদের আমরা বলি আমেরিকান। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আমেরিকা ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন-নত। যেহেতু আমেরিকা হল উপনিবেশ, তাই সর্বনাশা কিছু কানুন জারি করে অর্থ ও সম্পদ নির্বিচারে আপন দেশে নিয়ে যেতেন রাজপ্রতিনিধিরা।

কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সবদেশে সবকালেই প্রতিবাদ সংঘবদ্ধ হয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে গর্জে উঠল সমগ্র আমেরিকাবাসী। বোস্টন বন্দরে এসে লাগত,ভারত ও চীন থেকে নিয়ে যাওয়া চা ভর্তি ব্রিটিশজাহাজ। চায়ের মান খুব খারাপ এই অজুহাতে আমেরিকান বন্দর শ্রমিকরা জাহাজভর্তি চা ফেলে দিলেন জলে। এই ঘটনা 'বোস্টন টী পার্টি' নামে খ্যাত। এর পরেই ১৩টি আমেরিকান উপনিবেশের প্রতিনিধিরা এক স্বাধীনতার স্মারকপত্রে সই করলেন। দিনটা ছিল ৪ জুলাই, ১৭৭৬। স্বাধীন হল আমেরিকা। কিন্তু সব সমস্যা শেষ হল না। ব্রিটেনের পার্লামেন্টে গেল সেই স্মারকপত্র। এল ফৌজ। যুদ্ধ শুরু হল। তারপর এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অখণ্ড মনোবল নিয়ে, প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশসূর্যকে নতি স্বীকারে বাধ্য করলেন জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সুসংগঠিত আমেরিকাবাসী।

স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হল আমেরিকার ১৭৮৩ তে। সমস্ত পৃথিবী

দ্য স্পিরিট অফ '76'—এ. উইলার্ড-এর আঁকা ছবিটি সমগ্র আমেরিকাবাসীর অতি পরিচিত

জানল, অত্যাচার শেষ কথা নয়। রাত্রির পরেও আসে দিন।

এরপরেই ঘটে গেল আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা—যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, ফরাসী বিপ্লব। হয়ত আর একটি ইঙ্গিত ছিল আমেরিকার এই স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে। এক ঘটনাই ত আরেকটি ঘটনার অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। .এই সঙ্গে আরও একটি ব্যাপারও বিস্ময় আনে যে, যে বাস্তিল (BASTILLE) দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লব সূচিত হয়, তাও হয়েছিল এই জুলাই মাসে। আর এ কথা সবার জানা যে বিপ্লবের ইতিহাস মূল্যায়নে ফরাসী বিপ্লবের স্থান কোথায়।

১৮৭৫ সাল নাগাদ এই ফরাসী-দেশেরই এক প্রথিতযশা ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড দ্য লাবুলায়ে, তাঁর স্বদেশবাসীকে প্রস্তাব দিলেন, আমেরিকা স্বাধীনতাযুদ্ধকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে ফরাসী জনগণের পক্ষ থেকে কোন স্মারকচিহ্ন দেওয়া হক। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কাজ শুরু হল, বিখ্যাত মূর্তিনির্মাণকারী ফ্রেডেরিক অগাস্টা বারথলডি-র তত্ত্বাবধানে। মূর্তির পরিকল্পনা করলেন বিখ্যাত ভাস্কর

আলেকজাণ্ডার আইফেল। মূর্তির খরচা জোগালেন ফরাসী জনগণ। তৈরি হয়ে গেল মূর্তি ১৮৮৫-তে। তারপর জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা। অবশেষে ১৮৮৬-র ২৮ অক্টোবর সাড়ম্বরে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন, আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড।

আজও দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী স্বাধীনতা, নিউইয়র্কের তীরে আপার বে-র পোতাশ্রয়ের পাশে—যার আজকের নাম লিবার্টি আইল্যাণ্ড। মশাল উঁচু করে ধরে বিশ্বকে আজও শোনাচ্ছে সে স্বাধীনতার পুণ্যবাণী। আর প্রতীক হয়ে রয়েছে সে, ফরাসী ও আমেরিকান জনগণের বন্ধুত্ব ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার। মূর্তির পাদদেশে স্তম্ভের ভেতরে তৈরি হয়েছে 'আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ইমিগ্রেশন।' পায়ের ভেতর দিয়ে তৈরী হয়েছে বারতলার একটি লিফট। বারতলায় আছে একটি 'দৃশ্যাবলোকন মঞ্চ'। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ পৃথিবীর সবদেশ থেকে দেখতে আসেন মূর্তিটিকে। কিন্তু মূর্তিটি ত শুধু একটি তাম্রনির্মিত উঁচু নারীমূর্তি নয়। আমরাও পরাধীন ছিলাম, স্বাধীনতার স্বাদ তাই আমরা জানি। এই তাম্র কুমারী স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি, তাই সে আমাদের কাছে প্রবল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার এক অমলিন প্রতীক।

বর্ষণবৃক্ষ

শব্দটা নিশ্চয়ই তোমাদের অবাক করছে। বৃক্ষ থেকে বর্ষণ কখনও হয় নাকি! ফল বর্ষণ তবুও হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে এক ধরনের গাছ পাওয়া যায়, যার থেকে প্রায় সব সময় টপটপ করে জল পড়তে থাকে। আমগাছের মত বড় এই গাছগুলোর পাতায় ও কাণ্ডে কিছু গ্রন্থি আছে যা সব সময় রসে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, আর পাতা ও কাণ্ডের ছিদ্র দিয়ে রস বেরিয়ে আসতে থাকে।

ক্ষীণবৃদ্ধি বৃক্ষ

অনেক গাছ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে, যেমন লোহা কাঠের গাছ, নারকেল বা তাল গাছ। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলে 'লাইকেন' নামে এক রকমের গাছ আছে যা প্রতি ২৫ বছরে বাড়ে প্রায় $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, লম্বায় বড় না হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে কিন্তু এদের ঠিকই বৃদ্ধি হয় এবং কোষগুলিও পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।

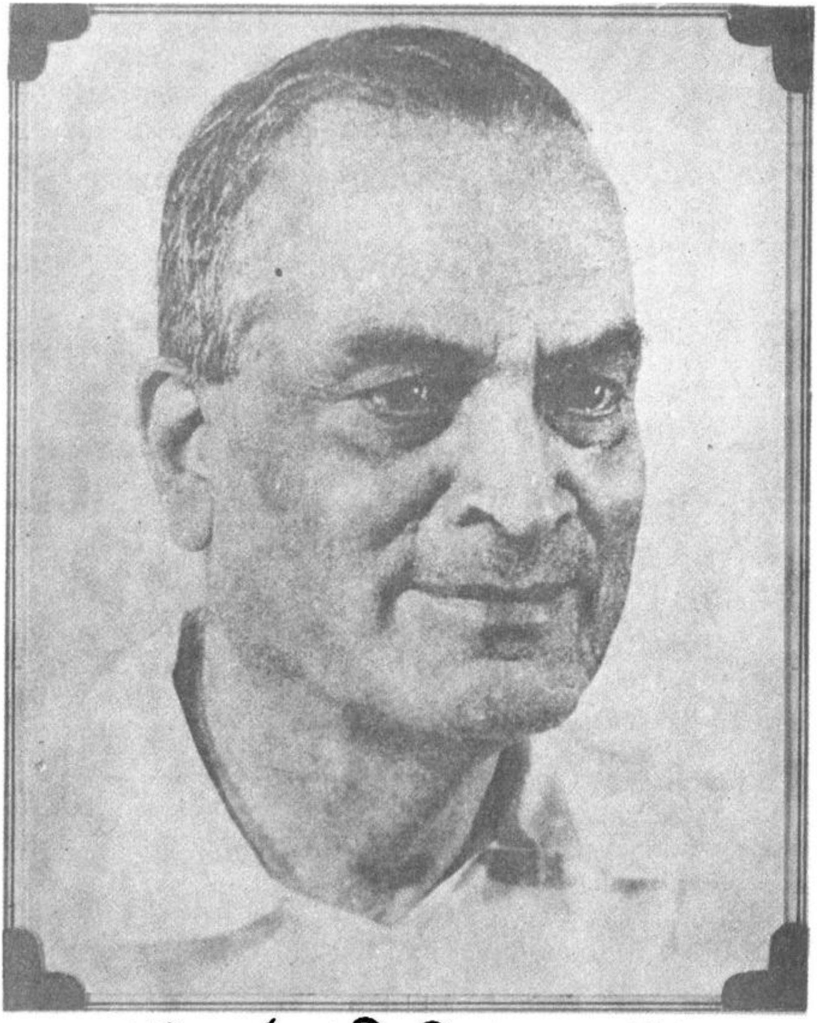

কর্মযোগী বিধানচন্দ্র

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

বছর চল্লিশ আগে একটি বিশ-বাইশ বয়সের যুবকের অটোগ্রাফের খাতায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র লিখেছিলেন—Think of others, act for yourself and never look back. দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে তিনি পরের জন্য ভেবেছেন, নিজেকে বড় করেছেন, এবং মিথ্যে ভাবপ্রবণতায় জীবনের অতীতকে নিয়ে তন্ময় হয়ে যাননি।

পাটনার বাঁকিপুরে ১৮৮২ সালের ১ জুলাই বিধানচন্দ্রের জন্ম। মা অঘোর-

কামিনী দেবী, বাবা প্রকাশচন্দ্র। দুরন্তপনা ছোটবেলা থেকেই, পড়ালেখাটাও চলেছে সমান তালে। কুড়ি বছরের বিধানচন্দ্র কলকাতায় এলেন, ভর্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে এসে দেখা পেলেন লুকিস নামে এক ভদ্রলোকের। সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন লুকিস। বিধানচন্দ্রকে জাতীয়তাবোধ জিনিসটি কি বোঝালেন, ভাল লাগল তাঁকে, দুজনে বয়সের ব্যবধানেও বন্ধু হলেন। তখন থেকেই লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে, যখনই সময় পেতেন ভাবতেন মানুষের কথা, যাঁরা তাঁর প্রতিবেশী, দেশের মানুষ, সকলের কথা।

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, পেলেন তখনকার দিনের এল. এম. এস. ডিগ্রী। এ প্রসঙ্গে বলা যাবে, এল. এম. এস. নয়, এম. বি. (ব্যাচিলর অফ মেডিসিন) ডিগ্রী পাওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু একটি অদ্ভুত কারণেই সেটি তাঁকে সেদিন দেওয়া হল না। একটি গল্পই যেন।

মেডিক্যাল কলেজের তখন যিনি সর্বময়কর্তা একটি গাড়ির দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দোষ প্রকৃতপক্ষে তাঁরই। কলেজের সামনের রাস্তায় একটি গরীব অতি সাধারণ মানুষকে তাঁর গাড়ি চাপা দেয়। লোকটি গুরুতরভাবে আহত হন। বিধানচন্দ্র ব্যাপারটি দেখেছিলেন। তাঁর সতীর্থ বন্ধুরা এবং অধ্যাপক সকলেই তাঁকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলেছিলেন।

চিরদিন একটা আদর্শ নিয়ে চলেছেন বিধানচন্দ্র। সত্য কথা বলেছেন, উঁচু মাথাটা উঁচুই রেখেছেন—কোনও মিথ্যা বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি যে মানুষ, তিনি কোনও কিছুতেই ভয় পেলেন না, পুলিশের কাছে যা সত্য সেটাই বললেন—'হ্যাঁ,আমি নিজে দেখেছি। স্যার-এর গাড়িতেই, তাঁর দোষেই ঐ গরীব বেচারী আহত হয়েছে।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন স্যার। তখন থেকেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেমন করে ছেলেটিকে শাস্তি দেওয়া যায়। ফাইন্যাল পরীক্ষা এল। পরীক্ষা শেষ হল। ফল বেরোল। দেখা গেল যাঁর এম. বি. ডিগ্রী পাওয়ার কথা তা তিনি পেলেন না—তিনি হলেন এল. এম. এস।

ইংরেজ আমল। দেশ পরাধীন। সব বুঝলেন তিনি। আর, তাই সেদিন থেকেই বন্ধু লুকিস-এর দেওয়া জাতীয়তাবোধ মন্ত্রটিকে বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন। বুঝলেন শুধু বড় ডাক্তার হওয়াই নয়—দেশের মানুষকে অনেক বেশি করেই ভালবাসতে হবে, ভাবতে হবে তাদের কথা—স্বাধীন ত হবেই একদিন এ দেশ; আর সেদিন একে নতুন করে গড়ে তুলতেও হবে।

স্বাধীন পশ্চিমবাঙলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পাঁচ মাসের শাসনকাল শেষে ১৯৪৮-এর ২৩ জানুয়ারি তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলেন। রাইটার্সের নির্দিষ্ট ঘরটির একটি বিশেষ আসনে বসে প্রায় চার কোটি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দায়ভার গ্রহণ করলেন।

আর তার পর থেকে একটানা পনের বছরের কর্মকালে তিনি আমাদের অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন—দিয়েছেন দুর্গাপুর স্টীল প্রজেক্ট, স্টেট ট্রান্সপোর্ট, চিত্তরঞ্জন রেল এঞ্জিন কারখানা, কল্যাণী, লবণ-হ্রদ, ফারাক্কা, হলদিয়া এবং কলকাতাকে মনোরম মহানগরী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। তিনি জীবিত থাকলে তাঁর অনেক স্বপ্নই হয়ত সত্যি হত—যা তাঁর অবর্তমানে হয়ত ঠিক ঠিক হয়নি। তবু···

দেশপ্রণম্য, ভারতশ্রদ্ধেয়, বিশ্ববরেণ্য চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় তাঁর দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনও ব্যর্থতাকেই মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করে নেননি। ☐

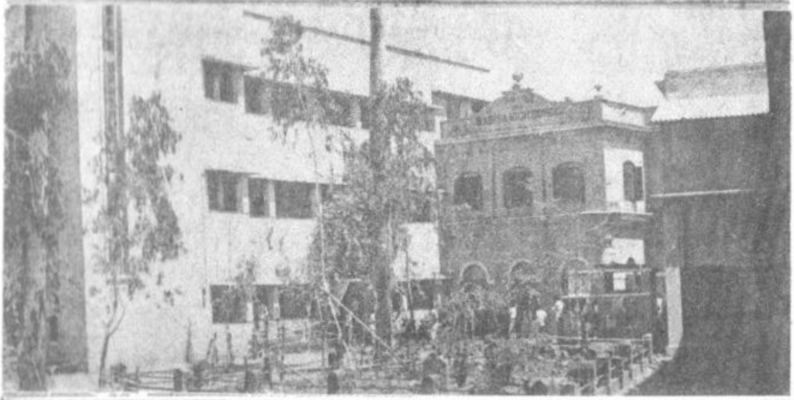

মানুষ গড়ার ইতিহাসে বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়

মিহির মজুমদার

উনিশ শতকের মাঝামাঝি। জাতীয় জীবনে তখন নানা ঘাত-প্রতিঘাত। ভাঙা-গড়ার পর্ব। রাজা রামমোহন রায়ের নিরলস প্রয়াস ও ঐকান্তিকতায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় যুগ-জীর্ণ অচলায়তনে নতুন প্রাণের সাড়া জেগেছিল আগেই। সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াসে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই যুগে—শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের নিরলস প্রয়াস দেশের প্রায় সর্বত্রই উৎসাহের সঞ্চার করে। সেদিন কলকাতার উপকণ্ঠে বড়িশা-র কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও বুঝেছিলেন—নতুন কালকে নতুন শিক্ষার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে হবে।

ইতিহাসের সেই পট পরিবর্তনের কালে বড়িশা-র সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সূর্যকুমার রায়চৌধুরী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের চেষ্টায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় ও সাহায্যে বড়িশা-র 'সাজের আটচালা'য় ১৮৫৬ সালে জানুয়ারি 'বড়িশা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হল। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সিপাহী-বিদ্রোহেরও আগে।

১৮৬১ সালে বড়িশা বিদ্যালয় উন্নীত হয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। ১৮৬৬ সালে শিক্ষা অধিকর্তা এ্যাটকিনসন-এর সহায়তায় বড়িশা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ও সরকারি সাহায্য লাভ করে। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়, দানে ও সরকারি সাহায্যে ১৮৯৭ সালের শুরুতে নব নির্মিত ভবনে বিদ্যালয়ের বর্তমান ঠিকানায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় এবং দ্বি-তল

উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ

ভবন তৈরি হয় ১৯১৯ সালে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সরকারি অনুদানে ও বেসরকারি সাহায্যে বিদ্যালয় ভবন ক্রমশই স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। এই সময় বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৫ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪১০। আর ১৯৫৫ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৭৩।

একশ ছাব্বিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রবীণ-তম শিক্ষক নৃপেন্দ্রকুমার সরকার। গোলাপী প্রলেপের মোড়া সুবিশাল সারস্বত প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে পুষ্পিত বোগেনভিলার উচ্ছ্বাস। অজস্র ইউক্যালিপ্টাস, ছাতিম, রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়ার সবুজ বিস্তার।

নৃপেনবাবু জানালেন, ১৯৭৬ সালে বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয় নব পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্রীরাও পড়ার সুযোগ পায়।

প্রায় চার বিঘা জমিতে বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের এখন ছাত্র-ছাত্রী প্রায় দেড় হাজার। ১৯৬৭ সালে 'স্বর্ণলতা'-র রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্র মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় পরলোক গমন করলে বিনয়ভূষণ আইচ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন।

বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনার খ্যাতি দীর্ঘকালের। প্রধান শিক্ষক বিনয়বাবু জানালেন, গত দশ বছরে শতকরা আটানব্বইজন ছাত্রই পরীক্ষায় সফল হয়েছে। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে প্রবীণ শিক্ষক নীহারকান্তি ঘোষ-দস্তিদার বললেন, ১৯৩৯ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়। ১৯৪৯ সালে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রবেশিকা পরীক্ষায় সপ্তম স্থান পায়। ১৯৫৭ সালে রণেশচন্দ্র দে 'স্কুল ফাইনাল' পরীক্ষায় একাদশ এবং ১৯৭৪ সালে অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় উচ্চ মাধ্যমিকে কলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ

টিফিনের অবসরে

করে। এছাড়া প্রতি বছরই বেশ কয়েক-জন ছাত্র 'জাতীয় মেধা বৃত্তি' পাচ্ছে। কলকাতার তথাকথিত বনেদী স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তিতে যেমন কড়াকড়ি করা হয়— বড়িশা স্কুলে ছাত্র ভর্তির সময় তেমন কোন কড়াকড়ি করা হয় না। পরীক্ষার ফল ও ছাত্র পাশের নিরিখে তাই বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব—অন্যান্য নামজাদা স্কুলের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্কুলেই খেলার মাঠ নেই। বড়িশা স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে প্রশস্ত খেলার মাঠে ফুটবল খেলছিল একদল ছাত্র। খেলা দেখছিলেন ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রবীর ভট্টাচার্য। খেলাধুলোর প্রসঙ্গ জানতে চাইলে প্রবীরবাবু বললেন, খেলাধুলোয় বড়িশা স্কুল বরাবরই প্রথম সারিতে। আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বড়িশা স্কুল অনেকবারই ক্রিকেট, ফুটবল ও বাস্কেট-বল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাস্কেটবল, ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সে বড়িশা স্কুলের অনেক ছাত্র বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

বিদ্যালয়ে এন সি সি-র প্রবর্তন ১৯৬২ সালে। এন সি সি-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীত চট্টোপাধ্যায় জানালেন, স্কুলের এন সি সি 'ট্রুপ'টি কয়েক বছর বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরে শ্রেষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করেছে। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ 'ক্যাডেট'এর মর্যাদা লাভ করেছে।

ছাত্র ভর্তির সময় বাছাবাছি না হলেও, বড়িশা স্কুলের উচ্চ পঠন পাঠনের মান বজায় রেখেছেন বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। কবিশেখর কালিদাস রায়, তারাচরণ বসু, বেচারাম মুখোপাধ্যায়, মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিক্ষক বড়িশা স্কুলে এক সময় শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতার সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী সচেষ্ট। ইংরাজীর শিক্ষক নৃপেনবাবু জানালেন, 'টেকসট' বই ভাল করে পড়লে ও ইংরাজী গ্রামারে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে ইংরাজীতে পাশ করা কোন সমস্যাই নয়। ছাত্রদের নোট বই মুখস্থ করার সাম্প্রতিক প্রবণতায় নৃপেনবাবু চিন্তিত।

বড়িশা স্কুলের ছাত্রদের পঠন-পাঠনের মান উন্নয়নে শিক্ষকদের সাহচর্য ও নিষ্ঠা ছাড়াও বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর অবদানও কম নয়। পাঁচ হাজার পুস্তক সমৃদ্ধ বড়িশা

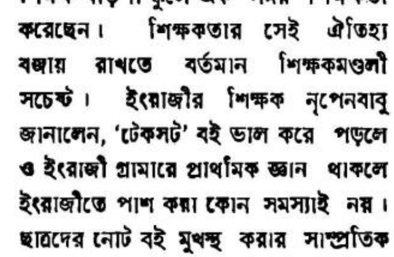

জীববিজ্ঞান-এর বীক্ষণাগার

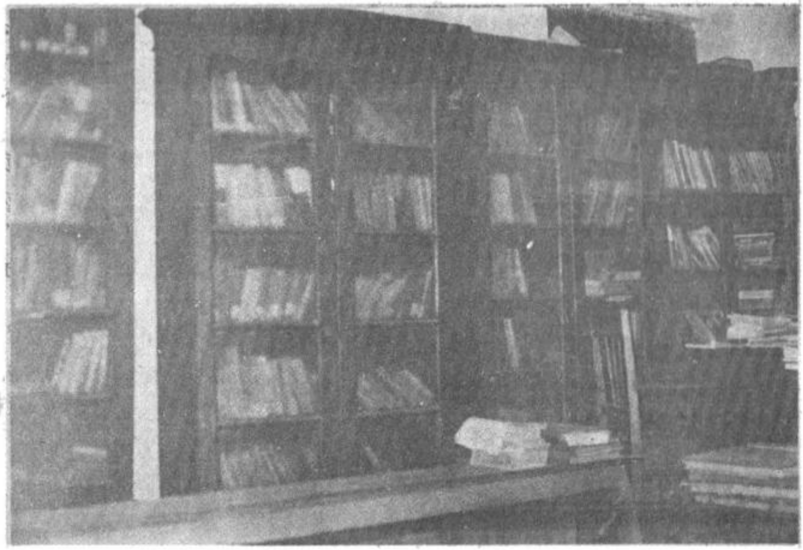

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

স্কুলের লাইব্রেরী পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্কুলের ছাত্রদের কাছে স্বপ্ন। নানা বিষয়ের অজস্র বই লাইব্রেরীতে। প্রতি সপ্তাহে ছাত্ররা তাদের পছন্দসই বই নিতে পারে লাইব্রেরী থেকে। কেবল মাত্র পাঠ্য বই নয়, ভাল গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের বই পড়তেও ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়।

কর্মশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ছাত্ররা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুল বাগানের পরিচর্যা করে। নির্দিষ্ট পিরিয়ডে মোমবাতি বানায়, খাম তৈরি করে। ফটো বাঁধায়।

বড়িশা স্কুলের ছাত্র অধিকাংশই মধ্য বিত্ত পরিবারের। নানা বাধা অসুবিধার মধ্যে তাদের বিদ্যাচর্চা চললেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সযত্ন প্রয়াসে পরীক্ষার সাফল্যের হার অনেক বিদ্যালয়ের কাছে ঈর্ষার।

১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে মহা সমারোহে বিদ্যালয়ের একশ পঁচিশতম বর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপিত হয়েছে।

১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি যে বীজটি উপ্ত হয়েছিল, তা আজ পত্র পল্লবে বিশাল বনস্পতি। কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে একশ ছাব্বিশ বছর। কয়েকটি প্রজন্ম ধরে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শৈশবসাধনা, তাদের স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের স্বপ্ন রঙিন দিনগুলো—তাদের আনন্দ বেদনার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে বিদ্যালয়ের কক্ষে, অলিন্দে আর চত্বরে।

নানা পালা বদল আর ভাঙাগড়ার সুদীর্ঘ সরণী বেয়ে, নব নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে মানুষ গড়ার ইতিহাসে বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। দক্ষিণ শহরতলীর শিক্ষা সংস্কৃতির প্রধানতম প্রতীক।

ছবি ঃ কল্যাণকুমার নন্দী

আফ্রিকার হাতি

রতনলাল ব্রহ্মচারী

এ যুগে আফ্রিকার চিত্র অনেক বদলে গেছে, এখন আর লিভিংস্টোন বা বেকারের মত এ্যাড ভেঞ্চারের সুযোগ নেই, কিন্তু জয় এ্যাডামসন, জর্জ এ্যাডামসন, জর্জ শালার, জেন গুডাল ইত্যাদি প্রকৃতিবিদ ও বিজ্ঞানীরা তুলে ধরেছেন আরেক জগতের ছবি, সাধারণ ট্যুরিস্টের ভিড় থেকে অনেক দূরে গিয়ে গহন অরণ্যে এ'রা সাধনা করেন। বিজ্ঞানভিত্তিক অপরূপ রূপকথার এক জগৎ আবিষ্কার করেছেন এ'রা।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অনেকেই সে খবর রাখেন না, টার্জান বা অরণ্যদেবের গল্পগাথাই তাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বহু চেষ্টা করে গত ষোল বছরে ন' বার আফ্রিকা যেতে পেরেছি, প্রকৃতির এক অপরূপ খেলাঘরের সন্ধান পেয়েছি। উগাণ্ডা, কেনিয়া, তানজানিয়া, জাইর (প্রাক্তন বেলজিয়াম কঙ্গো) ও সুদানে ঘোরাঘুরি করেছি; হাতি, জিরাফ, গরিলা ইত্যাদি নিয়ে একটু গবেষণা করেছি। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছু কিছু বিবরণ তোমাদের জানাতে চাই। আফ্রিকার হাতি সম্পর্কে তোমাদের প্রথম জানিয়ে ছিলাম, নবম দশমের ১৩ মার্চ '৮২ সংখ্যায়। আফ্রিকার হাতিদের বিষয় আরো কিছু বিবরণ জানাচ্ছি।

খেলা

অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীকেই, বিশেষ করে তাদের শৈশবে নানা রকম খেলা করতে দেখা যায় অনেক সময় এই খেলার মাধ্যমেই তারা সে সব কাজের মহড়া দেয় যা ভবিষ্যৎ জীবনে রীতিমত প্রয়োজনীয়,—যেমন বাঘ বা সিংহের বাচ্চার শিকার-শিকার খেলা।

মানবশিশুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেক সময় বড়দের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোকে অনুকরণ করেই খেলা করছে ছোটরা, কেউ ট্রেন চালাচ্ছে, কেউ পুতুলের ঘর-সংসার সাজাচ্ছে। খেলাটা এমন ধরনের একটি কাজ যাতে আনন্দ পাওয়া যায়, খাওয়া পরা ইত্যাদি জৈবিক প্রয়োজন মেটানর জন্য নয়, খেলার জন্যই খেলা। অনেকে

মনে করেন একটু উঁচু ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণীরাই খেলা করতে পারে,— তাদের সঙ্গে মানুষের একটু মিল খুঁজে পাওয়া যায় এ ব্যাপারে।

হাতির বাচ্চার দুষ্টুমি

বিখ্যাত শিকারী ও প্রকৃতি-প্রেমিক জিম করবেট শেষ জীবনে ভারত থেকে আফ্রিকায় চলে যান। সেখানে একদিন দেখলেন হাতির বাচ্চারা শুঁড়ে করে ধুলো বালি শুষে নিয়ে বক ইত্যাদি পাখিদের দিকে তাক করে সেগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে—ঠিক যেন দুষ্টু বাচ্চা ছেলেরা খেলার পিস্তল ছুঁড়ছে,—মেরে ফেলবার জন্য নয়, একটু ভয় দেখিয়ে মজা করার জন্য।

আফ্রিকায় বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণ করার সময় মধ্যে মধ্যে এসব মজার ঘটনা দেখেছি। দিগন্তপ্রসারী সাভানায় নীল আকাশের নিচে মুক্ত বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে, **Goragang rapids**-এর কাছে দ্রুত প্রবহমান নীলনদের আশে-পাশে, মার্চিসন প্রপাতের তলায় প্রলয়-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়া ফেনিল জলরাশির ধারে, টানা নদীর বালুগর্ভে, কোরা (**Kora**) পাহাড়ের কাঁটাঝোপে, কাহুজী-বীগার সূর্যহারা অরণ্যে হাতি, হিপো, সিংহ আর গরিলার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

Dustbin Nelly (আফ্রিকার এক বন্য হাতি) আর তার দুই বাচ্চার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৭ সালে, যদিও আগেও তাদের দূর থেকে দেখেছিলাম। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই নেলী ও তার বাচ্চাকে দেখেছি। সে সময় বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বুনো হাতি ছিল এই ডাস্টবিন নেলী। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট তার ফটো নিয়েছে, পারা লজের (**Para lodge**) আশেপাশে ঘরের জানালা দিয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার বড় ছেলে মুনফ্লাওয়ার খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই হল তার কাল! ছোট বাচ্চাটার নাম দিয়েছিলাম সান-ফ্লাওয়ার। বিরাট কানওয়ালা ঐটুকু বাচ্চা হাতি কি মিষ্টি দেখতে, যেন ওয়াল্ট ডিজনীর কোন কার্টুন ফিল্ম জীবন্ত হয়ে এসেছে। আরও ছোট্ট, আরও সুন্দর একটা বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে আসত আর একটা মা—হাতি।

একদিন সকালবেলা দেখি তুর তুর করে সান ফ্লাওয়ার যাচ্ছে মায়ের সঙ্গে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজতে। আশেপাশে কয়েকটা ছোট শকুন (hooded vulture) মাটিতে বসে আছে। হঠাৎ একটা শকুনের দিকে শুঁড় দিয়ে তাক করে ফোঁস করে হাওয়া ছাড়ল সান ফ্লাওয়ার, শকুনটা হক-চকিয়ে গেল। ঠিক যেন দুষ্টু ছেলে এয়ার গান ছুঁড়ে তার চেয়েও বাচ্চা কোন ছেলেকে ভয় দেখাল। তারপরই সেই দুষ্টু বাচ্চা হাতিটা মায়ের সঙ্গে এগিয়ে গেল,—শকুনটাকে আঘাত করার কোন ইচ্ছাই তার নেই,—শুধু একটু মজা করা আর কি।

একদিন বিকেল বেলায় মনে হল নেলী কোম্পানী বারান্দায় উঠে আসতে চাইছে।

মুন-ফ্লাওয়ার শুঁড় দিয়ে একটা চেয়ার তুলে নিল। হাঁ হাঁ করে হোটেল কর্মচারীরা তেড়ে এল, ওরা সবাই এক একটা চেয়ার মাথার ওপর তুলে দোলাতে লাগল আর ভয় পেয়ে মুনফ্লাওয়ার চম্পট দিল।

উজ্জ্বল আকাশে দেখা দিল রক্ত মেঘ স্তূপ, তারপরে রাঙা জবার মত লাল সূর্য নেমে গেল দিগন্তের হাতছানিতে, নীল নদের জলে রাশি রাশি নরম সোনা ঝরিয়ে দিয়ে। সাঁঝের আকাশ মথিত করে বেজে উঠল হাদাদা আইবিস (Hadada Ibis) পাখির কলকণ্ঠ। কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এল নেলীর দলবল।

এখন ডাইনামো চালিয়ে বিদ্যুতের প্রখর আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। (এটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর, অরণ্যের রোমাঞ্চই নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব-আফ্রিকার বনে লজগুলিতে 'সভ্যতার আলো' খুবই বেশি। মধ্য আফ্রিকায় সেক্ষেত্রে রাত্রি গভীর হওয়ার আগেই ডায়নামো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন জ্যোৎস্নার প্লাবনে যা লণ্ঠণের মৃদু আলোয় আদিম অরণ্যের অপরূপ রূপ দেখা যায়। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তাঁবুতে বা সাধারণ ট্যুরিস্টের ভিড় থেকে দূরে কোন ক্যাম্পে থাকা। ভাগ্য ক্রমে উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাইরে এ রকম একাধিক স্থানে থাকার দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।)

নেলীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাদের পেছনে ছায়ার মত একটা হায়না।

পরদিন সকালেই দেখি মুনফ্লাওয়ার আর একদল শকুন ডাস্টবিনের কাছে খাদ্যের সন্ধান করছে। একটা সিমেন্টের চৌবাচ্চার উপর কয়েকটা শকুন বসে ছিল, মুনফ্লাওয়ার একটু এগিয়ে যেতেই একটা ছাড়া আর সবাই ভয় পেয়ে উড়ে পালাল। মুন ফ্লাওয়ার চৌবাচ্চার কিছু জমা জল শুঁড়ে তুলে নিয়ে চৌবাচ্চার উপর বসা শকুনটাকে যেন হোস পাইপ চালিয়ে ভিজিয়ে দিল।

ডায়েরী থেকে

১৫।৭।৬৮ আজ দুপুরে নীলনদের দক্ষিণ পারে চলে গেলাম। ফেরীঘাট থেকে নেমে রাইফেলধারী গাইডকে নিয়ে হাঁটা দিলাম। উত্তর পারের তুলনায় এখানে বুনো মোষের সংখ্যা খুবই বেশি। একটু পরেই দেখলাম মোষের ক্ষুরের আঘাতে মাটি যেন চষে ফেলা হয়েছে। সেখান দিয়ে হাঁটাই মুস্কিল।

নদীতে অসংখ্য জলহস্তী। একটি Paradise fly catcher পাখি উড়ে গেল। আর একটি পাখির মিষ্টি ডাক শুনলাম। কোন ঝোপের মধ্যে পাখিটা লুকিয়ে আছে বোঝা গেল না। বহু চেষ্টা করেও পাখিটাকে দেখনে পেলাম না, মনে হল যেন একটু মিষ্টি গলার ছোট মেয়ে লুকোচুরি খেলছে। খুব সম্ভব এটা ছিল লাল বুক গনোলেক (Gonolek)। মরকত মণির মত একটা মৌটুসী পাখি উড়ে গেল।

খুব নিচু কিন্তু ঘন ঝোপের আড়ালে অসংখ্য বুনো মোষ রয়েছে। একবার একটা বিরাট অদৃশ্য দল আমাদের সাড়া পেয়ে ছুটে পালাল,—মাটি কাঁপিয়ে খুরে খুরে যেন দামামা বাজিয়ে গেল। সেই শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর আমরা আবার অগ্রসর হলাম। একটা হিপ্পো জল থেকে অনেকটা দূরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় মানুষ দেখলে জলহস্তীরা পালিয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই আমরা তাড়াতাড়ি সরে এলাম, তার পথ পরিষ্কার রেখে। এইভাবে ঘুরে আসতে গিয়ে আর এক ঝোপের মুখোমুখি এসেই দেখি তার ভেতর আর একটি হিপ্পো। গাইড আর আমি প্রায় একই সঙ্গে তাকে

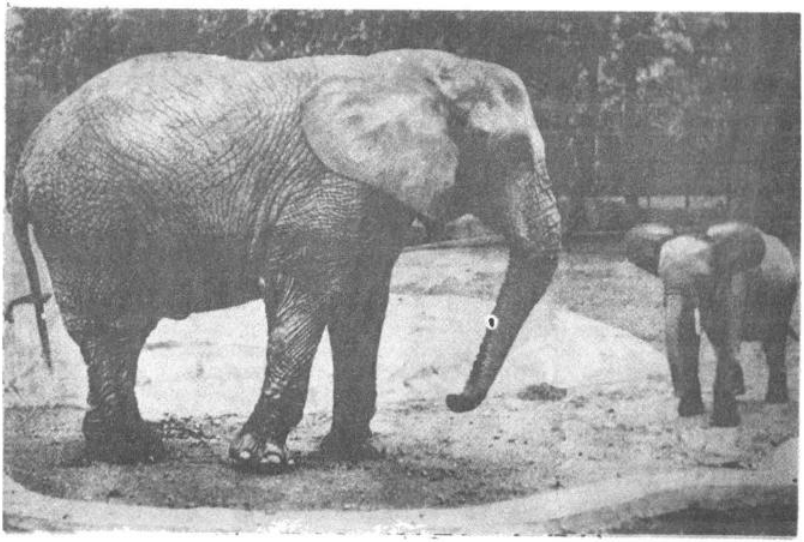

দেখতে পেয়ে আবার চটজলদি আর একটা অর্ধবৃত্তপথে ঘুরে গেলাম। হাত দিয়ে মুখটা বাঁচিয়ে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটলাম।

তার পর এলাম এক অঞ্চলে যেখানে নীল নদের পাড় erosion বা মাটিক্ষয়ের কবলে পরে এক অগম্য বাধা সৃষ্টি করেছে। এখানে ছোট ঝোপ-ঝাড়ের ছায়ায় বসে আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম। জলের ধারে লম্বা-ঠ্যাং জাসানা বা জাকানা (**Jacana**) পাখি দুটো ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যার ঠিক আগে লজে ফিরে দেখি মুনফ্লাওয়ার ঠিক হাজির হয়েছে। নতুন আসা লোকজন অবাক বিস্ময়ে দেখল বন থেকে এসে একটা হাতি বারান্দা থেকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গেল। আবার এসে আর একটা চেয়ার তুলতে যেতেই হোটেলের কর্মচারী জন (**John**) বাধা দিতে গেল। এবার কিন্তু মুনফ্লাওয়ার খুব তেজ দেখাল, তার সেই মাথা দোলানো আর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ দেখেশুনে জন বেচারা ঘাবড়ে গেল। মুনফ্লাওয়ার শুঁড় দিয়ে চেয়ারের পা জড়িয়ে পেছন দিকের প্লাস্টিকের ফিতের মধ্যে চালিয়ে দিল শুঁড়ের ডগা। তারপর বিজয় গর্বে চেয়ারটাকে শূন্যে তুলে ধরে একটা ঝোপের ওপর আছড়ে ফেলল। একটু বাদেই সেটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল আর একটা ঝোপে। একজন ট্যুরিস্ট বলে উঠলেন—" **I think he knows People are enjoying this show.** " ভেবে দেখলাম, সত্যিই যখন বেশি লোকজন থাকে বারান্দায় তখনই মুনফ্লাওয়ারের দুষ্ট বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

এরপর দেখলাম মুনফ্লাওয়ার একটু বেকায়দায় পড়ছে,—শুঁড়টা চেয়ার থেকে ছাড়িয়ে আনতে কষ্ট হচ্ছে যেন। যা হক শেষ পর্যন্ত বের করে আনল আর তার পরই চেয়ারের পা জড়িয়ে ধরে আবার আরও দূরে একটা ঝোপের ওপর সেটাকে আছড়ে ফেলল।...

মুনফ্লাওয়ারের আর এক কীর্তি হল একজোড়া ব্রোনজ ম্যানিকিন (**Bronze**

Mannikin) পাখির ওপর উৎপাত করা। বারান্দার এই চড়ুই জাতীয় পাখি একটা ছোট গাছে বাসা তৈরি করছিল। কর্তা-গিন্নী দুজনেই সমান ব্যস্ত—১১ মিনিট ১৬ বার-এই হারে তারা বাসা তৈরির মালমসলা নিয়ে আসছে। এর মধ্যে রাবোংগো চলে গেলাম শিম্পাঞ্জির সন্ধানে। (এ বার শুধু শিম্পাঞ্জির পরিত্যক্ত বাসাই দেখতে পেলাম। কিন্তু সভ্য মানুষের ছোঁয়া না লাগা আদিম আফ্রিকার যে রূপ সেখানে উপভোগ করলাম তার মূল্য অনেক।) তিন দিন বাদে ফিরে এসে শুনি মুনফ্লাওয়ার পাখির বাসাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। এবার তার দুষ্টুমি একজোড়া পাখির দারুণ ক্ষতি করে দিল।

এর পরের বছর গিয়ে জানলাম মুন-ফ্লাওয়ারকে গুলি করে মারা হয়েছে, কারণ ভয় হচ্ছিল তার দুষ্টুমির ফলে ট্যুরিস্টরা কোন দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। বেচারা মুনফ্লাওয়ার বুঝতেও পারেনি কোন অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হল।

হাতিদের অদ্ভুত আচরণ

মানুষ চিন্তাশীল। সে মৃত্যু ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করে। দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা বাদ দিয়েও, যে কোন সাধারণ মানুষ মৃতের প্রতি সম্মান দেখায় বা মৃত মানুষ বা প্রাণীর প্রতি বিশেষ আচরণ করে,—যেমন কবর দেয় বা পুড়িয়ে ফেলে বা মমি তৈরি করে রাখে। সুদূর অতীতে যখন মানুষ 'সভ্য' হয়ে ওঠেনি, কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মও গড়ে ওঠেনি, তখনও মানুষ অন্য মৃত মানুষকে কবর দিত। কোথাও একজন মৃত মানুষকে দেখলে অপরিচিত মানুষও থমকে দাঁড়ায়, একটু চিন্তা করে, সম্ভব হলে তাকে কবর দেয় বা একটা চাদর বা গাছ-পাতা, ফুল দিয়ে ঢেকে দেয় (অবশ্যই যুদ্ধের সময় বা বিরাট দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় প্রতিনিয়ত চারদিকে মৃত মানুষ দেখে দেখে লোকের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে চাপা পড়ে যায়।) যারা গৃহপালিত প্রাণীকে খুব ভালবাসেন, তাঁরা অনেকে নিজেদের পোষা কুকুর-বিড়াল মারা গেলে তাদেরও সযতনে মাটি চাপা দেন, পাথরের ফলকে তার নাম লিখে দেন, ফুলগাছ লাগান কবরের পাশে।

অধিকাংশ প্রাণী নিজের জাতের মৃত প্রাণী দেখলেও তা বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। বাচ্চার মৃত্যুর পর মা হয়ত অল্পসময় তার গা চেটে দেয় বা আকুল হয়ে ডাকাডাকি করে কিন্তু একটি পশু বনে ঘুরতে ঘুরতে অন্য একটি পশুর মৃতদেহ বা কঙ্কাল দেখলে তার কোন ভাবান্তর হয় না বা সেটা সে বুঝতেই পারে না। এ ব্যাপারে মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক ও মননশীলত তাকে এক বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী করেছে।

তাই খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আফ্রিকার হাতিদের এক ধরনের অদ্ভুদ আচরণ যাতে মনে হয় মৃত হাতি বা অন্য মৃত পশুকে দেখে তারা নিজের মৃত্যু উপলব্ধি করতে পারে।

জর্জ এ্যাডামসন, যিনি জয় এ্যাডামসনের সঙ্গে বিখ্যাত সিংহী এলজা (Elsa)-কে মানুষ করেছিলেন (এবং এখন জয়ের মৃত্যুর পরেও অনেক সিংহকে নিয়ে তাঁর সিংহ শিবির তৈরি করেছেন), তাঁর একটি আত্মজীবনী (Bwana Game, বা আমেরিকান সংস্করণ A Lifetime with Lions) লিখেছেন। এ বইটিতে তাঁর নিজের এবং অন্যদের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি আশ্চর্য বিবরণ আছে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলোচনাও হয়েছে।

একবার এক বৃদ্ধা আফ্রিকান মহিলা গাছতলায় শুয়ে ছিলেন। একটি হাতি তার গায়ে শুঁড় বুলিয়ে যায়, তখন তিনি

ভয়ে চুপচাপ থাকেন। তারপর কয়েকটি হাতি গাছের ডাল ভেঙ্গে তাকে ডাল পাতা চাপা দিয়ে রেখে যায়।

ভারতের পালামৌতে এক মেমসাহেব (তিনি ওখানে 'পালিত মেমসাহেব' **Mrs. Palit** নামে পরিচিতা) আমাকে একটি ফটো দেখিয়েছিলেন। একটি বুনো হাতি একটা ছোট্ট মৃত মোষের বাচ্চাকে পর্বত-প্রমাণ ঘাস চাপা দিয়ে যায়।

বাঘেরা অনেক সময় তাদের মারা শিকারকে ডালপালা ঘাস চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখে যাতে শকুন ইত্যাদিরা এসে খেয়ে না ফেলে। কিন্তু এই সহজাত প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও একটি বাঘ আর একটি মৃত বাঘকে দেখলে তাকে ঘাসপাতা দিয়ে কবর দেওয়ার চেষ্টা করে না। সেক্ষেত্রে হাতির ব্যবহারটা খুবই আশ্চর্যজনক।

জর্জ এ্যাডামসন আরও বলেছেন,—দু বার তাঁর এলাকায় হাতিরা একটি মৃত হাতির দাঁত আর দুটি বড় হাড় খুলে নিয়ে দূরে রেখে এসেছে। এ ধরনের কিছু কিছু ঘটনা আফ্রিকার অন্য অনেকে দেখেছেন। 'কিং এলিফ্যান্ট' ছায়াচিত্রে সাইমন ট্রেভর এ ঘটনা ফিলম করেও দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানী ডগলাস হ্যামিলটন আফ্রিকার হাতি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর মন্তব্য, এ ব্যাপারটা নিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য কৃত্রিম কতগুলি হাড়, দাঁত তৈরি করে দেখা যেতে পারে, কি রকম আকার-বিশিষ্ট হলে, হাতিরা তা দেখে আকৃষ্ট হয় বা সেগুলি নিয়ে যায়। অবশ্যই গজদন্ত অন্য সব হাড় বা দাঁত থেকে একেবারেই আলাদা। জাইরে বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ফন দের বেক (Von der Becke) মশাই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁর বাংলো বাড়ির বারান্দায় বসে অনেকবার একটি বুনো হাতিকে লক্ষ্য করি। অনেক সময় এটি এত কাছে আসত যে' মনে হত বুঝি বারান্দায় উঠে আসবে। সেই বারান্দায় একটি হাতির মাথার খুলি ছিল। অনেক লক্ষ্য করেছি—সেটা দেখে হাতিটির কোন ভাবান্তর হয় কিনা, তার মাথায় শুঁড় বোলায় কিনা। কিন্তু কখনই এ ধরনের কোন লক্ষণ দেখিনি। হয়ত দাঁত দুটি থাকলে হাতিটা চিনতে পারত তার মৃত আত্মীয়কে।

মাংসাশী হাতি?

১৯৭৬ সাল। জেলেদের গ্রাম ভিচুম্বি (**Vitsumbi**) সামনেই লেক ইদি আমিন দাদা (**Lake Idi Amin Dada**)। এপারে জাইর ওপারে উগাণ্ডা। (পুরোন ম্যাপের পরিচিত নামগুলি যেমন **Lake Albert, Lake Edward, Lake Rudolf** বদলে যাচ্ছে। উগাণ্ডার ইদি আমিন বিতাড়িত হওয়ার পরে কিছু কিছু পুরোন নাম ফিরে এসেছে,—যেমন মার্চিশন হয়েছিল কাবা-লেগা, এখন আবার সেই মার্চিশন নামই চালু হয়েছে।)

ভিচুম্বির গ্রামটি ভারতের এ ধরনের অনেক গ্রামের চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে (এবং আফ্রিকার আরও অনেক জায়গায়) মানুষ যেখানে সেখানে মল

ত্যাগ করে না। চারদিকে স্তূপীকৃত শুকনো মাছ আর হাজার খানেক মারাবু (Marabout) পাখি। মারাবু ঠিক এদেশের বড় হাড়গিলা (Adyutant stork) পাখির মত। ভিটুম্বির ঘরে ঘরে কাক-চড়ুই-এর মতই মারাবুদের প্রাদুর্ভাব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানে খেলা করছে আর তাদের পাশেই দাড়িয়ে দৈত্যকার পাখিগুলো—জোরে এক ঠোকর মারলেই মানুষের বাচ্চারা সাংঘাতিক জখম হবে। শুনলাম কখনই এই অঘটন ঘটেনি।

লেকের তীরে দাড়িয়ে দেখলাম এক অপূর্ব সৌন্দর্য—দিগন্তবিস্তৃত সবুজ-নীল জলরাশি প্রায় সাগরেরই মত আর তার মাঝে শ্বেতপদ্ম মালার মত পেলিকান পাখির ঝাঁক। যেন স্বপ্নলোকের হ্রদে ভাসছে একদল সাদা পরী।

এখানেই দেখলাম একটি বড় হাতি জেলেপাড়ার আশে পাশে ঘুরছে ডাস্টবিন নেলী বা ফন দের বেকের বাড়ির সামনে যে হাতি দুটি ছিল তাদেরই মত। এটিও মানুষের ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় আর ফেলে দেওয়া খাবার কুড়িয়ে খায়।

দু বছর বাদে গিয়ে শুনলাম এই হাতিটির রোমাঞ্চকর কাহিনী। একদিন দেখা গেল সে নৌকা থেকে কয়েকটা কাঁচা মাছ তুলে খাচ্ছে। অভ্যাসটা তাকে পেয়ে বসল। তারপরই সে জেলেদের উঠোন থেকে শুকনো মাছ বা আধপোড়া মাছ (Smoked Fish) খেতে শুরু করল। একদিন একজন জেলে একটি ছোট মরা অজগর ছুড়ে দিল হাতিটার দিকে কি আশ্চর্য হাতিটা সেই সাপের মাংস চিবিয়ে খেতে লাগল। ঠিক সে সময় জার্মানীর ডর্টমুণ্ড (Dortmund) চিড়িয়াখানার অধিকর্তা তাঁর মুভি ক্যামেরা নিয়ে সেখানে হাজির ছিলেন, ঘটনাটা তিনি ফিলমে ধরে রাখেন।

এরপর জেলেদের মাছ নিয়ে হাতিটার উপদ্রব দিন দিন বেড়ে চলল, তাই শেষ পর্যন্ত তাকে গুলি করে মারা হয়। কী কুক্ষণে যে বেচারা মাছের কাঙাল হয়েছিল!

আমাদের দেশেও মাংসাশী হাতির গল্প দু-একটা শোনা গেছে,—যতদূর জানি ওগুলি গল্পই। পালামৌ জঙ্গলে দু-চার জন আদিবাসী বলেন কখনও কখনও হাতি মানুষ মেরে খেয়ে ফেলেছে। অবশ্য এ ঘটনার এখনো তেমন উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হাতিদের চরিত্রগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আজ বললাম। হাতিদের বিষয়ে আরো চিত্তাকর্ষক কিছু কিছু গল্প বারান্তরে বলা যাবে।

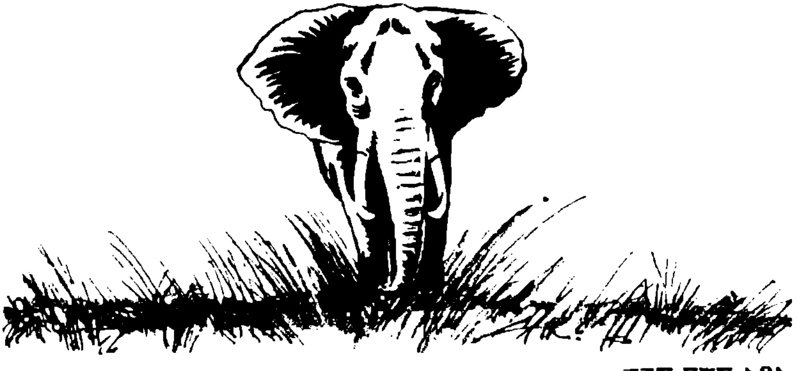

বিশ্ব কাপের আঙিনা থেকে

নবম দশমের সম্পাদক অশোক চৌধুরী এখন স্পেনে। উদ্দেশ্য, বিশ্ব কাপ ফুটবলের সবচেয়ে তাজা খবর ও ছবি তোমাদের উপহার দেওয়া। কিন্তু স্পেনে ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিচিত হচ্ছেন সেখানকার শহরাঞ্চল ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সেভিয়া স্পেনের একটি রাজ্য। সেভিয়ার এক সুন্দর পরিচয় পাবে স্পেন থেকে সদ্য পাঠানো এই লেখায়।

স্পেন থেকে অশোক চৌধুরী

সেভিয়া বিমানবন্দরে নামার পর চিন্তা ছিল একটাই, কোথায় থাকব কলকাতা থেকে এসে।

অনেক চেষ্টা করেও এখানকার হোটেলে জায়গা সংরক্ষণ করা যায়নি। বরাবরই স্পেনের ট্রাভেল এজেনট বলেছেন, সব হোটেল ভর্তি। আমরা কিছু করতে পারছি না। এমনিতেই স্পেনে প্রচুর ভ্রমণকারী আসেন গরমকালে। এবারে আবার বিশ্ব-কাপের খেলা এখানে। সংরক্ষণ থাকুক আর না থাকুক আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ব্রাজিলের খেলা দেখতে হবেই তাই সেভিয়ায় চলে যেতে হল।

আগমণের দরজা দিয়ে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল একটা কাউনটার। সাইন-বোরডে লেখা আছে, তোমার হোটেলের দরকার থাকলে আমরা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর কাউনটারের মেয়েটির সামনে আসার সুযোগ পেলাম। ফোন করে করে একটা চার তারা হোটেলে আমাদের একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। রোজ দিতে হবে সাত হাজার দুশো প্যানোরা। ভারতীয় টাকায় প্রায় সাতশো কুড়ি টাকা।

মেয়েটি আমার হয়ে যে চেষ্টা করল তার জন্য পারিশ্রমিক দিতে হল পাঁচশো পেসতা। আগে বলা হল, জায়গা নেই। আসলে দেখলাম অনেক জায়গা রয়েছে। কেন এমন হল, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক কিছু জেনেছি।

যারা স্পেনে বিশ্বকাপের খেলার ব্যবস্থা করেছেন তারা অনেক হোটেল পুরো আগলে রেখেছিলেন। আশা করেছিলেন অনেক সাংবাদিক আসবেন। আসেল তা হয়নি। তার ওপর যা হয়েছে তা হল, প্রতিবছর যত ভ্রমণকারী এখানে আসেন তারা আসেননি। সবাই বোধহয় খেলার সময় ভিড় এড়াতে চেয়েছেন। তার ফলে হোটেলওয়ালারা দাম বাড়িয়ে যে দু পয়সা রোজগার করবেন ভেবে ছিলেন তাও হয়নি এবং সরকার সব মিলে যে ডলার রোজগার করবেন ভেবেছিলেন তাও হয়নি।

যাই হোক আমরা ঘর পেলাম। যে হোটেলে আমরা আছি সেখানে সবাই প্রায় ব্রাজিলের লোক। ওখানকার ফুটবল পাগল মানুষেরা এসেছেন নিজের দেশকে সমর্থন করে জিতিয়ে নিয়ে যেতে। ভাবসাব দেখে মনে হয়েছে, ওরা শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন। চালচলন দেখে বেশ বোঝা যায় বিদেশী।

মুদ্রার ওদের অভাব নেই। ওদের দেশ নিশ্চয়ই বিদেশী মুদ্রার ব্যাপারে কার্পণ্য করেনি বিদেশি মুদ্রার ব্যাপারে আমাদের দেশ ত বটেই, অন্যান্য দেশও অনেক হিসেব করে খরচ করেন কিন্তু এরা ফুটবলের ব্যাপারে বিদেশি মুদ্রা খরচ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য

সেসার মেনোত্তি

করেন না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ব্রাজিলের খেলার সময় দেখলাম ব্রাজিলের জার্সি গায়ে দিয়ে বসে আছে এমন দর্শকের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার হবে।

শুনেছিলাম ফুটবল ব্রাজিলের জীবনে অনেক কিছু ; সেভিয়ায় তা দেখলাম। এবারে আসা যাক সেভিয়ার প্রসঙ্গে। শহর ত খুবই ছোট। লোকসংখ্যা কয়েক লাখ হবে। এখানকার বাড়িঘর বেশির ভাগই দোতলা। তবে সাত/আটতলা বাড়িও আছে। তার সংখ্যা খুবই কম এবং তা তৈরি হয়েছে মূল শহরের বাইরে। বড় রাস্তা এখানে খুবই কম। সবই একেবারে সরু গলি। কোন রকমে একটা গাড়ি চলতে পারে। সেজন্য সব রাস্তাগুলি গাড়ির জন্য একমুখী করা আছে। ফুটপাথ সামান্যই, যা দিয়ে একজন লোক চলতে পারে। কারোকে অতিক্রম করে চলতে গেলে রাস্তায় নেমে যাওয়া ছাড়া বা বউবাজারের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তফাৎ আছে। ওখানে সবই থাকে বেশ নোংরা। এখানে একদম ঝকঝকে পরিষ্কার। এত গলি বড় রাস্তায় এসে মেশার ফলে ট্রাফিক সিগন্যাল খুব বেশি। একটু গাড়ি চলতে না চলতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রাফিক পুলিশ এখানে মেয়েরাও আছে। এখানে ট্যাক্সিতে বসলেই প্রথমে তেতাল্লিশ এবং পরে প্রতি এক মিনিটে তিন পেসতা করে। দাঁড়িয়ে থাকলেও মিটার একই গতিতে চলে।

সাইকেল এখানে চোখে পড়েনি। হয় পথচলতি মানুষ না হলে গাড়ি। শহরে বাস আছে কিন্তু রিকশা বা থ্রি হুইলর নেই। এখানে দেখার জিনিস কিছু নেই বললেই চলে। পুরনো শহর তাই বহু প্রাচীন বাড়ি দেখা যেতে পারে। শহরটা ঘুরে দেখার জন্য এক ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে।

পুরনো শহর পুরনো প্রথায় দেখার জন্যই বোধহয় এই ব্যবস্থা। শহর পুরনো হলেও কেন্দ্রীয় বাজারটির ব্যবস্থা কিন্তু অতি আধুনিক। তিনতলা ডিপারটমেনটাল স্টোর রয়েছে এবং প্রতিটি তলায় যাওয়ার জন্য এসক্যালেটরও রয়েছে। সিনেমা হল প্রচুর।

স্পেনের একটি রাজ্য সেভিয়া যে সব প্রচার পুস্তিকা বিলি করে তাতে একটা মজার কথা রয়েছে, **Be careful in the street, sevilia has also individuals who take things that are not theirs.** এবং কিছুদূরে গেলে আমেরিকা এবং ইতালি আবিষ্কার করার পরিকল্পনা যেখানে করা হয়েছিল সেই জায়গাটা দেখা যেতে পারে। ওরই পাশে রয়েছে রোমান কিছু ধ্বংসাবশেষ।

ফকল্যানডের যুদ্ধ সারা স্পেনে যেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে, এখানেও তাই আছে। বিশ্বকাপ খেলার উদ্বোধনের দিনে প্লাজা ক্যাটালোনিয়ায় অংশগ্রহণ করি। দেশের পতাকা যখন উত্তোলন করা হচ্ছিল, ইংলনডের পতাকা তোলার সময় দর্শকরা বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন। মেয়র নার[illegible] সেরা পতাকা উত্তোলন করলেন তা সত্ত্বেও ওরা নিজেদের ধরে রাখতে পারেননি।

স্পেনের লোকেরা ফকল্যানড যুদ্ধে ইংলনডের বিপক্ষে। যার প্রতিক্রিয়া আমরা খেলার মাঠেও দেখছি। ওরা সবাই মিলে আরজেনটিনাকে সমর্থন করেছেন। আর-

জেনটিনার কোচ সীজার লুই-এর বক্তব্য ওদের আরও উৎসাহিত করেছে। তিনি বলেছেন বৃটিশ, ইংল্যানড স্কটল্যানড এবং নরদার্ন আয়ারল্যানড এই তিনটি দল পাঠিয়ে বিশ্ব-কাপে লড়াই করছে। আমরা এখানে সংগ্রাম করে ফকল্যানডের জবাব দেব।

আমরা এখানে এসে সবচেয়ে বড় যে সমস্যায় পড়েছি তা হল ভাষার। একে বেশির ভাগ লোকই ইংরাজি জানেন না, তার ওপর আবার এটা ইংলনডের ভাষা বলে ওরা বলতে চাইছেন না। ওরা মনে করছেন আমরা ইংলনডের সমর্থক। ভারত সরকার যদি বৃটেনকে ফকল্যানড বিষয়ে সমর্থন করে বসে তাহলে আমাদের অবস্থা হবে চরম।

ভূ-কবিতা

অশোক হালদার

কুড়ি কোটি বছর পূর্বে কিন্তু পৃথিবীর স্থলভাগ বলতে ছিল একটিমাত্র মহাদেশ। যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক নানান পরীক্ষা-প্রমাণের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সন্ধান পাওয়া গেছে এই বিস্ময়কর সত্যের। এই তত্ত্বের জনক জেমস উইজেনার নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী। সুদূর অতীতের কথা নয়, সেটা ছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। উইজেনার পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে দারুণ আশ্চর্য হলেন একদিন। তিনি লক্ষ্য করলেন, ব্রাজিলের তটভূমি ফোলা-ফোলা খাঁজকাটা তার দুস্তর আটল্যাণ্টিকের অপর পারে ব্রাজিলের মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যামেরুণ তটরেখাও খাঁজকাটা, কিন্তু ভেতরে ঢোকা। এই দুই তটভূমি এমনই যে পরস্পর সরাসরি খাঁজে খাঁজে বেমালুম বসে যায়। চমকে উঠলেন উইজেনার। তবে কি এই দুই মহাদেশ অতীতে একই মহাদেশ ছিল ?

শুরু হল গবেষণা বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ ও তাদের উদ্ভিদ-জন্তু-জানোয়ার নিয়ে। অবশেষে আলোর সন্ধান পেলেন উইজেনার। সেদিনটা ছিল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি। বিদগ্ধ দুনিয়ায় তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হল পৃথিবীর স্থলভাগ নিয়ত-সঞ্চরণশীল. কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-খণ্ডের অবস্থানের বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে, এমন সময় ছিল যখন স্থলভাগ ছিল একটি অখণ্ড পিণ্ড। দক্ষিণ আমেরিকা যুক্ত ছিল আফ্রিকার সঙ্গে। ক্রমে ছাড়াছাড়ি হয় এবং দু মহাদেশের মধ্যে ব্যবধান গড়ে ওঠে ৩৭০০ মাইলের, জাঁকিয়ে বসে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর। অনুরূপভাবে উত্তর আমেরিকা ছিল ইওরোপের সঙ্গে যুক্ত এবং আনটারটিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত। অস্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষ থেকে বিচ্যুত হলে ভারতবর্ষ ধেয়ে চলে এশিয়া অভিমুখে। এশিয়া ও ধাবমান ভারতবর্ষের সংঘর্ষে জেগে ওঠে উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বতমালা। স্থলভাগের এই বিচ্যুতি ও সঞ্চরণশীলতা গ্রীণল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। ১৮৭৩ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরে ইওরোপ থেকে বিচ্যুত গ্রীণল্যাণ্ড পশ্চিমে সরে গেছে অনেকখানি। উইজেনারের তত্ত্বে নিহিত রয়েছে সমৃদ্ধতর গবেষণার বীজ। কুড়ি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর স্থলভাগ ছিল মহাসমুদ্রবেষ্টিত একটিমাত্র ভূখণ্ড—উইজেনার যার নাম দিয়েছেন 'প্যাংগায়া', ভূ-বিজ্ঞানে 'গণ্ডওয়ানাল্যাণ্ড' নামেও যা আখ্যাত।

কবিতার মত আশ্চর্য অথচ সত্য এই তত্ত্ব অবিনশ্বর হয়ে আছে Geo-poetry বা 'ভূ-কবিতা' নামে।

—৬—

তোমরা অনেকেই হয়ত ডুয়ার্সের নাম শুনেছ। হিমালয়ের পাদদেশের এই বিস্তীর্ণ সমতলভূমির সম্পূর্ণ এলাকা প্রায় তিন হাজার চারশ বর্গ মাইলের মত। তবে উত্তরবঙ্গে পড়েছে পশ্চিম ভাগ। এবং পূর্ব ভাগ আসামে। ডুয়ার্স অঞ্চলকে দ্বি-খণ্ডিত করে চলে গেছে সুন্দরী, স্বচ্ছতোয়া সংকোশ নদী। পুব ও পশ্চিম ডুয়ার্স ভূটানের একসময় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৪-৬৫ সালে এই সমস্ত অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতের অঙ্গীকৃত হয়। ডুয়ার্সের পুব ভাগে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলার নৈসর্গিক দৃশ্য সে কারণে প্রায় একইরকম। হিমালয়ের যত কাছে যে এলাকা, ততই জঙ্গল গভীর সেখানে।

ডুয়ার্স নামটা কি করে হল বলত? অনেকের ধারণা কথাটা এসেছে 'Doors' থেকে। অনেকগুলো পথ এই অঞ্চল থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বতমালাতে (Lesser Himalayas) উঠে গেছে। সিকিম, ভুটান, নেপাল এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং, মিরিক-এর পথও সব এখান থেকেই বেরিয়েছে। সে কারণেই শিলিগুড়ি আজকের পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর।

পূর্ব ও পশ্চিম ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ সমভূমি থেকে হিমালয় উঠে দাঁড়িয়েছে যেন একেবারে হঠাৎই। প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে। ডুয়ার্সের প্রায় সব জায়গা থেকে এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলা এবং উত্তরবঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) রংপুর ইত্যাদি জেলা থেকে হিমালয়ের বরফাবৃত চূড়োগুলো দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে। একসময় এই সমস্ত অঞ্চলই মনুষ্য বাসের অযোগ্য ছিল। ম্যালেরিয়া ও ও কালাজ্বরের (Kala azar) কবলে বহু মানুষ প্রাণ হারাত। সাপ, জেঁাক, বিছে এবং অন্যান্য তাবৎ জংলী জানোয়ারের উপদ্রব ত ছিলই। দেশ বিভাগ ও চীনাদের ভারত আক্রমণের পর এই ডুয়ার্স অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মনুষ্য-বাস নেই এমন অঞ্চল খুবই কম। জঙ্গল-বিশারদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বন-জঙ্গলের এই জবর-দখল ও প্রকৃতির উপর এই জোর-জুলুম মোটেই সুখকর নয়। পৃথিবীতে বনজঙ্গল এবং মানুষের বাসোপ-যোগী জমির মধ্যে একটা সুষম অনুপাত থাকা প্রয়োজন। মানুষ নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তার সর্বগ্রাসী ক্ষিদেয় প্রতিনিয়ত নষ্ট করে চলেছে জঙ্গলকে। শীগগিরই এর মূল্য দিতে হবে আমাদের মানসিক ভারসাম্য, সৌন্দর্যবোধ, শান্তি, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি সবকিছুই দিয়ে। কিন্তু

সাধারণ মানুষকে এবং অনেক অসাধারণ মানুষকেও এ কথা বোঝান যায় কোথায় ? তোমরা যদি বড় হয়ে বোঝাতে পার ! আমাদের দেশের মত সুন্দর ও বৈচিত্রপূর্ণ দেশ পৃথিবীতে নেইই—যদি জনসংখ্যা একটু কম হত, যদি দেশের নেতারা তাঁদের নিজ নিজ ইজম, পার্টি ও গদিকে যতখানি ভালবাসেন তার এককণাও ভালবাসতেন এই হতভাগা দেশকে !

যত্রতত্র কাঠ কেটে, গাছ ফেলে, জঙ্গল শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। যে-কোন জঙ্গল পরিবেষ্টিত গ্রামে বা ছোট শহরে যাই না কেন কিছুদিন পরপর, গিয়ে সে জায়গা আর চিনতে পারি না। মানুষের হাত দ্রুত সব কিছুই ধ্বংস করে ফেলছে। বেশির ভাগ রাজ্যের বনবিভাগই তাঁদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেন না। ঠিকাদারেরা, বেশির ভাগ অঞ্চলেই যা খুশি তাই করেন। যে সব রাজ্যে ফরেস্ট করপোরেশন হয়েছে দেশের ভালর জন্যে, সেখানে ভাল যে কী প্রকার হচ্ছে তা যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন। তবে একটা কথা এখানে নিশ্চয়ই বলা দরকার যে, বনবিভাগের নিম্নতম কর্মী, ফরেস্ট গার্ডদের শিক্ষার মান ও বেতনের হার অবিলম্বে বাড়ান দরকার। বন-বিভাগের সমস্ত কর্মচারীরই বেতন অনেক বাড়ান দরকার কারণ তাঁদের অনেক অসুবিধা ও নির্জনতার মধ্যে কাজ করতে হয়।

বিহারের হাজারীবাগ

হাজারীবাগের জঙ্গলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় গোপাল। আমার শিকারি বন্ধু মিহির সেন। চার্টার্ড এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট।

এক বর্ষার শেষ রাতে বোম্বে মেলে হাজারীবাগ রোড স্টেশন (সারিয়াতে) নেমে বাসে করে হাজারীবাগের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। সেই প্রথম চা খেয়েছিলাম, টাটীঝারীয়ার পণ্ডিতের দোকানে, কুচো নিমকি আর কালো জাম দিয়ে। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে। বাস থেকে টাটীঝারীয়ার একটু আগে জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে সূর্যোদয় এখনও চোখে লেগে আছে। হাজারীবাগ শহরে নেমে, সাইকেল কি রিক্সা করে যখন বর্‌হি রোডে গোপালদের ছবির মত বাড়ি, 'পূর্বাচলে' এসে পৌঁছলাম তখন মন খুশিতে ভরে গেল। ছোটবেলার মনটাই অন্যরকম ছিল। কত সহজে, কত সামান্যতে খুশি হতাম তখন।

পূর্বাচলের উল্টোদিকে রিফরমেটরীর রাস্তা চলে গেছে। জেলখানা। হাজারী-বাগ লেক। আর বর্‌হি রোডের বাঁ পাশ বরাবর মোরব্বা ক্ষেত। সিসাল হেম্প। যা দিয়ে দড়ি তৈরি হয়। সেই মোরব্বা ক্ষেতে আড্ডা ছিল তিতির আর খরগোশের। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে আমি আর গোপাল মোরব্বা ক্ষেতে তিতির আর খরগোশ মেরে হাত পাকাতাম। গোপাল-দের বাড়ির পরের বাড়িই ছিল স্মিথ সাহেবের বাড়ি। তিনিই বাড়ির কেয়ার-টেকার ছিলেন। সাইকেল চালিয়ে আসতেন বৃদ্ধ আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। গোপালের ভারী প্রিয় ছিলেন স্মিথ সাহেব। কখনও এমন হয়নি যে আমরা কিছু শিকার করছি অথচ স্মিথ সাহেবকে পাঠাইনি।

স্মিথ সাহেব অনেকদিন হল মারা গেছেন। বাড়িটা রয়ে গেছে। কারা থাকেন এখন, জানি না। এখনও গেলে, বাড়ির সামনে একবার পায়চারী করে আসি। অনেক পুরোন কথা মনে পড়ে যায়। এখন মোরব্বা ক্ষেতের জায়গাতে ইউকালিপটাসের প্লানটেশান করেছেন ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট। ভোল পাল্টে গেছে।

আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই ত গেলাম। বিদেশেও। এক অস্ট্রেলিয়া ছাড়া, সব মহাদেশই ঘোরা হয়েছে কিন্তু হাজারীবাগের মত ভাল, খুব কম জায়গাই লাগল। স্বাস্থ্য ছাড়াও প্রথম যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলোর জন্যেই বোধহয় এত ভাল লাগে। হাজারীবাগ শহরে ট্রেন লাইন নেই, সে কারণেই পরিবেশ এখনও কলুষিত হয়নি ; কলকারখানা তেমন গড়ে ওঠেনি। আজও হাজারীবাগে গেলে সে কারণেই এত ভাল লাগে।

কানহারী, সিলাওয়াড় আর সীতাগড়া এই তিন পাহাড় ঘেরা হাজারীবাগ শহর। শেষবার গেছিলাম গত বছর, গরমে। তোমরা কাগজে পড়ে থাকবে, মানুষখেকো চিতার উপদ্রব হয়েছিল এবং আমি সেখানে যাচ্ছি ; এ কথা। আসলে, চিতা নয়, একদল নেকড়ে বাঘ শিশু ও অশক্ত মানুষ ধরছিল।পারমিট ছিল গোপালের নামেই। আমাকে নেমতন্ন করেছিল গোপাল।

গিয়েই জানলাম চিতা নয় ; নেকড়ে। গোপাল, আমি চলে আসার পর মেরেও ছিল একটা। আমি মোটে একদিন থেকেই চলে আসি। গোপালের অনেক শিকারি বন্ধুই গিয়ে জুটেছিলেন। তার ওপর স্থানীয় শিকারিরা ত ছিলেনই। হাজারীবাগের একজন নামকরা শিকারী টুটু ইমাম, যিনি একসময় অ্যামেরিকান ও বিদেশী সায়েবদের নিয়ে এসে বাঘ শিকার করাতেন। বিজয় সেনও ছিলেন খুব নামকরা। তাঁর শিকারের বইও ছিল একটি, যতদুর মনে পড়ে। টুটু ইমামের ছেলে বুলু ইমাম অবশ্য বলছেন যে, মানুষখেকো আসলে একটি চিতাই, নেকড়ে নয়। যাই হোক, ঐ বিতর্কে এখন আমাদের গিয়ে লাভ নেই।

সীতাগড়া পাহাড়ে এবং সংলগ্ন এলাকাতে পঞ্চাশ শতকের শেষের দিকে একটি মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হয়েছিল। সেই বাঘ আমি আর গোপাল, নাজিম সাহেবের সঙ্গে প্রথমে মারার চেষ্টা করি। আমাদের সঙ্গে পরে যোগ দেয় সুব্রত চ্যাটার্জি। ঐ সূত্রেই প্রথম আলাপ এবং পরে গভীর বন্ধুত্ব হয় সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রতর বাবা শ্রীসত্যচরণ চ্যাটার্জি ছিলেন তখন হাজারীবাগের পুলিশ সাহেব। মাসীমা মেসোমশায় এখনও হাজারীবাগেই আছেন তাঁদের কানহারী রোডের বাড়িতে। বাড়ির নাম 'দ্য ইউক্যালিপটা'— ইউক্যালিপটাস গাছের বাহার সে বাড়িতে। আমরা কোলকাতায় ফিরে আসার পর সুব্রত এবং

টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক দুজনে মিলে সীতাগড়ার বাঘটিকে মারে। অতবড় বাঘ আমি আমার জীবনে দেখিনি। বাঘের চামড়াটি এখনও 'দ্য ইউক্যালিপটা'তে বসবার ঘরের দেওয়ালে টাঙান আছে। তোমরা কেউ হাজারীবাগে গেলে, দেখে আসতে পার।

হাজারীবাগ এবং সংলগ্ন এলাকার জঙ্গল এবং হাজারীবাগ ন্যাশানাল পার্কের প্রসঙ্গে আসার আগে, শিকার, বিশেষত বাঘ শিকার এবং ব্যাঘ্র-প্রকল্প সম্বন্ধে তোমাদের দু একটি কথা বলা দরকার। এ বিষয়ে হয়ত অনেক ভুল ধারণা আছে তোমাদের অনেকেরই।

উনিশ শ সাতচল্লিশে দেশ যখন স্বাধীন হল, তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে ক্যাম্প করে থাকা অ্যামেরিকান, ব্রিটিশ, এলায়েড ফোর্সেস এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানরা যথেচ্ছভাবে শিকার করে বাঘ সমেত অন্য নানা বন্য প্রাণীর সমূহ ক্ষতি করেন। আমার এমন দৃষ্টান্তও জানা আছে যে, ওয়েপন-ক্যারিয়ারে করে টমি-গান ও স্টেনগান নিয়ে দলবদ্ধভাবে তাঁরা বহু শিকারই নয়, রীতিমত কসাইদের মত যথেচ্ছভাবে সবরকম জানোয়ার হত্যা করেছে। ট্রাক, ওয়েপন-ক্যারিয়ার, জীপ, এমন কি গভীর জঙ্গলের এলাকাতে রেল-লাইনে ট্রলির সাহায্যেও রাতে স্পট-লাইট নিয়ে শিকার করতেন তাঁরা। জানোয়ার যত না মরত, তার চেয়ে অনেক বেশি আহত ও পঙ্গু হত।

আজকে, শিকার করাটা ব্যাড টেস্ট। 'শিকার' কথাটা শুনলেই অনেকে নাক কুঁচকোন। কিন্তু যাঁরাই কখনও শিকার করেছেন শিকার সম্বন্ধে জানেন, তাঁরাই জানেন যে, এমন পুরুষালী-স্পোর্ট খুব কমই ছিল। রাজা-রাজড়াদের শিকারের কথা বলছি না। যাঁরা যথার্থই শিকার করতেন, অনেক শারীরিক পরিশ্রম, সময় ও মানসিক সাহসে ভর করে, তাঁদের কথাই বলছি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কি করে বাড়ান যায় তা সরকারের বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এদেশে প্রতিভাবান এবং বুদ্ধিমান লোকের অভাব কখনও ঘটেনি। প্রতিভাবান রাজ-নৈতিক নেতাদের মস্তিষ্কে একটি আইডিয়া এল। বিদেশী পর্যটকদের দিয়ে বাঘ শিকার করিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাক। বুদ্ধির মত বুদ্ধি! সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব চলে-যাওয়া বহু রাজন্যবর্গ এবং অনেক মানুষ মিলেমিশে নানা কোম্পানি গড়ে তুললেন সারা দেশে। তাঁদের সকলের নাম করে আজ এতদিন পর আর গ্লানি এবং আমাদের সরকারী নির্বুদ্ধিতার কলঙ্ক বাড়াতে চাই না। চুক্তি হল, বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে, বিদেশী পর্যটকদের এক-একটি বাঘের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ডলার বা পাউণ্ড দিতে হবে। কোন কোন কোম্পানির শর্ত ছিল, বাঘ মারা নয়, বাঘ দেখালেই টাকা দিতে হবে—'টু প্রডুস্ আ টাইগার উইদিন শুটেবল ডিসট্যান্স।'

বলা বাহুল্য, রোগা-মোটা, সাহসী-ভীতু সবরকমের পয়সাওয়ালা বিদেশীদের ভীড় লেগে গেল। ষাটের দশকে সমস্ত ভারতবর্ষে দেখতে দেখতে যে কত বাঘ মুড়ি-মুড়কির মত মারা পড়ল, তার ইয়ত্তা নেই। ভারতের নানা জঙ্গলের নামকরা সমস্ত ব্লকের ফরেস্ট বাংলোর খাতা নিয়ে কোনও উৎসাহী গবেষক যদি গবেষণা চালান তাহলেই এই সংখ্যার প্রতুলতা জানা যাবে। উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গাতেই এই হত্যালীলা চলল। রাজকোষে যত বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত হল তা অর্থমন্ত্রীরাই জানবেন হয়ত।

এর ওপর চলল চোরা-শিকার। চোরা

শিকারের সিংহভাগই হয়েছে বনবিভাগ এবং পুলিশবিভাগের জ্ঞাতসারে। এমনকি, আজও সারাদেশের অনেক অভয়ারণ্যে, যেখানে পয়েণ্ট টু টু পিস্তল নিয়েও পর্যটকদের ঢোকা বারণ, সেখানে বনবিভাগের বা পুলিশবিভাগের বড়কর্তাদের অতিথিরা চোরা-শিকার করছেন।

এ ছাড়াও আছে গভীর বন জঙ্গলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গ্রামের মানুষরা। তারা কেউ কেউ নেহাত মাংসর লোভেই শিকার করত ও করছে। তারা যে বড় গরীব! প্রোটিন বলতে, কখনও সখনও মারা শূয়োর হরিণ বা খরগোশ বা শজারুর মাংসকেই তারা বোঝে। কেউ কেউ চামড়া ও মাংস বিক্রী করার জন্যেও চোরা-শিকার করত ও করে। আসামে, আমি একজন শিকারীকে জানতাম, যার পেশাই ছিল বাঘ ও চিতার চামড়া বিক্রী করে খাওয়া। সে একাই বড় বাঘ ও চিতা মিলিয়ে প্রায় শ তিনেক মেরেছিল স্বল্প আয়ুর মধ্যেই। তার ফাঁসী হয়ে যায় একই দিনে সাতজন আত্মীয়কে জমিসংক্রান্ত ঝগড়ায় গুলি করে মেরে। সেই শিকারী কিন্তু শিকারী হিসেবে ছিল দুঃসাহসী এবং অসম্ভব ভাল ট্র্যাকার। তার কথায় পরে আসব।

চোরা শিকারের সমস্যা অবশ্য সব দেশেই আছে। আফ্রিকার জায়ের, কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানীয়া ইত্যাদি দেশে আন্তর্জাতিক চোরা-শিকারীর দল রীতিমত সমর সম্ভারে সেজে এই হত্যালীলায় নেমেছে।

বাঘের বংশ যখন প্রতিভাবান আমলা এবং বুদ্ধিমানদের দয়ায় প্রায় লোপ পেতে বসল মাত্র দশ বছরে, তখন হঠাৎ টনক নড়ল দিল্লীর কর্মকর্তাদের; গেল গেল রব উঠল। রিজার্ভ ফরেস্টস ত ছিলই, অভয়ারণ্য গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক। তারপর এল টাইগার-প্রোজেক্ট। এও এক মস্ত তামাশা। উদ্দেশ্য মহৎ, কোটি কোটি টাকা খরচও হচ্ছে এতে, কিন্তু একমাত্র সুন্দরবন এবং ভারতের বাইরে নেপালের একটি অভয়ারণ্য ছাড়া আর কোথাও যে বাঘের সংখ্যা খুব একটা বাড়ছে বা বেড়েছে এ কথা প্রমাণ সাপেক্ষ। কাগুজে সংখ্যার কাগুজে-বাঘে বিশ্বাস করি কি করে?

[চলবে]

অগ্নিযুগ

১৮৯৭ সালের ২২ জুন দাক্ষিণাত্যের দামোদর চাপেকার এবং বালকৃষ্ণ চাপেকার প্রথম অত্যাচারী ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করবার জন্য গুলি ছোঁড়েন এবং তাকে হত্যা করেন। একেই বলা যায় ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। তাদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আগুনের গোলা ছুটে গিয়ে এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল এবং আগ্নেয়াস্ত্রই হল এই সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। এ যুগকে তাই বলা হয় 'অগ্নিযুগ'।

বুদ্ধির খেলা

নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন সমস্যার জট খোলার মজা আলাদা। 'বুদ্ধির খেলা' বিভাগের অবতারণা এই জন্যই। এর প্রতিটি ধাঁধা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে তোমরা তোমাদেরই জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে একটু ভেবে এর উত্তরগুলো বলে দিতে পার। বড়দের সাহায্য নিতে হবে না। সময়, ধর প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ মিনিট। না পারলে আরও ৩ মিনিট। পারলে আমাদের জানাও। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও উত্তর প্রকাশ করা হবে আগামী দ্বিতীয় সংখ্যায়।

১. নিচের সমীকরণ দুটিতে সঠিক গাণিতিক চিহ্ন বসাও।

ক. 8 4 13 14 11 = 0

খ. 7 5 8 11 9 = 18

২. হারিয়ে যাওয়া সংখ্যাটি কত ?

ক

17	20	40
3	4	10
28	?	60

খ. 3 14 61 252 ?

৩ যদি, ADSSDQ = BETTER হয়, তবে FNNC = ?

৪. কোন ছবিটি বেমানান ?

1 2 3 4

৫. যে কোন একটি দেশলাই কাঠি একটু অন্যরকম ভাবে সাজিয়ে নিলেই নিচের সমীকরণটি সমাধান করা যায়। দেখ, তোমরা পার কিনা ?

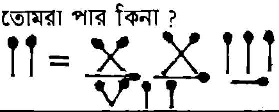

এবারের বুদ্ধির খেলা তৈরি করেছেন **সুলতা মুখোপাধ্যায় ও সন্দীপন মুখোপাধ্যায়।**

১ জুন '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার উত্তর

১. বুবল ২. ওয়াশিংটন

৩. 18 (প্রতিটি—3 দ্বারা গুণ হয়েছে)।

৪. 8 (ঘরের বাইরের সংখ্যাগুলোকে যোগ করে বর্গমূল বের করা হয়েছে)।

৫. $8 \div 4 + 2 \times 3 - 1$

৬. এভারেস্ট (শুধু এই শৃঙ্গটিই নেপালে অবস্থিত, বাকিগুলো ভারতে)।

১ জুন '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

রঞ্জিতকুমার বসাক, গারুলিয়া। হারুকুমার দাস, মাধবপুর। অশোক সিনহা, জলপাইগুড়ি। সৌমেন মিত্র, শেওড়াফুলি। শুভময় চট্টোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া। প্রভাকর মুখোপাধ্যায়, শেওড়াফুলি। সোনালী সরকার, তারকেশ্বর। রুমপা বরাট, কলকাতা। সোমা সরকার, খাগড়া। নিবেদিতা পাল, ভাঙ্গামোড়া। রবীনকান্তি দাস, ২৪ পরগণা। সোমনাথ বসু, ভদ্রকালি। অদিতি ও মিলন মুখার্জি, দুর্গাপুর। অর্কদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা।

সন্ধানী প্রতিযোগিতা

তোমরা নিশ্চয়ই জান, এ বছর অর্থাৎ ১৯৮২ সাল মহাকাশ বিজয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ। এই উপলক্ষে নবম দশম ১ এপ্রিল সংখ্যায় আমরা মহাকাশ বিজয়ের ওপর নানা তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছিলাম। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল এমন একটি শব্দ-ছক, যা সম্পূর্ণতই মহাকাশ, সৌরজগৎ এবং রকেট বিজ্ঞানের বিষয়-নির্ভর। একটু কঠিন মনে হতে পারে, তবে সঠিক তথ্য জোগাড় করতে পারলে তেমন সমস্যার হবে না। জগদীশ চৌধুরী এই ছকটি তৈরি করেছেন।

সূত্র ঃ পাশাপাশি

১. অনন্য বৈশিষ্ট্যময় গ্রহ।

৩. ষাটের দশকের প্রথম দিকের সোভিয়েট মহাকাশচারী।

৫. ১৯৬০ সালে রাশিয়া যে দুটি কুকুরকে মহাকাশে পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, তাদের একটির নাম।

৬. ১৯৫৭ সালে ৩ নভেম্বর স্পুৎনিক-২ করে মহাকাশে প্রেরিত জীবন্ত প্রাণীটির নাম।

১০. একজন ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। প্রায় চারশো বছর আগে, ইনি সূর্যের চারিদিকে গ্রহদের পরিক্রমণ বিষয়ে তিনটি সূত্রের উদ্ভাবন করেন।

১২. কেপ ক্যানভিয়েল থেকে উৎক্ষেপিত ভারতীয় উপগ্রহ।

১৫. কক্ষপথে পরিক্রমার সময় উপগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে।

১৭. ভূসমলয় কক্ষে স্থাপিত ভারতের

সন্ধানী প্রতিযোগিতা
উত্তরপত্রের কুপন

নাম ....

বাড়ির নাম ও রাস্তা ....

গ্রাম ও পাড়ার নাম ....

ডাকঘর ....

জেলা ....

প্রথম উপগ্রহ।

১৯. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আমাদের এই পৃথিবী, অন্যেরা পরিক্রমা করে চলেছে তাকে—এই মতবাদের প্রবর্তক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

২০. গ্রহ উপগ্রহের মধ্যেকার এক কল্পিত রেখা, যার ওপরে ওরা লাট্টুর মত পাক খায়।

সূত্র ঃ ওপর-নিচ

১. পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক।

২. ১৯৬০ সালে রাশিয়া যে দুটি কুকুরকে মহাকাশে পাঠিয়ে ফেরত আনে, তাদের অন্যটির নাম।

৪. পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের এই জিনিসটি তিন লক্ষ গুণেরও বেশি, চাঁদের ক্ষেত্রে ১/৮০ অংশ।

৭. মহাকাশ-গবেষণায় ব্যবহৃত একটি যন্ত্রাংশ।

৮. সূর্যের আলোর ওপর নির্ভরশীল এমন জিনিস যা চাঁদ ও কিছু গ্রহের ক্ষেত্রে বাড়ে এবং কমে।

৯. মঙ্গলের উপগ্রহের সংখ্যা।

১১. সৌরজগতে সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু।

১৩. সূর্যের গ্রহের সংখ্যা।

১৪ যুদ্ধের জন্য নির্মিত ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য রকেট ব্যবস্থার নাম-সংক্ষেপ।

১৫. কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে উপগ্রহ যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে যায়।

১৬. সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ।

১৮. যে-পথে গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রমণ করে।

★

---

১ জুন '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্ধানী প্রতিযোগিতার উত্তর

ব	গ		টে		বে	ল
ল		ডে	নি	স		ক
	নো		স		রিং	◦
ক্লে		না		হ্যা		থ্যো
	বা	ই		ম	স্কো	
গু		ডু	রা	ও		পে
চ	ন্দ্র		ন		সা	লে

১ জুন '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্ধানী প্রতিযোগিতার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

প্রথম ঃ বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত, শ্রীনিকেতন।

উৎপলকুমার শীল, ২৪ পরগণা। নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত, উত্তরপাড়া। সুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, সালকিয়া। কুন্তল কর্মকার, হাওড়া। স্বাতী শ্রীমানী, উত্তরপাড়া। অরিন্দম সেন, ফুলেশ্বর। অনিমেষ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুর। রূপায়ন ভট্টাচার্য, বহরমপুর। মৌসুমী বসু, কলকাতা। প্রদীপ চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া। অলোকেশ দাস, ঝাড়গ্রাম। সঞ্জিত বসাক, ২৪ পরগণা। কৌশিক বসু ও মৃণাল বৈরাগী, কৃষ্ণনগর। কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালা। অমিত পাল, কলকাতা। লোটশিয়া দাস, সাঁত্রাগাছি। আনর্ত ভড়, কলকাতা। সুমন চ্যাটার্জি, বরানগর। সিতেন্দু নাগ চৌধুরী, কলকাতা। পিনাকী ভট্টাচার্য, শ্যামনগর। সুমিতা সর্বজ্ঞ, গড়িয়া। অংশুমান পাল, কলকাতা। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর। প্রসেনজিৎ মিশ্র, গড়বেতা। প্রীতি মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ। শ্যামল দত্ত, পুরুলিয়া। পীযূষকান্তি ঘোষ,

ঝালদা। শান্তনু দাশগুপ্ত, শ্রীনিকেতন। অনিন্দ্য রায়, দুর্গাপুর-১৫। বিশ্বজিৎ রায়, জলপাইগুড়ি। তরুণ চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ও বুল্টু মণ্ডল, সুরেশ ও বিনয় চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর। সৌমেন বসু, কলকাতা। সুবীর নায়ক, বাঁকুড়া। চাণক্য গাঙ্গুলি, কলকাতা। সন্দীপ সেন, দুর্গাপুর। তথাগত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা। দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়। ডানকুনি, সুপর্ণা দত্ত, কাশীপুর। জয়দীপ সেন, কলকাতা। ভাস্কর ঘোষ, দমদম। দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা। প্রণব মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপুর। পার্থসারথি মান্না, দাসনগর। বৈশালী তালুকদার, সিঁথি। মনোজ রক্ষিত, কলকাতা। রণতোষ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট। রণজিত দাস ও গৌতম রায়, বসিরহাট। পদ্মাসনা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা। সুজয় দাস, শ্রীরামপুর। রাতুল দাস, বালুরঘাট। রুমা রায়, কলকাতা। সৌম্যজিৎ দে, তমলুক। শুভাশিস ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি। চিরঞ্জীব বিশ্বাস, কাঁচড়াপাড়া। রাজশ্রী সরকার, কল্যাণী। সুস্মিতা রায়, বর্ধমান। অনয় মুখার্জি, চিত্তরঞ্জন। কাকলী ঘোষ, হাওড়া। মৌসুমী চৌধুরী, হলদিয়া। অনিতা সরকার, খাগড়া। ঝর্ণা দাস, বহরমপুর। জয়তী রায়, আসানসোল। অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, জয়পুর। শেখরচন্দ্র সাহু, রামরাজাতলা। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, দশঘরা। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমতা। দোলন নায়ক, গঙ্গাজলঘাটি। সঞ্জয় কোনার, অমরকানন। শুভময় চট্টোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া। শমিতা সেনগুপ্ত, দমদম। কৌশিক মান্না, কদমতলা। হিল্লোল মজুমদার, বহরমপুর। জয়ন্ত কুমার ঘটক, পুরুলিয়া। রিক্তা ঘোষ, ঝালদা। অত্রিকুমার দাস, জয়পুর। দীপালী সাধুখাঁ ও প্রতিমা শেঠ, কলকাতা। অনুপ সরকার, সঞ্জয় হাঁসদা, বালুরঘাট। সোমনাথ দত্ত, নিয়ামতপুর। দীপঙ্কর দেব, বর্ধমান। সুব্রত সিনহা, মনীষা সিংহ, রুমপা বরাট, রুবি রায়, কলকাতা। অরুণকুমার জৈন, অরঙ্গাবাদ। অপর্ণা মুখার্জি, বর্ধমান। গৌতম সাহা, কোচবিহার।

গতবারের সন্ধানী প্রতিযোগিতার ছক অসাবধানতাবশত অসম্পূর্ণ ছিল। তাই এবার গতবারের প্রতিযোগিতাটিই আবার প্রকাশ করা হল।

সাপের বিষ

বিষাক্ত সাপ যদি ছোবল মারে আর সময়মত তার চিকিৎসা না হয়, মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এই সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে যতক্ষণ না মেশে, ততক্ষণ কিন্তু বিষাক্ত নয়। সাপের এই বিষে প্রধানত আছে, ভাসোটক্সিন ও নিউরক্সিন নামক দুই উচ্চমাত্রার প্রোটিন। এই প্রোটিন যদি রোজ খাওয়া যায়, তাহলে হজমশক্তি বাড়ে, শরীরও ভাল হয়। তবে এগুলো কিন্তু বিপদও ঘটাতে পারে, যদি, হজম হবার আগেই রক্তে মিশে যায়। ধর, মুখে, খাদ্যনালীতে বা পাকস্থলীতে যদি ক্ষত থাকে, তাহলে কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে পরলোকদর্শন। তাই আশা করব, তোমরা নিশ্চয় কেউ সকালে পাঁউরুটিতে জ্যাম বা মাখনের বদলে, সাপের বিষ লাগিয়ে খেতে চেষ্টা করবে না।

সাম্প্রতিক সংবাদ

বুদ্ধদেব বসু

ঝকঝকে, চোখে মুখে স্বপ্ন। খুশিতে প্রাণবন্ত মুখ। এমন বিস্ময়ভরা চোখ দেখলেই যেন নিশ্চিন্তপুরের অপুর মুখ মনে পড়ে।

ভাস্কর ভট্টাচার্যর বয়স বার। হাওড়ার কুরী রোডের বাসিন্দা। হাওড়ার বাসিন্দা হলেও ভাস্করকে এর মধ্যেই পৃথিবীর বেশ বড় সড় একটা দেশ সসম্মানে নিজের খরচে নিয়ে গেছে আকাশের বুক চিরে ঝকঝকে রূপোলী প্লেনে চাপিয়ে।

কি এমন কাজ করেছে বার বছরের ভাস্কর, যার এখন সবে ক্লাস এইট চলছে! যাদের ভাবনা রঙ আর তুলি দিয়ে কোন কিছু মস্ত ব্যাপার করা যায় কিনা, তাদের কাছে ভাস্কর সত্যিই বিস্ময়ের।

ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের ছাত্র ভাস্কর '৭৭, '৭৮, '৮০-এই তিন বছর শঙ্করের আন্তর্জাতিক পুরস্কারের অধিকারী। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে জাপান থেকে। জাপান অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টোকিও প্রদর্শনীতে ওর ছবি স্থান পেয়েছিল এবং সেই সূত্রে ঘরে পুরস্কার এনেছে ভাস্কর। ঐ একই বছরে নেহরু মিউজিয়ামের স্কলারসিপও পেয়েছে সে ছবি আঁকার বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে।

মুখভরা হাসির ঢেউ। ১৯৮১ সালের নভেম্বর ২৯ থেকে ডিসেম্বরের ৩ তারিখ অবধি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের আশুতোষ হলে তার ছবি টাঙানো ছিল। অবশ্যই তার সহকর্মীদের সঙ্গে।

১৯৮০ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার বিজয়ী ভাস্কর। এই ছোট শিল্পীকে সোভিয়েত দেশ তার সম্মান দিয়েছে। ও দেশের সবার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে তার। তাই বিজয়ী শিল্পীকে সোভিয়েত দেশ আমন্ত্রণ জানায়। এবং সেই ডাকেই সাড়া দিয়ে এই বয়সেই ঘুরে এসেছে সোভিয়েত দেশ।

বার বছরের ভাস্করের শিক্ষাগুরু গোপীনাথ দাসকে সেদিন ধরলাম কিড স্ট্রীটে। হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, ভাস্কর সত্যিই ভাল ছবি আঁকে। তবে অন্যরাও কিছু কম যায় না। তার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সবাই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের অধিকারী। অনেকে নানা ধরনের বৃত্তিও পায়। এর মধ্যে জাতীয় বৃত্তি পাওয়া ছাত্রও আছে।

তাই শিল্পগুরু হিসাবে গোপীনাথ দাসকে অবশ্যই সার্থক বলতে হয়।

হাসতে হাসতে বললেন মাঝে মাঝে ভাস্কর তার বাড়িতেই রাতদিন থেকে কাজ করে। অহিভূষণ মালিকের ভাষায় গোপীনাথ দাস শিশু শিল্পীদের কাছে মোটেই অপরিচিত নাম নয়। অবশ্যই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ভাস্করের কাছে ত নয়ই।

ভাস্করের মতই গোপীনাথ দাসের আরেক ছাত্র কুমারজ্যোতি রায়চৌধুরী। কুমারজ্যোতির বয়স সবে তের। এর মধ্যেই সে দেখিয়ে দিয়েছে তার হাতের জোর। অবশ্যই এ কথা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কুমারজ্যোতির চোখের ভাষার মতই উজ্জ্বল তার ছবি। অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠের ক্লাস

জিষ্ণু দাস

ভাস্কর ভট্টাচার্য

কুমারজ্যোতি রায়চৌধুরী

লাইনের ছাত্র কুমারজ্যোতি রায়চৌধুরী। ১৯৭৫-৭৬ এই দু বছরে কুমার ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে প্রথম পুরস্কার এনেছে— দুটোই সোনার মেডেল।

ভরসা পেয়ে বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কুমার রঙ তুলির জগতে ডুবে গেল। ফলে ছবিও আঁকতে লাগল। '৭৭, '৭৮ এই দুটো সাল কেবল ঘরে বসে চলেছিল তার সাধনা।

১৯৭৯ সালে আবার কুমারজ্যোতি ফিরে এল। আর কুমার আসা মানে জয় করে নেওয়া। আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্বের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ছোটদের কাছে। কারণ ঐ বছরটা তাদের দখলে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত ঐ বছরটায় কুমার আনল জাতীয় পুরস্কার। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ঐ দু'বছর তাঁর কাজের মান অনেক বেড়েছে। এই জাতীয় পুরস্কারে অর্থমূল্যও কিন্তু কম নয়। আড়াইশো টাকা পেয়ে কুমারের নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল।

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালে এসে কুমার আবার জিতে নিল পুরস্কার। এবারে নেহরু মিউজিয়মের পুরস্কার। অনেকেই ছিল যে প্রতিযোগিতায়। তবুও কুমার তাদের সবার ভিড় ঠেলে দ্বিতীয় পুরস্কারের সম্মান নিয়ে এসেছিল। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল একশ টাকা। সেই সঙ্গে ছিল একটি শীল্ড। যদিও এসব কিছুরই আকর্ষণ কুমারের কাছে সব নয়। তাই এখন কুমার ব্যস্ত ছবি আঁকায়।

ভাস্কর ও কুমার এই দু'জনের সঙ্গে সঙ্গেই আরেকজন শিল্পীও এগিয়ে যাচ্ছিল আপন লক্ষ্যে। তার নাম জিষ্ণু দাস।

জিষ্ণুর ছবিতে নানা রঙের বৈচিত্র যেমন থাকে তেমনিই থাকে ড্রয়িংয়ের মুন্সিয়ানা। শঙ্কর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পর পর দুবার জিষ্ণু নিয়ে এসেছে প্রথম পুরস্কার।

ছবির জগৎ ছাড়াও জিষ্ণুর আরেক জগৎ আছে। সে জগৎও সৃষ্টির জগৎ। সেখানে আছে নানা ধরনের ধাতব জিনিসপত্র। এসব দিয়ে সে দক্ষ ইঞ্জিনিয়রের মতই তৈরি করে নানা ধরনের মডেল।

জিষ্ণুর পরষ্কারের ঝুলিতে আরেকটি পুরস্কারও আছে। নেহরু মিউজিয়মেরও পুরস্কার পেয়েছে জিষ্ণু। তাই জিষ্ণুর এখন চিন্তা কি করে একটা সত্যিকারের ভাল ছবি আঁকা যায়। হয়ত এ চিন্তা অন্য দু'জনেরও আছে। শিক্ষক হিসেবে গোপীনাথ দাসের ভাবনা এখন তাই অনেক বেড়েছে। সেই সঙ্গে দায়িত্বও। □

তোমাদের বই

রত্নাকর
সম্পাদক : শিশির ভট্টাচার্য
প্রকাশক : ২১, টেমার লেন,
কলকাতা-১২ । দাম : বার টাকা

চার রঙ-এ মুদ্রিত আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে ঝলমলে 'রত্নাকর' যেদিন প্রথম আমাদের দপ্তরে জমা পড়ল, সেদিন আমরা সকলেই গ্রন্থটির দিকে সাগ্রহে হাত বাড়িয়েছিলাম।

রত্নাকরের সম্পাদক কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রাখেননি। তাই তিনি কি উদ্দেশ্যে কাদের জন্য এই সংকলন প্রকাশ করলেন, তা আমরা জানতে পারিনি। তবে পুস্তিকার দ্বিতীয়পত্রে একে এক স্থানে 'কিশোর সংকলন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্পাদক কিশোরদের পরিতৃপ্ত করতেই এই সংকলনের আয়োজন করেছেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। উদ্দেশ্য কৌতূহলোদ্দীপক এবং লেখকসূচীতে একান্ত খ্যাতদের সঙ্গে একান্ত অখ্যাতদের বিচিত্র সমাবেশ সংকলকের সাহসের পরিচয় বলেই বোধ হয় প্রথম অবস্থায়।

কিন্তু সংকলনটি পাঠের শেষে এ মানসিকতা থাকে না। সংকলক কোন লক্ষ্য স্থির করে এ সংকলনের ঝুড়ি বোঝাই করেননি। এক একজন বাজারে গিয়ে পরিকল্পনা বহির্ভূত এলোমেলো নানা জিনিস কিনে থলে বোঝাই করে বাড়ি ফিরে আসেন—কার সঙ্গে কি মিশিয়ে কোন তরকারীতে কার রসনা পরিতৃপ্ত করা হবে, তা বুঝে ওঠা রাঁধুনীর পক্ষে এক চরম পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সম্পাদক তেমনই কাজ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের যে দার্শনিক চিন্তা-ভরা প্রবন্ধ দিয়ে সংকলন শুরু, যার পরেই নন্দলাল বসুর শিল্প-সংক্রান্ত প্রবন্ধ—তার পরেই দক্ষিণারঞ্জনের উপকথা সংগ্রহ কি কারণে ঠাঁই দেওয়া হল? সংকলক কি মনে করেন ঐ দুই প্রবন্ধ পাঠ করে আনন্দ গ্রহণ যারা করবে, তার পরেই তারা দক্ষিণারঞ্জনের উপকথায় রসমগ্ন হতে পারবে? না কি সংকলক ঐ গভীর গম্ভীরতার পর লঘু রচনা দিয়ে মানসিক রিলিফ দিতে চাইলেন? না কি তিনি ঐ ছোট্ট সংকলনের দ্বারাই বাড়ির সকলের রস পরিতৃপ্তির আয়োজন করতে চেয়েছেন?

এ সংকলনের সংগ্রহের মধ্যেও যেমন কোন বিশেষ মেধা ও স্তরের কিশোরদের পরিতৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই তেমন সংগ্রহগুলোকে সাজাবার কোন বিজ্ঞানী পরিকল্পনা। লেখকদের আবির্ভাব কালের অনুক্রমেও রচনাগুলো সাজান হয়নি, সাজান হয়নি রসের দিকে তাকিয়ে। সবচেয়ে মজার কথা, এক মলাটের মধ্যে সংকলক

'টাপুর টুপুর' নামে আর একটি সংকলন ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন যে শেষাংশের নাম আলাদা করে টাপুর টুপুর দিতে হল, তারও কোন কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। দ্বিতীয় নামটি না থাকলে কি ক্ষতি হত? বা দুই সংকলনের ভেতর সজ্জা বা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়সজ্জার পার্থক্যই বা কি? এমন সব অসংখ্য প্রশ্নে মাথা ঝিমঝিম করে সংকলনটিকে যথার্থ অনুধাবন করতে

তবে কেউ যদি এ সব কোন প্রশ্নই না তোলেন, এবং অনেক অবান্তর বর্জন করে পাঠ করে যেতে পারেন তবে রত্নাকরে অনেক রত্নের সন্ধানই পাবেন—রত্নগুলো জনপ্রিয়তার কষ্টি পাথরে বহুদিন যাচাই হয়ে বাঙলা সাহিত্যের মণিমঞ্জুষায় আপনিই ঠাঁই নিয়েছে। এ সব লেখা স্বীয় দীপ্তিতেই সমুজ্জ্বল। সংকলনের যেটুকু আলো তা ঐ সব দু-চারটি রচনায়। রত্নাকরে সঞ্চয় আছে, সমন্বয় নেই—তা সংকলকের মুন্সীয়ানা ও পরিকল্পনার অভাবে জড়োয়া গহনায় পরিণত হতে পারেনি।

কাগজ, ছাপা ও পারিপাট্য আকর্ষণীয়। দাম বেশি।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের বিলুপ্ত পাখি : শাকনাল

শাকনাল বা গোলাপী-মাথা হাঁস (Rhodonessa caryophyllacea) সম্প্রতি অবলুপ্ত ভারতীয় পাখির অন্যতম। ভারতীয় হাঁসদের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর এই হাঁস একসময় প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতের আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। পক্ষিবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন যে এ পাখি এখন একেবারেই লুপ্ত কেননা এ হাঁস দেখার সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে ১৯৩৫ সালে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে। এরা যাতে সম্পূর্ণ লুপ্ত না হয় সেজন্য এদের কয়েকটিকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বন্দী অবস্থায় এদের সন্তান উৎপাদন হয়নি। ১৯৩৫ সালের পরেও অবশ্য শাকনাল হাঁস দেখা গেছে বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু তা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেননি। অনেকের মতে যে পাখিকে শাকনাল বলে দাবী করা হয়েছে সেগুলি রাঙ্গামুড়ী (Netta rufina) কেননা শাকনালের সঙ্গে রাঙ্গামুড়ীর বেশ কিছুটা মিল আছে।

এবং জবাব

এবারে ব্যক্তিগত পত্রাদি এবং জবাবে প্রবেশ করার আগে কিছু সাধারণ বক্তব্য রাখতে চাই। এ কথাগুলোও চিঠির সূত্রেই আমাদের মনে এসেছে।

প্রথমত, গত ১ মে সংখ্যায় শিবাজী-দে-র চিঠিতে একটা নতুন জিনিস আমাদের চমকিত করায় আমরা তা প্রকাশ করেছিলাম। শ্রীমান এখনি এক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। কেন জানি না। লোকে কোন মহৎ কাজ করে আত্মগোপন করতে ছদ্মনাম নিয়ে থাকেন। শিবাজী কেন যে ছদ্মনাম নিয়েছে তা জানি না। কিন্তু ঐ চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর, পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে ছদ্মনাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে। সবাই একটা করে ছদ্মনাম গ্রহণ করছে। এই মারাত্মক ব্যাধি দূর করতে সম্পাদক মশাই এক 'টীকা' আবিষ্কার করেছেন। তা হল এই যে, ছদ্মনাম থাকলে, সে চিঠি প্রকাশ না করা। দেখা যাক এই টীকায় ঐ মারাত্মক ব্যাধি দূর হয় কিনা।

দ্বিতীয়ত, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নাম ছাপাবার আগ্রহে নিত্য চিঠি পাঠাতে শুরু করেছ। চিঠির সংখ্যা দিয়ে ত ছাপাবার দাবী প্রতিষ্ঠা করা যাবে না ভাই। মৌলিক চিন্তা ও প্রশ্ন না থাকলে আমরা সে চিঠির গুরুত্ব স্বীকার করব না। অতএব অকারণে বারবার চিঠি পাঠিয়ে আমাদের বিব্রত করো না।

তৃতীয়ত, পুরো চিঠি বিশেষ কারণ ছাড়া ছাপা হবে না। তাই ও অনুরোধ করো না।

শুভেন্দু প্রধান। মেদিনীপুর

● 'নবম দশম' তোমার গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং তুমি এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। তোমার উৎফুল্ল মুখ এবং উজ্জ্বল সাফল্যের কামনা নিয়েই ত আমরা এ পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলাম। বোঝা যাচ্ছে আমরা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছি।

তুমি নবম দশমের পক্ষ থেকে প্রচারিত নাটক শুনে আনন্দ পাচ্ছিলে জেনে আমাদেরও আনন্দ হল। তোমার বাবা মা দাদা দিদিরাও যে ছায়াছবির গানের আকর্ষণ উপেক্ষা করে আমাদের ঐ অনুষ্ঠান শুনতেন এ জন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ।

শুভাশিস বর্মন। দুর্গাপুর

…ইংরাজির প্রশ্ন ও উত্তরগুলো ইংরাজিতে লিখে বঙ্গানুবাদ করে দিলে সুবিধা হয়। ইংরাজিতে শক্ত বানানগুলো ডিক্সেনারি দেখে খুঁজে নিতে দেরি হয়, ও এতে সময় নষ্ট হয়।…

● না ভাই, সময় নষ্ট হয় না। ওতেই সময়ের সাশ্রয় হয়। ডিক্সেনারি দেখা

যেমন অভ্যাস হয়—শব্দটাও মগজে গেঁথে যায়। পুরো মানে খানিক বুঝে, খানিক অনুমানে জেনে নিতে হবে। অভ্যাস রপ্ত হলে দেখবে কষ্ট হবে না।

তখন নিজেও ইংরেজি লিখতে পারবে অন্যের লেখাও বুঝতে পারবে।

বালিজুড়ি স্পনসর্ড গ্রামীণ গ্রন্থাগার
বালিজুড়ি। বর্ধমান

● আপনাদের পত্রের প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু বাকী সংখ্যা পাঠাবার কোন ব্যবস্থা আমরা করতে পারব না। আমাদের ডাক ব্যবস্থা এর অন্তরায়। প্রায় সময়েই বুকপোস্টে বই পাঠালে প্রাপক পান না। আর V. P. P যোগে আমরা পাঠাই না। অতএব অনুগ্রহ করে কলকাতায় এলে আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিন। আপনাদের নামে সংখ্যাগুলি তুলে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হল।

সুদীপ্তা সাহা। কলিকাতা-৪৭

...যে প্রশ্নগুলি আমাদের লিখতে দেন সেগুলির উত্তরগুলি যদি পরের সংখ্যায় পাঠিয়ে দেন তাহলে খুব ভাল হয়।

● কোন কোন ক্ষেত্রে তা করা হয়-- সব ক্ষেত্রে নয়। কোথাও শুধু উত্তর সংকেত দেওয়া হয়। সরাসরি পুরো উত্তর আমরা দিতে চাই না। তাহলে তোমরা আর লিখতেই চাইবে না। তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। ডানকুনি।
হুগলী

...পোস্ট কার্ডে দিলে আপনারা ভাবেন পোস্ট কার্ডে একটা চিঠি দিয়েছে তাও আবার পত্রিকার সমার্কে (সম্পর্কে ?) নিন্দায় ভরা, আগুনে পুড়িয়ে দাও না ওটা। তাই অতিরিক্ত ১০ পয়সা বেশি খরচা করে এই চিঠিটা পাঠাচ্ছি, অবশ্য পড়বেন কিনা জানি না, সেটা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। প্রথমতঃ আপনাদের পত্রিকাটা নবম শ্রেণীর পক্ষে উপযোগী হলেও পত্রিকাটার পাতাগুলো অত্যন্ত খারাপ, দুদিন পরেই পত্রিকার পাতাগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আশা করি আপনারা এই বিষয়ে একটু যত্ন নেবেন। দ্বিতীয়তঃ রেডিওতে আপনাদের প্রোগ্রাম হয় তাতে দেখলাম 'নবম দশম'-এর গুণাবলী বলতে বলতেই ত ৩/৪ মিনিট কেটে যায় আর পাঠ্য বিষয়ের উপর নাটক ৭/৬ মিনিট হয়। সুতরাং আপনাদের সময় বাড়ান। তৃতীয়তঃ নবম দশম পত্রিকায় অনেক ভুল বেরোচ্ছে। না আর বদনাম দেবো না। তাহলে হয়ত রেগেই চিঠি কুচি কুচি করে দেবেন।

● আমরা পোস্ট কার্ডের চিঠি পড়ি না এমন ধারণার কারণ কি ? সকলেই কি ইনল্যাণ্ড বা খামে চিঠি দেয় ? অতএব বোঝা যাচ্ছে আপনি (চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে না আপনি অভিভাবক কি ছাত্র) আগেই আমাদের সম্পর্কে অমূলক অপবাদ গড়ে নিয়েছেন।

পত্রিকার পাতা ভাল করবার সাধ্য আমাদের নেই। এই কাগজে ছাপিয়েই এই দাম রাখা যাবে না—সব জিনিসের দাম এই হারে বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে ভাল কাগজ কিভাবে দিই ? তবে লাল হয়ে যাচ্ছে এটাও বোধ হয় পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, আমরাও ত পুরনো কপি নিত্য নাড়াচাড়া করছি। যাই হোক, এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব হবে না।

রেডিও প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সত্য নয়। আমাদের সময় মোট ১৫ মিনিট। ওটা বিজ্ঞাপনী প্রচারের দপ্তর। ওর নিয়ম মেনে আমাদের প্রোগ্রাম করতে হয়। ঐ রীতি অনুযায়ী সামনে পিছনে মিলিয়ে ১½ + ১½ মোট ৩ মিনিট থাকে বিজ্ঞাপনী প্রচার আর ১২ মিনিট

থাকে নাটক। এটি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল হবে প্রত্যাশায় প্রচারিত হত। নবম দশমের 'গুণাবলী' প্রথমেই বলা হত—শ্রোতাকে বঞ্চিত করবার জন্য নয়। ওটুকু বাদ দিয়ে রেডিওতে প্রোগ্রাম পাওয়াই সম্ভব নয়।

নির্ভুল কে? আপনিও কি? আপনার ঐ দশ পংক্তির চিঠিতে কতগুলো ভুল আছে, তা জানেন কি? যা হোক, আপনার ভুল আছে দেখে আমাদের ভুল করার অধিকার জন্মায় না। ভুল—ভুলই। এ আমাদের ত্রুটি। সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও নির্ভুল হতে পারছি না। আমাদের এই অক্ষমতায় আমরা লজ্জিত।'

দেখলেন ত। চিঠি আমরা পোড়াই না—বিশেষত নিন্দার চিঠি।

দিলীপ রায়, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া।

● না ভাই। দাম বাড়াবার অভিপ্রায় আমাদের নেই। তবে সরকার যদি হঠাৎ আবার দুম করে মস্ত কর চাপিয়ে দেন, তবে বাধ্য হয়েই দাম বাড়াতে হবে। জেনো নেহাৎ মরণদশার অবস্থায় না পড়লে নবম-দশম দাম বাড়াবে না।

● ● অভিযোগ জানাতে ভয় কেন? আমরা যে তোমাদের মন খোলা কথা চাই। দেখই না অভিযোগ করে—কামড়ে দিইকি না!

গৌতম মুখোপাধ্যায়, কসবা।

● তোমার চিঠিটি খুব ভাল লেগেছে। তোমার না পারার জন্য দুঃখ কর না। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তুমি ভাল বলতে না পারার জন্য যারা টিটকিরি দিয়েছে তাদেরকেও বড় ভেব না।

ব্যর্থতাকে চেপে ধর। অভ্যাস কর—পড়—বাড়িতে একা একা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা কর—দেখবে একদিন ঐ টিটকিরিবাজেরাও তোমার ভক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তোমার সেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত চেহারা দেখতে চাই।

সুকুমার ঘোষ। কলকাতা-২৮।

একজন অভিভাবক হিসেবে আপনাদের 'নবম-দশম'এর প্রথম সংখ্যা থেকেই নিয়মিত সংগ্রহ করছি। আমার কলেজ-জীবনে এইরকম একটা পত্রিকা বেরত আর আমি তার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম, তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আয়োজনে উপকরণে নবম-দশমের সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না, ...এটা লক্ষ্য করেছি যে, এই পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে আপনাদের প্রয়াসের অভাব নেই।

...তবে প্রতি সংখ্যায় 'বিদ্যালয় পরিচিতি বিভাগে' একটা বিদ্যালয়ের পরিচয় পাচ্ছি। কিন্তু 'ছাত্র পরিচিতি বিভাগ' নেই কেন? এই বিভাগে বিভিন্ন ভাল স্কুলের ভাল ছেলেদের যারা এখন নবম শ্রেণীতে পড়ে, পরিচয় থাকা উচিত। তাদের পড়াশুনা, খেলাধুলা, হবি (hobby) আর পরিবেশ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে একটা বিভাগ এখুনি চালু করা দরকার।

● আপনার এই প্রশংসাবাক্য আমাদের অনুপ্রাণিত করল।

'ছাত্র পরিচিতি' বিভাগে ভাল ছাত্রের পরিচয় আগে থেকে সাড়ম্বরে প্রকাশ করে তাকে দাম্ভিক করে তোলা হবে না ত?

দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩ (ফোন ২৪-৫৫২০) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২ (ফোন ২৭-২১৬৯, ২৭-৩০১৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১) থেকে প্রকাশিত।

খেলার আসর

স্পেনের বিভিন্ন শহর থেকে বিশ্ব কাপ ফুটবলের খবর ও ছবি শুধু নয়, কিংবা ইংল্যাণ্ড থেকে টেস্ট ক্রিকেট বা উইম্বলডন টেনিসের রিপোর্ট নয়—সারা ভারতের সব খেলার রিপোর্ট, ছবি প্রভৃতি থাকে সব চাইতে বেশি

খেলার আসর-এ

কলকাতার ফুটবলের খবর? তাও খেলার আসরই সবার উপরে।

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭২

Registration No. 3/80-82 WB/CC 164

ইত্যাদি প্রকাশনীর আরো তিনটি অসাধারণ পত্রিকা